NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG : POLITICAL SCIENCE

PAPER – II

(Bengali Version)

Modules : 1, 2, 3 & 4

POST GRADUATE POLITICAL SCIENCE

(PGPS)

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে-পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

[Post-Graduate Political Science (PGPS)]

নতুন সিলেবাস (জুলাই, ২০১৫ থেকে প্রবর্তিত)

দ্বিতীয় পত্র

স্বাধীনতা উত্তর ভারতের রাজনীতি

উপদেষ্টামণ্ডলী

অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য

অধ্যাপক রাধারমন চক্রবর্তী

অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

ঃ বিষয় সমিতি ঃ

অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত
অধ্যাপক অপূর্ব মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য
অধ্যাপক তপন চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক সুমিত মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক

পর্যায়	একক	রচনা
প্রথম	একক 1-4 :	অধ্যাপক অপূর্ব মুখোপাধ্যায় সহায়তা ঃ ড. দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয়	একক 1&3 :	অধ্যাপক অশোক কুমার সরকার
	একক 2&4 :	মূল রচনা ঃ অধ্যাপিকা মাল্যশ্রী মুখোপাধ্যায় অনুসৃজন ঃ অধ্যাপক ইয়াসিন খান
তৃতীয়	একক 1-4 :	অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী
চতুর্থ	একক 1-4 :	অধ্যাপক অপূর্ব মুখোপাধ্যায় সহায়তা ঃ ড. দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত

সম্পাদকীয় সহায়তা এবং সমন্বয়সাধন ঃ অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

[illegible]

[illegible] Equitable Financial Resource [illegible]

[illegible]

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান
(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

দ্বিতীয় পত্র

পর্যায় — প্রথম : ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

একক 1 : ❑ ভারতীয় রাজনীতি আলোচনার ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী সমূহ 7-16

একক 2 : ❑ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ 17-25

একক 3 : ❑ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতা 26-35

একক 4 : ❑ ভারতের রাষ্ট্র ও জাতি গঠন 36-44

পর্যায় — দ্বিতীয় : রাজনৈতিক কাঠামো

একক 1 : ❑ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য 45-57

একক 2 : ❑ দলব্যবস্থা, নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং জোট রাজনীতি 58-66

একক 3 : ❑ (ক) সংসদীয় সার্বভৌমত্ব 67-73

❑ (খ) বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা 74-83

একক 4 : ❑ পঞ্চায়েতী রাজ ও তৃণমূল স্তরের রাজনীতি 84-91

পর্যায় — তৃতীয় : রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি

একক 1: ❑ সামাজিক বিভাজন : জাত ও শ্রেণি 92-99

একক 2: ❑ শিল্প বাণিজ্য ও রাজনীতি 100-105

একক 3: ❑ নারী ও রাজনীতি 106-113

একক 4: ❑ আঞ্চলিকতাবাদ ও নৃ-কুল পরিচিতি 114-120

পর্যায় — চতুর্থ : রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ

একক 1: ❑ (ক) শ্রমিক আন্দোলন 121-129

(খ) কৃষক আন্দোলন 130-142

একক 2: ❑ মানবাধিকার আন্দোলন 143-152

একক 3: ❑ পরিবেশ আন্দোলন 153-161

একক 4: ❑ দলিত রাজনীতি 162-172

একক ১ □ ভারতীয় রাজনীতির আলোচনার ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ

গঠন :

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ ভূমিকা
১.৩ ভারতীয় রাজনীতি পাঠের উদার প্রাতিষ্ঠানীকতাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী
১.৪ আচরণবাদী ও কার্য-কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গী
১.৫ মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গী
১.৬ বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী
১.৭ সাংস্কৃতিক ও সমালোচনাত্মক অধ্যয়নবাদ
১.৮ উপসংহার
১.৯ নমুনা প্রশ্ন
১.১০ গ্রন্থসূচি

১.১ উদ্দেশ্য

- ভারতীয় রাজনীতির আলোচনা ও সম্যক অনুধাবনের বৌদ্ধিক উপায়গুলির অন্বেষণ
- যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি ভারতের রাজনীতি পাঠে সহায়ক, সেগুলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ
- সুনির্দিষ্ট কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গী যেগুলি ভারতীয় রাজনীতি ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হয়েছে যেমন প্রাতিষ্ঠানীকতাবাদ, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবাদ, বহুত্ববাদ কিংবা মার্কসবাদ ও নব্য মার্কসবাদ সেগুলির উপস্থাপন ও পর্যালোচনা।
- অতি সম্প্রতি ব্যবহৃত ভারতীয় রাজনীতি পাঠের কিছু নূতন বাচনের উপস্থাপন।

১.২ ভূমিকা :

ভারতীয় রাজনীতির চর্চাকারীগণ ভারতের রাজনীতির গতি প্রকৃতি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে যে স্বতন্ত্র ধারার

অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় রাজনীতি চর্চাকেই সমৃদ্ধ করেছে। ভারতের রাজনীতির গতি প্রকৃতি জানা বা বোঝার পথ একাধিক এবং তার বিশ্লেষণে ও অনুসন্ধানে ভারতীয় রাজনীতির নানা রূপ ও বৈচিত্র্য অনুধাবন করা সম্ভব হয়। বস্তুত ভারতীয় রাজনীতি চর্চায় ব্যবহৃত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীগুলিকে আমরা এক একটি পথ প্রদর্শনকারী স্মারক স্তম্ভ বা indicative signpost-এর সাথে তুলনা করতে পারি। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতীয় রাজনীতি চর্চার দৃষ্টিভঙ্গীগুলি সময়ানুযায়ী ভাগ করা সহজ নয়। কারণ ঐ দৃষ্টিভঙ্গীগুলি সুনির্দিষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে এক-এক করে তৈরী করা হয়নি। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতি চর্চায় যে দৃষ্টিভঙ্গীগুলির ব্যবহার লক্ষ্য করা গিয়েছে সেগুলি হল—

(ক) প্রতিষ্ঠানিকতা বাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Institutionalism)

(খ) রাজনীতির বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Pluralism and Political Pluralism)

(গ) আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Behaviouralism)

(ঘ) মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Marxism)

(ঙ) সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন ও আলোচনামূলক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী (Cultural Studies and critical approach).

১৯৫০-এর দশক এবং ১৯৬০-এর দশকের ভারতীয় রাজনীতি সংক্রান্ত লেখাপত্রগুলির মধ্যে উদার প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী সময়ে সংবিধান রচনা এবং নতুন প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় রাজনীতির আলোচনায় নতুন ধারার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা এবং নতুন প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মধ্য দিয়ে ভারতে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের পথ প্রস্তুত হয়। ঐ সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারায় ১৯৭০-এর দশকে ভারতীয় রাজনীতির চর্চয় বহুত্ববাদী বা রাজনৈতিক বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কার্লমার্কস স্বয়ং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বিভিন্ন লেখা পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে পাশ্চাত্য রাজনীতি বিশ্লেষকগণ 'দ্বান্দ্বিক' প্রকৃতির বলে গণ্য করেছিলেন। ভারতীয় রাজনীতির আলোচনা ও বিশ্লেষণে রজনী পাম দত্ত, এম. এন. রায়, ভি ভি. কৌশম্বী এবং এ. আর দেশাই প্রমুখ মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের বাম রাজনৈতিক দলগুলি এমন কী যারা সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিধির বাইরে সক্রিয় তারা সকলেই ভারতের রাজনীতির আলোচনা ও বিশ্লেষণে নিজস্ব ধারায় শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণ ও আলোচনার প্রয়োগ ঘটিয়ে ছিলেন। ফলত ১৯৭০ -এর দশকে ভারতীয় রাজনীতির বৌদ্ধিক আলোচনার একটি সজাগ ও সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে মার্কসবাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই ধারায় ১৯৭০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে চরমপন্থী মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে ভারতীয় রাজনীতির বিচার বিশ্লেষণে মার্কসবাদের সাথে মাওবাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ১৯৮০-র দশকে ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ানের পতন আপাতভাবে কমিউনিজমকে অতীতের বিষয় হিসাবে প্রতিপন্ন করার প্রবণতার জন্ম দেয়। ঐ প্রবণতা দ্রুত অর্থনৈতিক সংস্কার এবং কাঠামোগত পূণর্বিন্যাসের ফলে ১৯৯০-এর দশকে ভারতীয় রাজনৈতিক চর্চায় রাজনৈতিক অর্থনীতির নতুন ধারাভিত্তিক বিশ্লেষণাত্মক প্রেক্ষিতের আর্বিভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক, এসিয়ান ডেভ্লপমেন্ট ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ইত্যাদি ম্যাল্টিল্যাটারাল প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত ধারায় ভারতীয় রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করা শুরু হয়। ঐ ধারার

আলোচনা ও বিশ্লেষণে ভারতীয় রাজনীতি চর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, রাষ্ট্রের দায়ভার কমানো, সরকারকে শাসনের সামনে বলিয়ান করার সুপারিশ ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়। অন্যদিকে লিটারারি ক্রিটিসিজম, সোসিও লিঙ্গুয়িসটিক, সোস্যাল হিস্ট্রি, সোস্যাল অ্যানথ্রোপলজি এবং সোস্যাল জিওগ্রাফি ইত্যাদির তুলনায় রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিধিতে সাংস্কৃতিক চর্চা ও আলোচনার (cultural studies and discourse) বিচারবিশ্লেষণ অনেকটাই অপ্রতুল। তবে নতুন শতাব্দীতে ভারতীয় রাজনীতির চর্চায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনুরূপভাবেই ভারতীয় রাজনীতির বস্তুবাদী অনুধাবন ও বিশ্লেষণে সন্ধিক্ষণকালীন বা সমালোচনমূলক অধ্যয়ন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী বা critical studies-এর প্রয়োগ ও ব্যবহার বিগত দশ বছর যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতীয় রাজনীতির চর্চায় সাধারণত দুটি বিষয়ের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। যথা ভারতীয় রাজনীতির একটি অনন্য নিজস্ব ধারা আছে। যে ধারা ভারতীয় সত্তার সহনশীল ও অভিযোজনশীল প্রকৃতিগত নানান সংস্কৃতির লক্ষণসূচক বৈশিষ্ট্যর মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আবার ভারতীয় রাজনীতি চর্চায় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিতে অনুসৃত আধুনিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ ও লক্ষ্য করা যায়।

এযাবৎকালে ভারতীয় রাজনীতি চর্চায় যে দৃষ্টিভঙ্গীগুলি অনুসরণ ও ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নরূপ :

১.৩ প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী :

ক্রমবর্দ্ধমান প্রত্যাশা বৈপ্লবিকরূপ ধাবন করলে তার প্রতিবেদনশীলতায় প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষয় ও অসামর্থের বিষয়ে সচেতনতা গড়ার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হয়। অধ্যাপক সামুয়েল পি. হান্টিংটন তার political order in changing societies (১৯৬৮) বই এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা ঘটিয়েছিলেন। এই বইয়ে হাটিংটন দেখান ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠানগুলি কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তার সমাধান কী। হান্টিংটন দাবী করেন যে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠান গড়া ও তাকে শক্তিশালী করেই চাহিদার মাত্রাতিরিক্ত দাবী মোকাবিলা করা বা ঐ দাবীগুলি সঞ্চালনাকারীদের মোকাবিল করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ভারতীয় রাজনীতির চর্চায় স্বাধীনতা অর্জনের সমসাময়িক পর্বে আইন বিশারদ সংবিধান বিশেষজ্ঞ প্রমুখরা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের রূপরেখা, আইন এবং প্রতিষ্ঠান গড়ার কঠোর কষ্টসাধ্য কাজ যা মূলত জাতি গঠন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত তার অনুসন্ধানে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার করছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে এক ধরনের সরল আশাবাদকে প্রকাশ করা হয়। মনে করা হয় সাংবিধানিক কারিগরী এবং যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের রূপান্তর সম্ভব। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যতক্ষণ না বৃহত্তর সমাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে ততক্ষণ রূপান্তরকারী সামর্থ সঠিকভাবে কার্যকরী হয় না। রোমিলা থাপার, সতিশ চন্দ্র, রবীন্দ্র কুমার, সতিশ সেবারওয়াল প্রমুখ সমাজ গড়ার সামর্থের উৎস ও বিকাশ অনুসন্ধান করেছিলেন। ভারতীয় রাজনীতির এই সব বিশ্লেষকদের ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক বলে গণ্য করা হয়। ভারতীয় রাজনীতির নতুন ধারার ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষক ছিলেন লুই ডুমো। তিনি ভারতের স্তরবিন্যাস নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাপেক্ষে অনেকে সর্ব ভারতীয় বাহ্যিক গঠন প্রকৃতির বিষয়টিও বিশ্লেষণ

করেছিলেন। এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ আধিপত্যর সাথে রাজ্যে বা অঞ্চল বা স্থানীয় কর্তৃত্ব বা আধিপত্যের সম্পর্ক আলোচনা করা হয়। এই চর্চাকারীদের মধ্যে রুডলফ, হারমন কুলকে, রবীন্দ্র কুমার সতীশ চন্দ্র প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় রাজনীতির চর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক ধরনের পুনরুজ্জীবন বা পুনঃপ্রবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মিগ্‌ডাল এই দৃষ্টিভঙ্গীকে নয়া প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ (Neo institutionalism) বা ঐতিহাসিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ (historical institutionalism) বলে চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন সারা পৃথিবীতেই রাষ্ট্র রাজনীতির গবেষণায় একবিংশ শতাব্দীর এই বিষয়টি বেশ সারা ফেলে দিয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম বক্তব্য হল প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাবেই বিন্যস্ত। কাজেই সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন সাপেক্ষে সর্বত্র একই ধরনের প্রতিষ্ঠান কার্যকরী হতে পারে না। কিন্তু সাবেক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদীরা বিশ্বাস করতেন কোন একটি প্রতিষ্ঠান যে কোন সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কার্যকরী হতে সমর্থ। যেমন ভারতের সাবেক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদীরা বিশ্বাস করেছিল ব্রিটিশ ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেলের সংসদীয় গণতন্ত্র ভারতে কার্যকরী হবে। এক্ষেত্রে নয়া প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদীদের মতে সংবিধান হল জাতীয় পরিচিতির রাজনৈতিক প্রতীক যা স্বাধীনতার লড়াই-এর সমাপ্তি সূচক। ফলে সংবিধান নিছক আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাজকর্মের উপর আনুষ্ঠানিক প্রভাব অনুশীলনের কোন আইনানুগ দলিল নয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নয়া প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে কাঠামোগত পুর্নবিন্যাস কর্মসূচী যা পুঁজির বিশ্বায়নের অন্যতম বাহন তার বিভিন্ন শর্তগুলির চর্চা করা হয় বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ইত্যাদি বৈদেশিক সাহায্যকারী বা ঋণদাতা বা বিনিয়োগকারীদের ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মাধ্যমে। পাশাপাশি এই চর্চায় বৈদেশিক রাজনৈতিক শক্তির আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ বিশেষত ব্যর্থ। ক্রিয়াশক্তি হারানো বা দখলীকৃত রাষ্ট্র এদের ভূমিকা চর্চা করে। নয়া প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদী চর্চাতেও সাবেক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদী চর্চার মতোই প্রতিষ্ঠানের স্বাধীকারের কথা বলা হয়। বৃহত্তর সামাজিক দাবি-দাওয়া থেকে প্রতিষ্ঠানকে দূরে রাখা ও থাকার কথা বলা হয়, প্রতিষ্ঠানের রূপান্তরকারী স্বার্থ রক্ষা করার জন্য।

১.৪ আচরণবাদী ও কার্যকাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গী :

৬০-এর দশক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবিজ্ঞানে আচরণবাদী গবেষণার প্রভাবে এবং তার অনুসরণে একাধিক ভারতীয় ও বিদেশি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভারতীয় রাজনীতির চর্চায় এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ শুরু করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রজনী কোঠারী, বসিরুদ্দিন আহমদ, এলডারস ভেল্ড, মার্কাস ফাভা এবং অস গুড ফিল্ড। এরা রাজনীতির আলোচনায় ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর রাজনৈতিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং মনস্তত্ত্বের গতিপ্রকৃতির উপর দৃষ্টিক্ষেপ করার উপর জোর দিলেন কেননা এইসমস্ত কারকগুলি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়াসমূহের মূল চালিকা শক্তি বলে এরা মনে করেন। কোঠারী জাতপাতের ক্রিয়াকলাপকে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একধরনের চাপ সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়া রূপে চিহ্নিত করে দেখালেন কিভাবে জাত ব্যবস্থা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক, নির্বাচনী পছন্দকে বিভিন্ন সময়ে নিয়ন্ত্রণ করে। কোঠারী মনে করেন সনাতনী গোষ্ঠী কাঠামো হলেও জাত ব্যবস্থা ভারতীয় রাজনীতির আধুনিকীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মোরিস জোন্স রাজনীতি চর্চার তিন ভিন্নধর্মী সংলাপের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন। এগুলি হল সনাতনী, আধুনিক এবং গুরুবাদী। এই সময় থেকে বিভিন্ন

ব্যক্তির কিংবা সমাজবিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নাগরিকদের ভোটাচরণ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা শুরু হল। এরই পাশাপাশি, এই আলোচনা পদ্ধতি প্রচলিত সমাজকাঠামো সমূহের যে সকল কার্যাবলী রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা অনুকূল, সেগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের ভূমিকা নির্ধারণের উপর জোর দিল। ভারতীয় রাজনীতি আলোচনার এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সামগ্রিকভাবে অনৈতিহাসিক এবং স্থিতাবস্থাবাদী। ১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরী অবস্থা জারী হবার পরে রাষ্ট্রকাঠামোয় যে স্বৈরাচারী প্রবণতা দেখা দিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল। যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় রাজনীতি চর্চায় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর জোর দিয়েছিল এবং রাজনীতি সম্পর্কে অঞ্চলভিত্তিক এবং বিস্তীর্ণ তথ্যভাণ্ডার উপস্থিত করেছিল। নিছক প্রাতিষ্ঠানিক আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের পরিবর্তে এরা রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় আসলে কি ঘটে তার সুনিপুণ বর্ণনা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিল।

১.৫ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী :

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত সাংবাদিকতার জীবনে মার্ক্স ভারত সম্পর্কে তাঁর বার্তা প্রকাশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে মার্ক্স ওপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং তার আভ্যন্তরীণ সার্বিক পরিবর্তন ছাড়াই কিছু ক্ষেত্রে সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন এর সম্ভবনা তৈরী করেছিল সে সম্পর্কে তাঁর বিচার বিবেচনা জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ যাকে মার্ক্স ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছিলন সে বিষয়েও তার বক্তব্য জানিয়ে ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মার্ক্সের লেখা পত্রগুলির সরাসরি ভারতের রাজনীতির সাথে কোন যোগ না থাকলেও পরোক্ষভাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ভারতের রাজনীতি ব্যাখ্যার যথেষ্টই চল লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে কে. এন. রাজ, কে ম্যাথু কুরিয়ান বিপ্লব দাসগুপ্ত, অজিত রায়, মিকেল কালেককি প্রমুখ অনেকেই মার্কসীয় জ্ঞানতত্বে সমৃদ্ধ হয়ে ভারতীয় রাজনীতির শ্রেণী চরিত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাদের দৃষ্টিতে ভারতীয় রাষ্ট্র আধিপত্যশীল শ্রেণী স্বার্থ প্রকাশের এবং তা রক্ষার মাধ্যম। ভারতের উচ্চ বিত্ত সম্পন্ন শাসক সম্প্রদায় সামাজিক আধিপত্য সাপেক্ষে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে আধিপত্য বজায় রাখে বলে দাবী জানান। ফলে তাদর কাছে স্বাধীনতা পরবর্ত্তী সময়ে রাষ্ট্র ও রাজনীতি হল সমাজের উপরিকাঠামো, যা উৎপাদন প্রণালী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভারতীয় রাজনীতির মার্কসবাদী বিশ্লেষকগণের অভিমত হলো শ্রেণী বিশ্লেষণ কেবল সমাজকে বোঝার জন্যই কেন্দ্রীয় বিষয় নয় বরং শ্রেণী বিশ্লেষণকে সার্বজনীনভাবে যেকোন সমাজ বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা যাবে। ফলত জাত উপজাতি বা সম্প্রদায় গত চেতনাকে তারা 'মিথ্যা সচেতনতা' বলে গণ্য করেন। এক্ষেত্রে ডি. কোশাম্বি, বিপানচন্দ্র, জর্জেস ক্রিস্টোফেল লিটেন, ই. এম. এস নাম্বুদিরিপাদ বি.টি. রণদিভে, শারদ পাটিল প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। আবার গেইল ওমভেদ একটু ভিন্নভাবে জানান ভারতের মতো সমাজে যেখানে ধ্রুপদী পুঁজিবাদী পথে শ্রেণীর গ্রন্থনা হয়নি এবং জাত ও শ্রেণী বিজরিত অবস্থায় থাকে, পিছিয়ে পড়া শ্রেণী বিশেষত দলিত সচেতনতা, সাম্রাজ্যতান্ত্রিক এলিট বিরোধী তাকে সামাজিক পরিবর্তন ও বিপ্লবের পূর্বাভাস বা অগ্রদূত গণ্য করা যায়।

১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে এবং ১৯৮০-র দশক জুড়ে ভারতীয় রাজনীতির শ্রেণী ভিত্তির চর্চায় এক জটিল বিশ্লেষণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে পুঁজির ঐক্য সংরক্ষণ শ্রেণী স্বার্থের গ্রন্থনা সংগঠন ও সমন্বয়ে রাষ্ট্রের স্বাধিকার চাওয়া হয়। এক্ষেত্রে ভারতীয় রাজনীতির নয়া মার্ক্সবাদীদের প্রধান

প্রধান বিচার্যগুলি হল— (১) ভারতে সমগ্র সমাজে একরৈখিক আধিপত্য বজায় রাখার মতো কোন একটি মাত্র শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। ফলে কোন একটি শ্রেণীকে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য অন্য শ্রেণীর সাহায্য নিতে হয়।

(২) আধিপত্যশীল শ্রেণী গোষ্ঠীর সমাজে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য জরুরী হলো বিরোধী শ্রেণী স্বার্থগুলি এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে পুঁজির পুনরুৎপাদন বাঁধা না পায়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র শ্রেণী স্বার্থের পরিচালনাকারী হিসাবে আধিপত্যশীল জোটের মধ্যে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাথে কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর স্থায়ী বন্ধন লক্ষ্য করা যায় না। আর জোটভুক্ত প্রত্যেক অংশই যেহেতু রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশ দাবি করে তাই ঐ রাষ্ট্রে দাবি সাপেক্ষে পাওয়া ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিমাণ নিয়ে সর্বদাই বিরোধ চলতে থাকে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল ক্ষমতার গ্রহণযোগ্য বণ্টন ব্যবস্থা করা।

(৩) তবে এটাও লক্ষ্যনীয় যে জোটবদ্ধ শরিকদের মধ্যে ক্ষমতার গ্রহণযোগ্য বণ্টনের সময় রাষ্ট্র অনেক সময়ই বিরোধ এড়াতে পারে না। যেমন কৃষি বুর্জোয়াদের চাপে রাষ্ট্র অনেক সময় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশ লঙ্ঘন করে এবং কর্তৃত্ববাদী রূপান্তর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক সুদীপ্ত কবিরাজ ভারতীয় রাষ্ট্রের ঐ ভূমিকাকে গ্রাম্‌সীয় ধারণা ব্যবহার করে নিষ্ক্রিয় বিপ্লব বা 'Passive Revolution'-এর সাথে তুলনা করেছেন। ভারতীয় রাজনীতির এই পরিস্থিতির বিশ্লেষণে অনেকে দাবী করেছেন যে আধিপত্যশীল শ্রেণী জোটের বিরোধ প্রশমনে নাগরিক সমাজ বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সংগঠন ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বস্তুত ১৯৮০-র দশকের শেষ দিক থেকে ভারতীয় রাষ্ট্র ও রাজনীতির বিশ্লেষকদের একটা অংশ গ্রাম্‌সীয় বিশ্লেষণাত্মক ধারায় অনুপ্রাণীত হয়ে ভারতীয় রাজনীতির বিশ্লেষণে নাগরিক সমাজকে একটি অন্যতম বিশ্লেষণাত্মক উপাদান বলে গণ্য করেন। এই ধারণার অনুশীলনকারীগণ অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের প্রবণতার থেকে মার্কসবাদের চর্চাকে মুক্ত করে কেবল একটা পদ্ধতিগত পরিবর্তনকে সূচিত করেন নি পাশাপাশি এর কৌশলগত প্রাসঙ্গিকতার স্বীকৃতি আদায় করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই দিকটি অবহেলা করার জন্য সমালোচনাও করে ছিলেন। সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়নের হাত ধরে বহুজাতিক সংস্থা ও আভ্যন্তরীণ একচেটীয়া পুঁজির বাড়াবাড়ি নিয়ন্ত্রণে গণতন্ত্রের ভূমিকা নির্দেশ করে নতুন ধারার মার্কসবাদী লেখা পত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে দাবী করা হচ্ছে ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রকে সহনীয় করা এমনকী প্রয়োজনে তার সাথে লড়াই করার সামর্থ ভারতীয় গণতন্ত্রের আছে। তবে এ ধারার বিশ্লেষকরা মনে করেন না রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম হল বিপ্লব।

১.৬ বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী :

মার্কসীয় আলোচনার একমাত্রিক, অর্থনীতি সর্বস্ব আলোচনার বিপ্রতীপে রজনী কোঠারী, পল ব্রাস, রুডলফ্ দম্পতি, মাইরন ওয়াইনা, ইকবাল নারায়ণ প্রমুখ রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা ভারতীয় রাজনীতির আলোচনায় জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি উপাদানের বৈচিত্র্যময় প্রভাব কিভাবে রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়াসমূহকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে এক বহুমাত্রিক আলোচনা পদ্ধতি নির্মাণে জোর দিলেন। বহুত্ববাদীরা ভারতীয় রাজনীতি চর্চায় তার বহুবিভক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারা দেখালেন যে নিছক অর্থনৈতিক কাঠামো নয়, ভারতের বহুমাত্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোও রাজনৈতিক

ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক। ভারতীয় রাজনীতি আলোচনায় বহুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দেখায় যে অঞ্চল এবং সময় বিশেষে ভারতের রাজনীতি প্রাচীনতা এবং আধুনিকতার সাংস্কৃতিক মিশ্রণে সমৃদ্ধ। প্রাচীন পরিবার ও জাত প্রথা কিংবা বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-আচরণ সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করার পথে নিছক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। বরং এরূপ ভিন্ন মাত্রিক আচার-আচরণের সহাবস্থান ভারতীয় রাজনীতিতে দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয়ের এক সম্মিলিত পক্রিয়া রূপে গড়ে তোলে। এই মতের অনুসরণে বলা যায় যে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা সততই এক ধরনের জোট প্রক্রিয়া এবং বহুবিধ পার্থক্যের সমাহারে পুষ্ট। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তারা বলেন যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে গৃহীত যেকোন রূপ সাযুজ্যকরণ প্রণালী ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিস্থাপনই আদর্শ ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুপূরক।

১.৭ সাংস্কৃতিক ও সমালোচনাত্মক অধ্যয়ণবাদ :

সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী :

কোন একজন বিচ্ছিন্নভাবে কি মন্তব্য করলো তার ভিত্তিতে কোন আলোচনা বোধগম্য হয় না বরং আন্তঃ সম্পর্ক স্থাপনকারী নিয়ম এবং আচরণ বিধি ঐ মন্তব্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারে। কোন মন্তব্যকে ব্যক্ত করা বা প্রকাশ করার জন্য যেমন আলোচনার গ্রন্থনা হয় তেমনই এক্ষেত্রে নানান পরিমার্জনা বা কাঁটছাঁটও লক্ষ্য করাযায়। কাজেই ঐ নিয়ম ও আচরণবিধি বোঝার মাধ্যমে আমরা কোন আলোচনার ত্রুটি বিচ্যুতি জানতে পারি। কোন আলোচনায় কি বলতে চাওয়া হচ্ছে বা কী চাওয়া হচ্ছে না তা জানতে পারি। ভারতের রাজনীতি চর্চায় সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন এবং আলোচনা বিশ্লেষণের লক্ষ্য হল কীভাবে বা কী অর্থে ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকতা উত্তর আলোচনা ও ব্যাখ্য একই মুদ্রার দুই পিঠ তা দেখানো এবং ঔপনিবেশিকতা উত্তর আলোচনার মধ্যে ঔপনিবেশিকতার সূত্র অনুসন্ধান করা। এই বিশ্লেষণাত্মক প্রেক্ষিতে এডওয়ার্ড সেড এর 'Orientalism' কে পথ প্রদর্শনকারী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হল ভারতীয় রাজনীতির এই বিশ্লেষণ ধারায় স্পষ্টভাবে জানানো হয় ঔপনিবেশিকতাকে যতই সমালোচনা করা হোক না কেন ঔপনিবেশিতা-উত্তর অনেক বিচার্যই তার প্রভাব মুক্ত নয়। এক্ষেত্রে আশীষ নন্দী জানান শত্রুরা এমন ঘনিষ্ঠভাবে রয়ে গিয়েছে যে তারা এখন আমাদের অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় রাজনীতি চর্চায় সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন ও আলোচনামূলক বিশ্লেষণাত্মক প্রেক্ষিত ভারতীয় রাজনীতির চর্চায় যে বিষয়গুলি কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় সেগুলি হল— (১) আমরা কীভাবে রাষ্ট্র-রাজনীতিকে উপলব্ধি করি সেই আলোচনার পরিবর্তে রাষ্ট্র রাজনীতি কীভাবে নিজেকে উপলব্ধি করে সেই আলোচনা করা। অর্থাৎ বলা যায় রাষ্ট্র রাজনীতির মন বোঝার চেষ্টা করা। যেমন বলা যায় সংবিধানসভার বিতর্ক। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্‌দের বক্তব্য লেখাপত্র নীতি ও নীতি সংক্রান্ত মতামত উল্লেখযোগ্য বিচার বিভাগীয় ঘোষণা বা রায় দান, রাষ্ট্র নেতাদের সাক্ষাৎকার, আন্তঃ জীবন ইত্যাদির সাহায্যে ভারতীয় রাজনীতিকে বোঝা বা জানার চেষ্টা করা।

(২) ভারতীয় রাজনীতিতে কী ঘটেছে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ঐ ঘটনা কী অর্থ উৎপন্ন করেছে বা দেশের সমাজ ও রাজনীতির উপর ঐ অর্থের কী প্রভাব তার আলোচনা বাদ দিয়ে ভারতীয় রাজনীতি আসলে কী তা সার্বজনীনকরণ বা মান নির্ধারণ হল এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম বিষয়।

(৩) ফুকোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রভাবিত হয়ে নতুন নতুন শাসন কৌশলের

ব্যবহার এবং নজরদারি প্রযুক্তির উদ্ভবের সাপেক্ষে আধুনিক রাজনীতি ও তার প্রতিষ্ঠানগুলি আলোচনা করা ও বোঝার চেষ্টা করা এই দৃষ্টিভঙ্গীর আর একটি বিচার্য বিষয়। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রশাসনিক বিধির উদ্ভবের সাথে সাথে পরিচিতি সংক্রান্ত রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক বিচারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়।

(৪) ভারতীয় রাষ্ট্র ও রাজনীতির লিঙ্গ বিচার হল এই রাজনীতিচর্চার অন্যতম সাম্প্রতিকতম বিচার্য। এক্ষেত্রে পর্যালোচনা করা হয় ভারতীয় রাজনীতি কী পরিমানে পুরুষতান্ত্রিক এবং তা কীভাবে সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

ভারতীয় রাজনীতির সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন এবং আলোচনার বিশ্লেষণাত্মক প্রেক্ষিতের অন্য আর একটি ধারায় জানানো হয় কোন একটি পাঠ্যকে বৃহত্তর অর্থে ভিন্নভাবে কীভাবে পড়া বোঝা এবং ব্যাখ্যা করা যায় এবং তার সাপেক্ষে ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক অনুশীলনের চল এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ভারতীয় রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে আরো একটি সাম্প্রতিক সময়ের লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো রাজনীতির রাষ্ট্রীয় মঞ্চ থেকে অ-রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের দিকে ক্রমশ সরে যাওয়া। বর্তমানে নাগরিক সমাজ-এর পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে রাজনীতির এক নতুন ধারার সূচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় রাজনীতির যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাকে নতুন শতাব্দীর নতুন ধারার নাগরিক সমাজ ভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বলে গণ্য করতে হয়। কারণ তার সাথে পূর্বকার গ্রামসীয় ধারার কোন মিল নেই। এই নাগরিক সমাজ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী অনেকাংশেই উদারনৈতিক তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজনীতি চর্চার সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় রাজনীতির আলোচনায় অ-রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সাপেক্ষে যে আলোচনা করা হয় তার সবটাই নাগরিক সমাজ ভিত্তিক নয়।

সমালোচনাত্মক অধ্যয়ন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী : (Critical Studies)

গত এক দশক ধরে ভারতীয় রাজনীতির আলোচনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর লেখাপত্র দেখা যাচ্ছে নিজের আত্ম বর্ণনার ক্ষেত্রে সমালোচনাত্মক বা মূল্যায়ন ধর্মী। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারীগণ এযাবৎকালের ভারতীয় রাষ্ট্র ও রাজনীতির সমালোচনাত্মক অধ্যয়ন বা মূল্যায়ন করেন না বা সেগুলির সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার মধ্যেই থেমে যান না। বরং ভারতীয় রাষ্ট্র ও রাজনীতির বিশেষত্ব আলোচনায় তাঁরা এটা দেখানোর চেষ্টা করেন যে ভারতীয় রাজনীতির বিশেষ ধরনকে কতকগুলি বিশেষ পূর্বশর্তের সাপেক্ষে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণে রাজনীতির বিষয়বস্তু বা thing এবং রাজনীতির ধরণ বা form এর কোন একটি বিশেষ মুহূর্তের সাপেক্ষে পার্থক্য করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বা স্থানে রাজনীতির যে বিচিত্র এবং ঐতিহাসিক বাস্তব প্রকাশ ঘটেছে তার বাছ বিচার না করে তার সকল সাধারণ বৈশিষ্ট্য সাপেক্ষে রাজনীতিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। এই চর্চা জাতি, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ধারণার বিনিময়ের পদ্ধতিতে আস্থাশীল এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের অসংখ্য প্রান্তিক অবস্থান সমূহের অনুসন্ধানে ও সেগুলির বাচনের পুনর্নির্মানে ব্যাপৃত।

১.৮ উপসংহার :

পূর্ববর্তী আলোচনায় ভারতীয় রাজনীতি চর্চার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হল। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় রাজনীতির আলোচনা করা হয়নি বরং ভারতীয় রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করার জানার বা বোঝার যে বিভিন্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছে তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন ভারতীয় রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে কোন একটি দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবশালী বলে চিহ্নিত করা

যায় না। এক্ষেত্রে দার্শনিক থমাস কুনকে অনুসরণ করে বলা যায় যে সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তগুলিকে একটি দ্বারা অন্যটিকে পুরোপুরিভাবে বদলে দেওয়া যায় না। ফলে ভারতীয় রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রেও একই সময়ে একই বিষয়ের উপর নানান দৃষ্টিভঙ্গী নানান দৃষ্টান্তের এক সাথে বিচার বিবেচনার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। আর বিভিন্ন বিচার বিবেচনার ধারাবাহিকতাতেই ভারতীয় রাজনীতি নির্দিষ্ট আকৃতি অর্জন করছে এবং সাধারণের কাছে বোধগম্য হচ্ছে।

১.৯ নমুনা প্রশ্ন :

১। বড়ো প্রশ্ন :

ভারতীয় রাজনীতির অধ্যয়নের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। মাঝারি প্রশ্ন :

(ক) ভারতীয় রাজনীতির আলোচনায় প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

(খ) ভারতীয় রাজনীতির বিশ্লেষণে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান প্রতিপাদ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) ভারতীয় রাজনীতিচর্চায় বহুত্ববাদীদের মূল বক্তব্য কী?

(খ) ১৯৭৭ সাল পরবর্তী সময়ে ভারতীয় রাজনীতির আলোচনায় রজনী কোঠারীর দৃষ্টিভঙ্গীতে আপনি কি কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেন?

১.১০ গ্রন্থসূচি :

1. Amiya Kumar Bagchi : *The Developmental State in History and in the Twentieth Century*, Regency, New Delhi, 2004.
2. Pranab Bardhan : *The Political Economy of Development in India*, OUP, New Delhi, 1984.
3. Rajni Kothari : *Politics in India*, Little Brown, Boston, 1970.
4. Martin Doornbos and Sudipta Kaviraj (eds). *Dynamics of State Formation in India and Europe Compared*, Sage, London, 1998.
5. Ashis Nandi : *The Political Culture of the Indian State*, The MIT Press, MIT, 1989.

6. Iqbal Narain : 'Cultural Pluralism, National Integration and Democracy in India', *Asian Survey* 16, No. 10 (1976)

7. Ranabir Samaddar : *The Materiality of Politics*, (in 12 vols) Anthem Press, London, 2007 vol. 1&2.

8. Apurba Mukhopadhyay : *Post-Colonial Democracy in India : Structures and Processes*, Setu Prakashani, Kolkata & New Delhi, 2013.

9. Samir Das (Ed) : *The Indian State : ICSSR Research Surveys and Explorations in Political Science in India*, OUP, New Delhi, 2012, vol.1.

10. Rajini Kothari (Ed.) : *Caste in Indian Politics*, Orient Longman, Hyderabad, 1978.

11. Niraja Gopal Jayal & Pratap Bhanu Mehta (Eds.) : *Oxford companion to Politics in India*. See introduction, the article by Rudolph and Rudolph, OUP, 2010.

12. Paul Brass : *Politics in India since Independence*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

একক ২ ❑ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

গঠন :

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ পটভূমিকা

২.৪ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশিষ্ট্য

২.৫ সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

২.৬ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অনুশীলন

২.৭ উপসংহার

২.৮ নমুনা প্রশ্ন

২.৯ গ্রন্থসূচি

২.১ উদ্দেশ্য :

- ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ অনুধাবন করা
- ঔপনিবেশিকোত্তর সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাযুজ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার করা।
- গণতন্ত্রের রাজনৈতিক প্রতিস্থাপনের সাথে বৃহত্তর অর্থে আর্থ-সামাজিক গণতন্ত্রের নির্মাণ প্রণালীর সমস্যা ও সম্ভাবনার বিশ্লেষণ করা।
- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্ভাবন ও ভারতীয় করণের সমস্যাগুলির বিচার বিশ্লেষণ করা।

২.২ ভূমিকা :

১৯৪৭ সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতের যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম হয় তাকে পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক আইন ও প্রশাসনিক দায় সাপেক্ষে অভিযোজিত হতে হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার সময় শতাব্দী প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিশেষভাবেই প্রভাবশীল ছিল। সংবিধান

প্রণেতাগণ ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে ঔপনিবেশবাদ ও জাতীয়তাবাদ উভয়ের দায়ভার সমন্বয় করে ইতিপূর্বের ভঙ্গুর জাতি রাষ্ট্রের থেকে যে কোন বৈপ্লবিক পার্থক্য ঘটানো হচ্ছে না সেটা পরিস্কার করে দেন। ১৯৪৬ সালে ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার মধ্যস্থতাকারী ক্যাবিনেট মিশনের মস্তিষ্ক প্রসূত সংবিধান সভার সদস্যগণ অসাধারণভাবে আইনী বিজ্ঞতাভিত্তিতে সংবিধান রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। সংবিধান গঠনের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট মিশন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার নীতি অনুসরণ করেনি। পরিবর্তে ঠিক করা হয় যে সংবিধান সভার সদস্যরা তদানিন্তন নির্বাচনে গঠিত প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং এর মাধ্যমে সংবিধান সভা গঠনে অযথা সময় নষ্ট হবে না। সংবিধান সভা গঠনে ক্যাবিনেট মিশনে চারটি নীতি অনুসরর করা হয়। যথা— (ক) ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি ঠিক করা হবে। (খ) সংবিধান সভার সব আসন সাধারণ, মুসলমান ও শিখ এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুপাতিক হারে ভাগ করা হবে। (গ) প্রাদেশিক আইনসভার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সদস্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটাধিকার-এর ভিত্তিতে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। এবং (ঘ) সংবিধান সভা ও দেশীয় রাজাদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয় এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে ৯৩ জন প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ দেওয়া হয়।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধান সভার মোট সদস্য সংখ্যা স্থির হয় ৩৮৯ জন। আরো ঠিক করা হয় যে প্রত্যেক প্রদেশ প্রতি দশ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য একজন করে প্রতিনিধি সংবিধান সভায় পাঠাবে। প্রতিনিধি নির্বাচনের শেষে প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও অন্যান্য পদাধিকারী নির্বাচন করে সামগ্রিক গঠন প্রক্রিয়া শেষ করার সুপারিশ করা হয়। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধান সভার গঠন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা তাদের আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত নেবে তাদের প্রদেশের সংবিধানের বিষয়ে এবং ঠিক করবে তারা সমষ্টিগত সংবিধান গ্রহণ করবে কি না। সকল প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরা একত্রিত ভাবে কেন্দ্রীয় সংবিধানের বিষয়টি চূড়ান্ত করবে। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় স্তরে ভারত বিদেশ নীতি, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগের মত বিষয়গুলি দেখা শোনা করবে। এক্ষেত্রে একটা বিষয় অবশ্যই লক্ষ্যনীয় যে এই সংবিধান সভা আইনের দৃষ্টি অনুযায়ী সার্বভৌম ছিল না। বরং ব্রিটিশ আইনসভার দ্বারা সামগ্রিকভাবে এবং ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার দ্বারা বিশেষভাবে এর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল।

২.৩ পটভূমিকা :

জাতীয় কংগ্রেস তার প্রাথমিক দ্বিধা ও বেশ কতকগুলি আপত্তি সত্ত্বেও ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। এক্ষেত্রে তাদের মনে হয়েছিল যে যদি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব খারিজ করা হয় তাহলে ক্ষমতা হস্তান্তরে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ সব সময়ই সংবিধান সভার গঠন ও কার্য প্রক্রিয়ার বিষয়ে আপত্তি জানায়। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৬ সালে জুলাই মাসে সংবিধান সভা গঠনের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের ২৯৬ আসনের মধ্যে ২১৩টি সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় ৭৮টি মুসলমানদের জন্য এবং ৪টি শিখদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। নির্বাচনে ২৯৬টি আসনর মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস জয়লাভ করে ২০৮টি আসনে এবং মুসলিম লীগ জয় পায় ৭৩টি আসনে।

এক্ষেত্রে লক্ষ করার বিষয় হল যে সংবিধান সভা গঠনের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর সভায়

ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব রক্ষার জন্য কংগ্রেসের উদ্দ্যোগের কোন অভাব ছিল না। সংবিধান সভা গঠনে সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার নীতি অনুসৃত না হওয়া এবং সংখ্যা লঘু হিসাবে সংরক্ষণের তালিকায় কেবলমাত্র মুসলীম ও শিখদের স্বীকৃতি দেওয়ায় কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নেয় তপসিলী জাতি ও উপজাতি মহিলা, ইঙ্গ ভারতীয় পার্সী, ভারতীয় খ্রীষ্টান এবং অন্যান্যদের সভায় প্রতিনিধি হিসাবে সামিল করা হবে। একইভাবে সংবিধান সভায় জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের সামিল করার লক্ষ্যে শিক্ষা আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রের প্রখ্যাত মানুষদের সদস্য করা হয়। যার চূড়ান্ত ফল হিসাবে সংবিধান সভা শেষ পর্যন্ত আইনজ্ঞদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর থেকে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম অধিবেশন বসে। সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশনে ২০৭ জন সদস্য যোগ দেয়, তবে মুসলীম লীগের সদস্যরা ঐ সভায় যোগ দান থেকে বিরত থাকে। ১১ই ডিসেম্বর ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবিধান সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। এবং তিনি পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি হন। ১৩ই ডিসেম্বর নেহেরু সভার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিতর্ক বা আলোচনার জন্য এবং তা ১৯৪৭ সালের ২০-২২ জানুয়ারীর সভায় শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের ভারত ভাগের পরিকল্পনা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর মুসলিম লীগের সাথে সমঝোতা রক্ষার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। পরিবর্তিত অবস্থার কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বাধীন ভারতের সংবিধানকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার বিষয় মনোযোগী হয় এবং তারই সূত্র ধরে সংবিধানের মৌলিক রূপরেখা ও প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট করে। বাবা সাহেব ভীমরা ও আম্বেদকারকে সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি নির্বাচন করা হয়। ডঃ আম্বেদকারকে ভারতের সংবিধানের জনক বলা হলেও সংবিধান রচনার কাজে জওহরলাল নেহেরুর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। নেহেরু সংবিধান সভা ও কংগ্রেসের মধ্যে সংযোগের ভূমিকা পালন করতেন। নেহেরু এক্ষেত্রে সর্দ্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আম্বেদকার ও মৌলানা আজাদ প্রমুখের থেকে প্রয়োজনীয় নৈতিক ও সাংগঠনিক সাহায্য পান। সংবিধান সভার নেতৃত্বের জ্ঞান গড়িমা ও সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিচারশক্তি ছাড়াও তাদের মধ্যে একটা ঐক্যমতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় যার প্রতিফলন পাওয়া যায় কোন বিষয়ে একমত হতে না পারা বা পার্থক্য সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতিফলনে তারা সর্বদা সহমত পোষণ করতেন। এ বিষয়ে গ্রেনভিল অস্টিন যথার্থ ভাবেই মন্তব্য করেছিলেন যে সংবিধান সভার ভিতরে ও বাইরে কংগ্রেসের সদস্যরা যে সকল সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতেন তার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও বৈপ্লবিক সবারই মতামত লক্ষ করা যেত এবং ঐ ধরনের বক্তব্য পেশ করতে কংগ্রেস সদস্যরা কোন রকম দ্বিধা বোধও করতেন না। সংবিধান সভায় কংগ্রেসের প্রাধান্য ছিল অপ্রতিহত প্রকৃতির। সংবিধান সভার সদস্যরা কংগ্রেস, সংসদ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সর্বত্র সমান ভূমিকা পালন করতেন। তারা ছিলেন সীমাহীন ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় নায়ক। সুতরাং কংগ্রেস ছিল সংবিধান সভা, শাসক দল এবং সরকার। কংগ্রেস, সংবিধান সভা এবং সরকারকে অস্টিন একটি ত্রিভুজের তিনটি দিক বলে গণ্য করেছিলেন। যার তিনটি স্বতন্ত্র সত্তা থাকলেও একই সদস্যরা তিনটি অংশের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এসত্ত্বেও সংবিধান সভায় সিদ্ধান্ত রূপায়ন পদ্ধতিটি ছিল গণতান্ত্রিক প্রকৃতির। ভারতের সংবিধান মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রয়োজন প্রকাশ না করে বহুসংখ্যক মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়ে ছিল।

১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারি সংবিধান সভায় সংবিধানের লক্ষ্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি পূর্বানুমান করে। জানানো হয় সংবিধান সভা কাজ করবে জাতি ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের সকল সাধারণ মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্য নিয়ে। ঘোষণা করা হয় স্বাধীন ভারত হবে

সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র। ব্রিটিশ শাসনাধীন ও রাজন্যবর্গের নিয়ন্ত্রনাধীন রাজ্যগুলি নিয়ে যে স্বাধীন ভারতের জন্ম হবে তার সকল ক্ষমতার উৎস হবে ভারতের সাধারণ মানুষ। বলিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক ভারতে ন্যায়, সমতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সহ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা সুনিশ্চিত করা হবে। সংখ্যা লঘু মানুষ, পিছিয়ে পড়া ও উপজাতি মানুষ, এবং অবহেলিত ও অবদমিত অন্যান্য মানুষদের অগ্রাধিকার দিয়ে ১৯৪৯ সালে চূড়ান্তভাবে গৃহীত সংবিধানের প্রস্তাবনায় তার প্রতিফলন ঘটানো হয়।

২.৪ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশিষ্ট্য :

সংবিধান সভার অগ্নিগর্ভ, সুতীক্ষ্ণ বিতর্ক এবং দীর্ঘ মেয়াদী আলাপ-আলোচনার পরিসমাপ্তিতে যে সংবিধান রচনা করা হয় তার প্রধান তিনটি স্তম্ভ হল কল্যাণমূলক প্রেক্ষিত সহ সংসদীয় গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধান সভায় অনেক মতভেদের যথাযথ মীমাংসা সূত্র না পাওয়ায় গৃহীত সংবিধানের অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্টতা বা অসঙ্গতি থেকে গিয়েছে। যেমন আম্বেদকার, জগজীবন রাম এবং হনস মেহেতা প্রমুখের দাবী সত্বেও মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত সংবিধানের ৩২৬ নং ধারায় সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনুরূপভাবে নাগরিকের পৌর স্বাধীনতার অধিকার মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নানা প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ বিধি নিষেধের সাপেক্ষে। সংবিধান সভার একমাত্র কমিউনিস্ট সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী জানান যে ঐ বিধিনিষেধ যতই যুক্তিসংগত বলে দাবী করা হোক শেষ পর্যন্ত ঐ বিধিনিষেধগুলি আসলে পুলিশ কনস্টেবলের দায়িত্ব পালন করে। তিনি জানান জরুরী অবস্থার নিয়ন্ত্রণমূলক পরিস্থিতিতে নাগরিকের নূন্যতম পৌর স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের কবলে পড়ে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার কোন পরিষ্কার ঘোষণা নেই এবং বিনা বিচারে কাউকে আটক করা হবে না তারও কোন পরিষ্কার ঘোষণা নেই। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রেও নানা অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৯ সালে ২৬শে নভেম্বর সংবিধানের যে চূড়ান্ত খসড়া তৈরি হয় তাতে ঐ দুই নীতির অনুপস্থিতি অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। আম্বেদকার এর সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রের ধর্মীয় পরিচিতিকে সুস্পষ্টভাবে খারিজ করা এবং সেই সকল ধারা সংযুক্ত করা যা কোন ধর্মের সদস্য হওয়া বা কোন ধর্মীয় নির্দেশের অধীন হওয়া বা ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে সামিল হওয়ার বাধ্যবাধকতাকে খারিজ করার বিষয়টি যা ভারতকে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ বলে চিহ্নিত করে, তা লঘু করে দেওয়া হয় নাগরিক মৌলিক অধিকার হিসাবে কোন ধর্মমত গ্রহণ, অনুশীলন ও প্রচারের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ায়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুমিত সরকার মন্তব্য করেছিলেন একজন গান্ধীবাদীর জোরালো হিন্দু অধিকার রোকের আন্দোলন শুরু করার জন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে উদার ব্যক্তি অধিকারগুলির সুযোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

অনুরূপভাবেই কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে গৃহীত সংবিধানে যে ধারা উপধারাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয় সে সম্পর্কেও মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে নমনীয়ভাবে ক্ষমতা বণ্টনের ফলে রাজ্যের স্বাধিকার শক্তিশালী কেন্দ্র সমর্থনে অনেকক্ষেত্রেই পরিমিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও সংবিধান সভার মতাদর্শগত ভাবে রক্ষণশীল সদস্যরা কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী হিন্দু মহাসভার স্পষ্টভাষী নেতা, কেন্দ্রীভূত জাতি-রাষ্ট্রের সপক্ষে জোরাল সওয়াল করেন, যা কে. এম. মুন্সি, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন ও অন্যান্যদের দ্বারা সমর্থিত হয়। আম্বেদকার ও সোমনাথ লাহিড়ী একটা ভিন্ন মতামত তুলে ধরেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীকরণের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে সংবিধানে

অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং সংবিধানসভার দার্শনিক চুলচেরা বিচার বিবেচনায় ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত যে বিষয়গুলি উঠে ছিল তা সংস্কৃতির বহুত্ববাদী জাতি রাষ্ট্রে শেষ পর্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আম্বেদকার কিছুটা নিস্পৃহভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মেনে লেন এবং জানান যে যতই কেন্দ্রের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হবে ততই কেন্দ্রকে শক্তিশালী হওয়া থেকে বিরত রাখা সমস্যাপূর্ণ হবে। আধুনিক বিশ্ব পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ভারত সরকারের কাজকর্মের মধ্যে ঐ পরিস্থিতি নিশ্চিত ভাবেই দেখা দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার সামর্থ কারো নেই। অন্য দিকে এটাও সত্য যে ভারতের কেন্দ্র প্রবণতা প্রতিহত হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা ও এক্তিয়ারগত বিষয়ে একটা ভারসাম্য থাকা অবশ্যই দরকার। যদি কেন্দ্র মাত্রাতিরিক্তভাবে ক্ষমতাশালী হয়ে পরে তাহলে তা ভারতের দিক থেকে অবশ্যই ভয়ানক সমস্যার কারণ হবে।

২.৫ সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ :

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি ৩৯৫টি ধারা ৯টি তপসিল এবং নানান অংশ ও উপধারা এবং তালিকা সহ ৩০০ পাতার সংবিধান কার্যকরী হয়। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে সুন্দরভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। স্বাধীনতার সময় যে সমস্ত বিষয় ও সমস্যা সমাধান প্রত্যাশা করা হয়েছিল সেগুলিকে সমাধানের ক্ষেত্রেও একটা সুন্দর বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে সংবিধান বিশেষজ্ঞ চৌবে সংবিধানসভার কাজ ও ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বিস্তৃত আলোচনায় জাতিকে একটি লিখিত সংবিধান প্রদানের বিষয়টির প্রশংসা করেন এবং জানান সংবিধানের রূপকারগণ যে মতাদর্শগত অনুশীলনের স্বাক্ষর রেখেছেন তা বৃহত্তর মতাদর্শগত প্রেক্ষিতরূপে চূড়ান্তভাবে দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী হওয়ার বিষয়টি প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে তাঁরা সমঝোতা ও সহমতের যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা সংবিধান রচনাকালীন সময়ের দেশ ভাগ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দেশের বিভিন্ন অংশে কমিউনিস্ট বিদ্রোহ ইত্যাদির কারণে যে দ্বিধা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল তাকে প্রতিহত করে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে কার্যকরী হয়েছিল। সীমাবদ্ধ পৌর ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং খসড়ার অনিশ্চয়তা ছাড়া (এক্ষেত্রে জরুরী অবস্থা হল একমাত্র ব্যতিক্রম) এক গুচ্ছ মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তাদান সহ সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিক সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে সংবিধানে স্বাধীন ভারতকে চিত্রিত করা হয়। রাজ্যগুলির কিছুটা স্বাধিকার রক্ষার জন্য সংবিধানে নানান যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক মনন বা মূলনীতি নিশ্চয়তা রক্ষা করে ধর্মীয় স্বাধীনতা সংখ্যা লঘুদের জন্য কতকগুলি শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের বিষয়টিও সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গান্ধীজী এবং আম্বেদকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত ১৯৩২ সালের ঐতিহাসিক 'পুনা চুক্তি'র মূলনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে অস্পৃশ্য, আদিবাসী এবং অন্যান্য সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়। এক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়। সংবিধানে জাতি রাষ্ট্রের সামাজিক ন্যায়, কল্যাণমূলক ও সাম্যদর্শবাদী কাজকর্মের প্রতি দায়বদ্ধতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিশেষত সংবিধানে চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে ঐ প্রতিশ্রুতির প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়।

সংবিধান সভায় বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করার আগেই অধিকাংশ প্রাদেশিক আইনসভায় খসড়া সংবিধান আলোচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে সংবিধান বিশেষজ্ঞ এম. ভি পাইলি জানান নতুন ভারতের

কার্যকরী নথি হিসাবে সংবিধান তার মৌল বিষয়গুলির নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে মতামতের সাধারণ ঐক্য এবং অদম্য আশা ব্যক্ত করেছিল। আসলে সংবিধানের রূপকারদের বলশীল চিন্তা, সন্নিবেশিত বিশ্লেষণ, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে সংবিধানে চূড়ান্তভাবে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের জন্ম হয়। এ সম্পর্কে সংবিধানের অন্যতম রূপকার আম্বেদকার জানান 'আমি মনে করি এটা কার্যকরী, এটি নমনীয় এবং শান্তিপূর্ণ ও যুদ্ধকালীন উভয় পরিস্থিতিতেই দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি বলি যে যদি নতুন সংবিধানের অধীনে অনভিপ্রেত কিছু ঘটে তাহলে তার মানে এটা নয় যে আমাদের সংবিধান খারাপ বরং বলবো যে মানুষরাই বাজে।

গণতন্ত্রের আলোচনায় এটা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে গণতন্ত্রের রাজনীতি তার সংস্কৃতির ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন ও ইউরোপীয় গণতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনার সময় টক্‌ভিল এবং মন্তেস্কু উভয়েই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। ভারতে গণতন্ত্রের ধারণাটি সংকীর্ণ রাজনৈতিক অর্থানুযায়ী ঔপনিবেশিক মতাদর্শ থেকে আহৃত হয় এবং দেশীয় ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক বাদ দিয়ে আক্ষরিক ভাবে অনুবাদ করা হয়। ফলত যারা সাংস্কৃতিক দিক বাদ দিয়েই রাজনৈতিক ভাবে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী ছিল সেই মুষ্টিমেয় মানুষরাই স্বাধীনতা উত্তর ভারতের গণতন্ত্রকে স্বাগত জানায়। এক্ষেত্রে কে. এন. পানিক্কার জানান যে মধ্যযুগ ও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ উভয়েই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাক ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে ভারতের গণতন্ত্র সম্পর্কে উদার জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অনুমোদন বা মার্কসীয় সমালোচনা করেছেন। ভাষা এবং ধর্ম দেশীয় সংস্কৃতির এই দুই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে ঔপনিবেশিক মতাদর্শের অধীন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উদারপন্থী বা মার্কসবাদী উভয় বুদ্ধিজীবীদের ঐ অধীনতার সার্বিক বিরোধিতাকে সামগ্রিকভাবেই উপেক্ষা করা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন ঔপনিবেশবাদী 'উচ্চ' সংস্কৃতি এবং দেশীয় 'নিম্ন' সংস্কৃতির, যা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোন পৃষ্ঠপোষকতার মুখাপেক্ষী ছিল না, তাদের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বীতা ঔপনিবেশিক শাসন প্রত্যাহার করার বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছিল। ভারতের ঔপনিবেশ উত্তর কালীন গণতন্ত্রে মন্ত্রীদের দায়িত্ব শীলতা সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার বাদ দিয়েই সংসদীয় সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং কংগ্রেসের অবিভাবকত্বে তাকে পরিণত করার ফলে ঐ দুই সংস্কৃতির মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব আরো প্রকট আকার গ্রহণ করে। পরিণতি হিসাবে আমরা স্বাধীনতা উত্তর পর্বে গণতন্ত্রের দুটি ধারণা পাই। উদার ঔপনিবেশি ঝোঁক সম্পৃক্ত গণতন্ত্রের সরকারি ধারণা প্রান্তিক মানুষদের বিরুদ্ধে পক্ষপাত দুষ্ট ছিল। এক্ষেত্রে ক্ষমতার সচল উৎস বা সর্বধরনের উৎপন্ন বণ্টনে কেন্দ্রীকরণের বা জোর করে সমজাতীয়করণের প্রবণতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যেত। এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না যে কংগ্রেস ছিল একবাক্যে ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী সার্বিক সমন্বয়, কিন্তু এটাও লক্ষ্যণীয় যে কংগ্রেস ছিল 'উচ্চ' সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকদের সমন্বয়। গণতন্ত্রের ঐ কেন্দ্র প্রবণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উপর থেকে নীচে দেখার যে ধারণা চালু ছিল তাতে শ্রমিক, কৃষক বা দলিতদের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

২.৬ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অনুশীলন :

গণতন্ত্রের একটি বিকল্প ধারণা তথাকথিত 'নিম্ন' সংস্কৃতির সাপেক্ষে গড়ে ওঠে এবং তার স্থায়িত্ব তৈরী হয় সেই সব ঔপনিবেশ বিরোধী বা রাষ্ট্র বিরোধী গণআন্দোলনের মাধ্যমে, যা গণতন্ত্রের সরকার, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা সম্পৃক্ত মতাদর্শের ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। গণতন্ত্রের এই বিকল্প ধারণার মধ্যেও

এক ধরনের জোট লক্ষ্য করা যায়, যদিও সে জোট পূর্বের পৃষ্ঠপোষকদের জোট ছিল না। সেই জোটে সামিল ছিল বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন জনজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এবং তাদের জোট বদ্ধতার ভিত্তি ছিল উৎপন্নের যথাযথ বন্টনের দাবি। মনে রাখা প্রয়োজন যে ঐ জোট কৃত্রিমভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করে গড়ে তোলা হয়নি বরং বন্টন বৈষম্য ও অসমজাতীয়তার কারণেই তার জন্ম হয়। এক্ষেত্রে সন্দেহ নেই যে এই বিকল্প সংস্কৃতি জন্ম লগ্নে ছিল তরলীকৃত ও ভঙ্গুর প্রকৃতির। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার নয় যে 'উচ্চ' সংস্কৃতির ঝোঁক সম্পন্ন গণতন্ত্রের বহিরাগত ব্যাখ্যাকে মোকাবিলা করা ও সংখ্যা গরিষ্ঠ ভারতবাসীর নিজেদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে এটাই ছিল একমাত্র পছন্দ। ঔপনিবেশিকতা উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক সাজসজ্জার ছয় দশকের বেশী গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বর্তমানে এটা প্রায়ই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ভারতবাসী শক্তিশালী কেন্দ্রকে বিকেন্দ্রী করা এবং রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার জন্য গণতন্ত্র দাবি করছে। নব্বই-র দশকের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় স্তরে যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প গণতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা তাতে কিন্তু ঐ অস্থিতিকে স্বাগত জানানো হয় না। তবে জানানো হয় যে উন্নয়ন ও সম্পদ বন্টনে 'নিচের থেকে উপরে' যাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণকারী জোট দ্বারা যদি আঞ্চলিক চাহিদা ও প্রত্যাশাগুলির সমন্বয় সাধন করা যায় তাহলে এক সময় গণতন্ত্রের সাংস্কৃতিক শর্তগুলি পূরণ করা সম্ভব হবে এবং তা হবে ভারতীয় পরিবেশ উপযোগী। কিন্তু তার জন্য জোট গড়ে বা জোট ছাড়া সকল সংস্কৃতির সমন্বয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের প্রয়োজন। কৃষি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা আজও একভাবেই প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। গ্রামাঞ্চলে জমির মালিকানা সামাজিক রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের মানদণ্ড। শিল্পক্ষেত্রে বৃহৎ বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জন করেছে এবং তাদের হাতেই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ এবং ভারতের অর্থনীতির দরজা বিদেশী লগ্নীকারীদের কাছে খুলে দেওয়ার নীতি ভারতীয় অর্থনীতিতে দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতির প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। এক্ষেত্রে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির দাবী করা হলেও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সম্পদ বন্টনে যে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে তাতে জাতীয় সম্পদের ঐ বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করেনি। রাষ্ট্র ও জাতি গঠনে দুটি পৃথিবীর দৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে মুষ্টিমেয়-র স্বার্থ রক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে যেভাবে অবহেলা ও উপেক্ষা করা হয় তাতে গণতন্ত্রের কোন সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা নির্মাণ করা যায়না। বস্তুত ঔপনিবেশিকতা এবং ঔপনিবেশিক প্রভাবসমৃদ্ধ অনাবাসী ভারতীয় ও ভারতে বসবাসকারী অভারতীয় বিদেশী সংস্কৃতির সাপেক্ষে গণতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভাষ্য বা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই চাপা পরে গিয়েছে। এতৎসত্ত্বেও বলা যায় যে বর্তমানে ভারতের গণতন্ত্র সম্পর্কে নতুন ভাষ্যের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভারতের গণতন্ত্র বর্তমানে বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনগুলিতে বিপুল সংখ্যক ভারতবাসীর অংশগ্রহণ বিশ্বের দরবারে বৃহত্তর ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত গণতন্ত্র হিসাবে ভারতের গণতন্ত্রকে প্রতিভাত করেছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে ভারতের বৈচিত্র্যকে ঐক্যের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু বিগত নির্বাচনগুলিতে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন পার্থক্য ও সমস্যার সমাধান পাওয়ার দায়বদ্ধতা ঐ বৈচিত্র্যকে অন্যতম শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, শিশুমৃত্যু ইত্যাদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সহ্যশীল মূক ভারতবাসীকে শেষ বিচারে গণতন্ত্রের গভীরতা ব্যবহার করে সংগ্রামে ব্রতী করেছে। নিম্নস্তরের মানুষরা দীর্ঘকালের অবদমনের বিরুদ্ধে ভারতের গণতন্ত্রকে হাতিয়ার করছে।

২.৭ উপসংহার :

স্বাধীনতার ষাট বছরের ও বেশী পার করেও দলিত, অশিক্ষিত, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের গণতন্ত্র আর উচ্চবর্ণ, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তদের গণতন্ত্রের ধারণার পার্থক্য আজও মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। চার দিকে তাকালেই বোঝা যায় উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সংসদীয় গণতন্ত্রের সুযোগ সুবিধা, বিষয়সম্পদ, সুখ শান্তি, নিরাপত্তার সব অধিকার কিভাবে দখল করেছে। অর্থশাস্ত্রের ভাষায় বলা যায় ভারতীয় গণতন্ত্রের এলিট ক্যাপচার ঘটেছে। কিন্তু এসত্ত্বেও যেটা লক্ষ্যণীয় তা হল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতে গণতন্ত্র বজায় থাকা। গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে দরিদ্র অশিক্ষিত প্রান্তিক মানুষরা ভোট দিয়ে তাদের ইচ্ছামতো সরকার গঠনের কাজে সামিল হয়। কিন্তু ১৯৫১ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর তেষট্টি বছর পার হলেও দরিদ্র প্রান্তিক মানুষদের আশা আকাঙ্ক্ষা আজও সেভাবে প্রাধান্য পায় না কেন সেই প্রশ্নটি ভারতীয় গণতন্ত্রের এক বড় রহস্য। অবশ্য গণতন্ত্রের চাপে পড়ে সরকার বিভিন্ন সময় গরীব প্রান্তিক মানুষদের জন্য কিছু কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। তাই স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে গরীব প্রান্তিক মানুষদের অবস্থার ক্রমশই উন্নতি ঘটছে। দরিদ্রের হারও সামান্য কিছুটা কমেছে। এদিক থেকে ভারতীয় গণতন্ত্র আশার সঞ্চার করে। যোজনা কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৩-৭৪ সালে ৫৪.৯ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করতো। ২০০৪-০৫ সালে সেই অনুপাত কমে হয় ২১.৭ শতাংশ। তবে গণতন্ত্রই দারিদ্র কমার একমাত্র কারণ সেটা জোর করে বলা যায় না। তাছাড়া অসাম্য কমার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা নেই। আসলে ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীবের তুলনায় সংখ্যালঘু ধনীদের উন্নতি হয়েছে অনেক বেশী। কাজেই অসাম্য কমানোর ক্ষেত্রে ভারতীয় গণতন্ত্র ব্যর্থই বলা যায়। হার্ভার্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ে অর্থনীতিবিদ গলব্রেথ (Galbraith) ভারতের গণতন্ত্রকে 'ক্রিয়াশীল নৈরাজ্য' বা "functioning anarchy" বলে এবং গুনার মির ডাল (Gunnar Myrdal) ভারতকে 'নরম রাষ্ট্র' বা "Soft State" বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বর্তমানে যে কোন ধরনের নাশকতা মূলক কাজ বা সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি ভারতীয় গণতন্ত্রের নমনীয়তা আরো প্রকট হয়েছে। অন্য দিকে অকার্যকর প্রতিষ্ঠান, অপর্যাপ্ত কল্যানমূলক পরিসেবা, তীব্র দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, হিংসা ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্রিয়াশীল নৈরাজ্যকে আরো প্রকট করে তুলেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতের গণতন্ত্র আজও বজায় রয়েছে। প্রান্তিক মানুষদের ক্ষমতায়ন, সোচ্চার সামাজিক আন্দোলন, জনস্বার্থের বিচার বিভাগীয় স্বীকৃতি, নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার ইত্যাদি গণতন্ত্রের গভীরতাকে প্রকাশ করে।

২.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী :

1. বড়ো প্রশ্ন :

   (a) স্বাধীনতার পর ভারতের গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানীককীরণের প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা কর।

   (b) সংবিধান সভার ভূমিকা মূল্যায়ণ কর।

2. মাঝারি প্রশ্ন :

   (a) সংবিধান সভা কী গণ চরিত্র প্রতিফলিত করেছিল? সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

(b) ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

3. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(a) ভারতের সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমগুলি কি?

(b) ভারতীয় গণতন্ত্রে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি?

২.৯ গ্রন্থসূচি :

1. B. Shiva Rao (ed) : *The Framing of India's Constitution* (in 6 vols.), IIPA, New Delhi, 1967.
2. Bipan Chandra : *Essays on Indian Nationalism*, Har-Anand Publications, New Delhi, 1993.
3. G. Austin : *The Indian Constitution, Cornerstone of a Nation*, OUP, Delhi, 1966.
4. Paul R. Brass : *The Politics of India since Independence*, Cambridge University Press, Cambridge, 2nd Edn, 1994.
5. Apurba Mukhopadhyay : *Post-Colonial Democracy in India : Structures and Processes*, Setu Prakashani, Kolkata & New Delhi, 2013.
6. K. C. Suri (Ed) : *Indian Democracy : ICSSR Research Surveys and Explorations in Political Science in India*, Vol. 2, OUP, New Delhi, 2012.

একক ৩ ☐ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতা

গঠন :

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ

৩.৪ সমকালীন ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের কারণসমূহ

৩.৫ উপসংহার

৩.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.৭ গ্রন্থসূচি

৩.১ উদ্দেশ্য :

- ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণাটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা।
- পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে এই ধারণাটি কীভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।
- স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কীভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।
- সাম্প্রদায়িকতা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করা।
- স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি ব্যাখ্যা করা।

৩.২ ভূমিকা :

পাশ্চাত্য রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাস থেকে জানা যায় মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্মও রাষ্ট্রের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী সময়ে নানা ঘটনা পরম্পরায় ধর্ম ও রাষ্ট্র তথা রাজনীতির বন্ধন ছিন্ন হয় এবং আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী তার নিজ নিজ বিবেক ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণে স্বাধীনতা পায় কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার মত প্রতিষ্ঠা পায়। তবে ঐ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করনে ধর্মের ব্যবহার চালু থাকে। যদিও এখানে নাগরিক অধিকার বনাম রাষ্ট্র বিষয়ে ধর্ম কখনো হস্তক্ষেপ করে না। আধুনিকতাবাদের তাত্ত্বিকরা জানান ধর্মীয় আনুগত্য সংকীর্ণ এবং ঐ আনুগত্য ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বজনীন বিকাশ এবং প্রকৃতির উপর বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ ধর্মনিরপেক্ষ

বিচার বিবেচনা ও বিশ্বাসকে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করে। কিন্তু ভারতসহ পূর্ব ও পশ্চিমের নানা দেশের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা রাষ্ট্র ও রাজনীতি চিন্তায় নিরপেক্ষবাদীদের আতঙ্কিত ও হতাশ করছে। মৌলবাদী শক্তি ভারতে জাতিগঠন ও জাতি উন্নয়নকে প্রতিহত করে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও হানাহানিতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতা এমনই দুটি পৃথক বিষয় যেখানে একটির শক্তিবৃদ্ধি অন্যটির শক্তি হ্রাস নিশ্চিত করে। কাজেই এই আলোচনার লক্ষ্য হল স্বাধীনতা উত্তর ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি তার বাস্তব অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পর্যালেচনার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা কী, তা কীভাবে ভারতের ঐতিহ্যগত ঐক্য সংহতির পরিপন্থী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, জনজীবনে যুক্তি বিচার বুদ্ধি ও ন্যায়-নীতির নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করে, তা পর্যালোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করা।

৩.৩ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ :

মানবসমাজ ও জীবনে ধর্মের ভূমিকা কম হতে থাকার সূত্র ধরে ধর্মনিরপেক্ষমতার ধারনার উদ্ভব হয়েছে বলা যায়। বস্তুত মানুষের কাজকর্মের মধ্যে যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রভাব বাড়া ও ধর্মের প্রভাব কমার যুগপৎ ফলশ্রুতি হিসাবে ধারণাটির জন্ম হয়েছে। আর ধারণাটি মূলত যাজকীয় প্রভাব কমা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বাড়ার বিষয়টিকে নির্দেশ করে। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সাধারণত বোঝানো হয় যাজক বা চার্চ সম্বন্ধীয় এবং অযাজকীয় বা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়ের পৃথকীকরণ। ল্যাটিন শব্দ 'সেকিউলাম' যার অর্থ বিশ্বজনীনতা বা সর্বজনীনতা তা থেকে ইংরেজি সেক্যুলারিজ শব্দটির উদ্ভব। ইতিহাস থেকে জানা যায় ইউরোপে ১৬৪৮ সালে চার্চের সম্পত্তি বাজার অধিকার ও নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তর করার বিষয়টি বোঝাতে 'সেক্যুলারাইজেশন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পিটার বার্জার-এর অভিমত অনুসরণ করে বলা যায় সেক্যুলারাইজেশন হল সমাজ সংস্কৃতির কতকাংশ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও প্রতীকের এক্তিয়ার থেকে আলাদা করার প্রক্রিয়া। ১৮৫১ সালে নিরীশ্বরবাদী জর্জ জেকব হোলিয়োকে প্রথম সেক্যুলারাইজেশন শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন ইংল্যান্ডে একটি যুক্তিবাদী আন্দোলনে। তবে ফরাসী বিপ্লবের আগে এটি ছিল নিছক ঘটনা সংক্রান্ত মতামত। ফরাসী বিপ্লবের পর এটি ধীরে ধীরে মূল্য সংক্রান্ত মতামতে পরিণত হয়।

ইংরেজি 'সেক্যুলারিজম' শব্দটির বাংলা করা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করা হলে অনুবাদটি পর্যাপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে 'সেক্যুলারিজম' এবং 'সেক্যুলারাইজেশন'-এর পার্থক্য করা প্রয়োজন। বলা যায় সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা হল একটি মতাদশ বা আদর্শ। যে আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বা সরকারি কাজকর্ম ও প্রতিষ্ঠানের উপর ধর্মীয় হস্তক্ষেপ থাকবে না বলে জানান হয়। অনেকের মতে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে রাজনীতির মুক্তি। অক্সফোর্ড শব্দকোষ অনুযায়ী এটি এমন এক বিশ্বাস যার মূলকথা নৈতিকতা ও শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মানুসারী না হওয়া। অন্যদিকে সেক্যুলারাইজেশন হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ধর্মীয় সচেতনতা কার্যকলাপ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে প্রায় গুরুত্বহীন হয়ে যায়। সমাজতাত্ত্বিক টি. এন. মদন এটিকে ইউরোপে যুক্তিবাদ বিস্তারের মহান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বলে গণ্য করেছিলন।

৩.৪ সমকালীন ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের কারণসমূহ :

পশ্চিমী ধারার ব্যাখ্যায় ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সাধারণত ধর্মের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক, ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের

সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মর পরিবর্তে বিজ্ঞান যুক্তির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়। এটি এমন এক আদর্শ যা সকলপ্রকার অতিজাগতিকতা ও সেই অনুসারী মাধ্যমগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগ করা এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে অধর্মীয় বা ধর্ম বিরোধী নীতি প্রচার করে। তবে ভারত সহ অন্যান্য দক্ষিণ এশিয় দেশগুলির সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তার সাথে পাশ্চাত্য ধারণার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্যে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা যেভাবে নির্ধারিত ভারতে তার পার্থক্য আছে। ভারতে সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে একটি বিশ্বাস হিসাবে ধর্ম যেভাবে জড়িয়ে আছে তা পাশ্চাত্যের থেকে সব দিক থেকে আলাদা। এই কারণে ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে নিছক ধর্মের সাথে সম্পর্ক বর্জন করা বা ধর্মবিরোধিতাকে বোঝানো হয় না। তবে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র নায়করা এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে রাষ্ট্রের কাজকর্ম মূলত মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে। এখানে ধর্ম বিশ্বাসের ভূমিকা নেই বললেই চলে। কাজেই মানুষের বা নাগরিকের ধর্মবিশ্বাস নির্ধারণ বা তার পরিপোষণে রাষ্ট্রের দায় থাকে না। সেটি নাগরিকের একেবারেই ব্যক্তিগত বিষয়। কাজেই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ থাকাই উচিত। এই প্রসঙ্গে আম্বেদকারের অভিমত ছিল রাষ্ট্র মানুষের উপর কোন ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। কোন রাষ্ট্রকে ধর্ম নিরপেক্ষ হতে গেলে নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা একান্তই প্রয়োজন। একারণে আম্বেদকার স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা দাবী করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী সকল ধর্মের প্রতি সম-মনোভাব অধিকার ও বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠার সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। তিনি সব ধর্মের প্রতি একইভাবে শ্রদ্ধা পোষণের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলত তাঁর অভিমত ছিল রাষ্ট্র কোন ধর্মের পক্ষপাতীত্ব করবে না। কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন 'রাষ্ট্র' একটি সামগ্রিক বিষয় কিন্তু 'ধর্ম' একটি ব্যক্তিগত বিষয়। ফলে সামগ্রিক সমষ্টিগত স্বার্থের কারণেই রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ধর্মের পৃষ্টপোষকতা যেমন করবে না তেমনই তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণও করবে না। তিনি ধর্ম ও রাষ্ট্রের পার্থক্য করে 'সর্বধর্ম সমভাব'-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। নেহেরু 'সর্বধর্ম সদ্ভাব'-এর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় গণ্য করলেও তা যে সমাজ পরিবর্তন বা উন্নতির কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে সে বিষয়ে সজাগ ছিলেন।

ভারতের বহু অংশ সমন্বিত সংস্কৃতির কথা বিবেচনা করে তিনি ধর্মীয় সহনশীলতাকে রাষ্ট্রের নীতি হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নেহেরু মূলত ধর্ম বিবর্জিত রাজনীতি চর্চার সমর্থক ছিলেন। সুতরাং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির ধর্মনিরপেক্ষতা পাশ্চাত্য অর্থের দিক থেকে অনেকটাই আলাদা। পাশ্চাত্যে ঈশ্বরের উপর গুরুত্ব না দিয়ে মানবতাবাদী আদর্শ অনুসরণ করে মানুষের সার্বভৌমত্বের ধারণায় আস্থা জানান হয় এবং দাবি করা হয় মানুষ নিজে তার ভাগ্য রচনা করন। কিন্তু দক্ষিণ এশিয় দেশগুলিতে এই বস্তুবাদী ধারণা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল। ফলে শিক্ষা, রাজনীতি, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্যে বিভিন্ন ধর্মকে রক্ষা করা বা তাদের সমন্বয় করা সেক্যুলারিজম-এর বিষয় নয়। তাই বলা যায় পাশ্চাত্যের সেক্যুলারিজম আর ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা এক নয়। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে ধর্মীয় সহনশীলতা। পাশ্চাত্য সেক্যুলারিজম-এর ধারণায় চরমতাবাদ, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা হয় যে বিশেষ ধর্মীয় মূল্য কখনোই অন্য মূল্যকে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ যুক্তিগতভাবেই বলা যায় যে যদি বিশেষ ধর্মীয় মূল্য প্রাধান্য পায় তাহলে বহুধর্ম সমন্বিত সমাজে ধর্মীয় সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা বা সর্বধর্ম সমভাবের নীতি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয় দেশগুলির একেকটি দেশে বিশেষ বিশেষ ধর্মের আধিপত্য

ও সংখ্যাধিক্য থাকায় এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা আদতে এমন একটি হাতিয়ার যা সংস্কৃতির রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ বা ধর্মীয় সংঘাত প্রতিহত করতে সাহায্য করে। বস্তুত ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ লগ্নে অবিভক্ত ভারতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতায় ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল একমাত্র উপায়। দক্ষিণ এশিয় দেশগুলির অভিজ্ঞতার নিরিখে এটা বলা যেতেই পারে পাশ্চাত্ত্য সেকুলারিজমের ধারণা বা ধর্ম ও রাষ্ট্র বা রাজনীতির চূড়ান্ত পৃথকীকরণ এর নীতি অনুসরণ বা অনুকরণ সবার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হতে পারে না। কারণ রাষ্ট্রের কাজকর্ম ও ধর্মের সম্পর্কের বিষয় বিবেচনা করে উভয়ের মধ্যে বিভাজনরেখা নির্দেশের পাশ্চাত্ত্য ধারা দক্ষিণ এশিয় দেশগুলিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাছাড়াও বলা যায় আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণা ও সকল নাগরিক ও সম্প্রদায়কে সমান গণ্য করার প্রবণতার সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি গভীর ভাবেই সম্পর্কিত।

৩.৫ উপসংহার :

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাবে সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী রাষ্ট্রের স্বরূপ নির্ধারণে গণপরিষদের সদস্যগণ সর্বসম্মতভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। এ. এস. আয়েংগার বলেছিলেন 'আমরা রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'। কিন্তু মজার বিষয় হল মূল সংবিধানের কোথাও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি দেখা যায় না। তবে 'ভারত' রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন ধর্ম নেই। সরাসরিভাবে কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণও নয়। কোন ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতাও করেনা। ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার সব থেকে বড় পরিচয় সংবিধানের ২৫-২৮ নং ধারায় উল্লিখিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার। তাছাড়া সর্বোচ্চ আপীল আদালতে বিভিন্ন মামলায় ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা যে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামো তা জানানো হয়েছে। সংবিধানের ১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে কারো প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। সুতরাং বলা যায় যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান সকল ধর্ম, ধর্মগোষ্ঠী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা স্বীকার করেছে। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে ঐ স্বাধীনতা অবাধ প্রকৃতির নয়। জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, নৈতিকতা ও সদাচারের কারণে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল স্বাধীন ভারতর সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতে এমন এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চান যেখানে সব ধর্মের মানুষ নিজের বিশ্বাস ও ধর্মাচরনের স্বাধীনতা পাবে এবং সবধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি সহ্যশীল ও শ্রদ্ধাবান থাকবে। রাষ্ট্র সর্বধর্ম সমভাবের নীতির ভিত্তিতে কারও প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। কিন্তু রাষ্ট্রের এই নীতি চূড়ান্ত বিচারে নানা সমস্যা তৈরী করে।

প্রথমত, ধর্মের নিরিখে জনসম্প্রদায়কে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যা লঘু বলে চিহ্নিত করা হয়।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক পরিচয় ও ধর্মীয় পরিচয় এক করা হয়।

তৃতীয়ত, ধর্মহীন সর্বজনীন আইনের ক্ষেত্র নির্মাণে উদ্যোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

চতুর্থত, রাজনৈতিক বা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৈষম্যমূলক আইন ও নিয়মকানুন বলবৎ করণের উদ্যোগ বন্ধ করা হয় না।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ব্যবহারিক আচরণে ধর্মাসক্তি ও ধর্মীয় পক্ষপাতের পরিচয় পাওয়া যায়।

ষষ্ঠত, সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে স্বীকৃতি জানানো সত্ত্বেও ধর্মের রাজনীতিকরণ এর প্রতি সরকারী দুর্বলতা কার্যত সাম্প্রদয়িকতার বিস্তারে সাহায্য করছে।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে দক্ষিণ এশিয় দেশগুলিতে বহুক্ষেত্রেই সেক্যুলারিজম-এর আদর্শ অনুযায়ী ধর্ম ও রাজনীতির স্বাতন্ত্র বজায় থাকেনি। ধর্মনিরপক্ষতা বনাম সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্নে নির্বাচনী রাজনৈতিক লড়াই ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। রাষ্ট্র ও জাতি গঠনে সংগঠিত ধর্মীয় গোষ্ঠীর আধিপত্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। রাষ্ট্রনায়ক বা রাজনৈতিক নেতারা কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষে সমাজ ও নাগরিক জীবনে রাজনীতির ধর্মীয়করণ ঘটিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে টি. এন. মদন বলেছেন ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম মতের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তিনি আরো জানান আধুনিকতাবাদের তাত্ত্বিকরা ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রচারে প্রাচ্যের দেশগুলিতে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে পশ্চিমের অনুকরণে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রয়োগ করার পরামর্শ দেন। ফলে পাশ্চাত্যে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ হল একটি সাধারণ বিষয় যা যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান মনস্কতার সহায়ক। কিন্তু প্রাচ্যের দেশের মানুষের কাছে তা হয়ে ওঠে নিজের সংস্কৃতি বা নিজস্বতা হারানোর সমতুল্য। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রয়োগ বা প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্যের অনুকরণ নয়, এক্ষেত্রে সমস্যা বোঝা ও তার সমাধানে ধারনাটির সার্বিক রূপান্তর প্রয়োজন।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে সাংবিধানিক বিধিবিধান বা স্বাধীনতা উত্তর রাষ্ট্রের আচারের ভিত্তিতে ভারতকে কোন ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী রাষ্ট্র বলা যায়না। কারণ এক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্র যথেষ্ট উদার ও সার্বজনীন চরিত্রের, আসলে সাংবিধানিক কাঠামো ও ব্যবহারিক রাজনীতির ভিত্তিতে ভারতকে একটি আধা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে গণ্য করতে হয়। সকল ধর্মের প্রতি সমদুরত্ব বজায় রাখার যে প্রচেষ্টা রাষ্ট্র করে 'সর্বধর্ম সমভাব' ধারণার সঙ্গে তা অসঙ্গতিপূর্ণ। অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা যায় যে ভারতীয় রাজনীতিতে রাষ্ট্র বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলিও অনৈতিকভাবে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করছে। ভারতের বহুদলীয় সংসদীয় রাজনীতিতে ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখার স্বার্থে যা করা হচ্ছে তা আর যাই হোক ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি শক্ত করে না। ভারতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই আজ ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে এবং নেহাতই ভ্রান্ত রাজনৈতিক খেলায় সামিল হয়েছে। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল আজও ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধে সেই মানুষরাই সামিল হয় যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বা তথাকথিত অর্থে আধুনিক নন। এমন কি তারা প্রয়োজনে নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেন না। এক্ষেত্রে রজনী কোঠারী, আশীষ নন্দী এবং টি. এন. মদন প্রমুখ জানান দক্ষিণ এশিয়ার নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধিক ও সম্প্রদায় বিরোধী আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় ধর্মের পরিবর্তে অ-ধর্মীয় উপাদানের সাপেক্ষে সাম্প্রদায়িকতাকে সনাক্ত করা হয়। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ বা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ধর্মকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত গণ্য করে কার্যত ধর্মানুগ্রামী সকল দেশবাসীকে সাম্প্রদায়িক বলে গণ্য করেন। কাজেই এটা বোঝার ক্ষেত্রে অসুবিধা থাকার কথা নয় যে বিকৃত ও বিভ্রান্তিমূলক ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ধর্ম বিষয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়াই প্রকৃত বিচারে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহত করে।

ব্যক্তি মানুষকে বা সামাজিক গোষ্ঠীকে ধর্মের সাপেক্ষে পরিচিত করা এবং সেই পরিচয় অনুযায়ী সমাজে ভেদাভেদ বিদ্বেষ তৈরী করা কেবল গণতন্ত্র বিরোধী নয় তা অযৌক্তিক এবং মানবতা বিরোধী।

আসলে সমাজে মানুষের বিকল্প চিন্তাধারা বিশ্বাস এবং আচার ব্যবহার অনিবার্যভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও সংঘাত সৃষ্টি করে না। সমাজে সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাক্ আধুনিক বন্ধনের পরিবর্তে একটা হিসাবী সুযোগ সন্ধানী বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্প্রদায় যখন আকারে বড় হয় তখন সরকারের থেকে বাড়তি সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে আর যদি আকারে ছোট হয় তাহলে সরকারের পক্ষপাতীত্ব দাবী করে। এই প্রসঙ্গে সুদীপ্ত কবিরাজ মন্তব্য করেছেন স্বাধীনতার পর ভারতে এক ধরনের দেশীয় প্রবর সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে যারা ভারতীয় সংস্কৃতিরমূল সুর বুঝে সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতা অর্জনের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করার কৌশলটা জানে। বস্তুত স্বাধীনতা উত্তর ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যা বাড়িয়ে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ অটুট রাখার ক্ষেত্রে ঐ সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভীষণভাবেই দায়ী। আরো বলা যায় যে বিগত শতাব্দীর শেষ ও নতুন শতাব্দীর শুরু থেকে বিশ্বায়ন কেবল মাত্র ভারতের মতো দেশগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করেনি বরং দ্রুত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশের ঐতিহ্য ও পরম্পরারও বদল ঘটিয়েছে। ফলে যেমন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনই রাজনৈতিক মূল্যবোধও নৈতিকতার ক্ষয় দেখা দিয়েছে। বেকারী দারিদ্র বৃদ্ধি পেয়েছে। তেমনই সামাজিক সমস্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, জাতিগত বা গোষ্ঠীগত সমস্যা ও বিভাজন বেড়ে গিয়েছে। যা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যা বাড়িয়ে জন্ম দিয়েছে নতুন বিবাদমান গোষ্ঠীর ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের।

স্বাধীন ভারতের অন্যতম বড় বিপদ ও দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ হল সাম্প্রদায়িকতা। এটা কোন কাল্পনিক সমস্যা নয়, এটা বাস্তব সমস্যা। সাম্প্রদায়িকতা যেমন ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত দুর্বল করেছে তেমনই জাতীয় ঐক্যকে বিপন্ন করে তুলেছে। অথচ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের সুমহান ঐতিহ্য। নানা ভাষা, নানা মত নিয়েই তৈরী হয়েছে ভারতীয় কৃষ্টি। ঔপনিবেশিক শাসন-পূর্ব ভারতে সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রত্যক্ষ মদতে ধর্মের মতো আবেগ প্রবণ বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য আরোপের প্রশাসনের সূত্র ধরেই সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ। অথচ ইংরাজী কমিউনিটি যার বাংলা শব্দ সম্প্রদায় থেকে জন্ম নিয়েছে ইংরেজি Communalism বা বাংলা সাম্প্রদায়িকতার ধারণা। বাংলা শব্দকোষ অনুসরণ করে বলা যায় সম্প্রদায় হইতে আগত বা পরম্পরা প্রাপ্ত বিষয় হল সাম্প্রদায়িকতা বা সম্প্রদায় বিশেষের মতাবলম্বী বিষয় হল সাম্প্রদায়িকতা। এই দিক থেকে বিচার করা হলে সাম্প্রদায়িকতা সব ক্ষেত্রে নেতিবাচক বা বিপদের বিষয় নয়। কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রদায়গতভাবে সংকীর্ণ মানসিকতার জন্ম হলে এবং নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ পূরণের জন্য অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতি করতে উদ্যোগী হলে সেই পরিস্থিতিকে সাম্প্রদায়িকতা বলা হয় এবং তখন ত অবশ্যই নেতিবাচক এবং বিপদের। এটি বিপদের বিষয় কারণ এখানে ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকসত্ত্বা অগ্রাধিকার পায়। ফলে সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক সদস্য তার সম্প্রদায় নির্ধারিত নিয়ম-কানুনকে মান্যতা দিতে বাধ্য হয়।

তাছাড়া একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী হিসাবে সম্প্রদায় গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ধর্ম, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস বা পোষাক পরিধান রীতি ইত্যাদি কাজ করে। এদিক থেকে দেখা যায় একটি নৈতিবাচক শক্তি বা একটি বিপদ হিসাবে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকলেও সাম্প্রদায়িক পরিচিতি নির্মাণে ধর্ম একমাত্র মাধ্যম নয়। কিন্তু ভারতের মতো সমাজে ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজজীবনে গভীরভাবে সম্পর্কিত থাকায় সম্প্রদায় চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ধর্ম অগ্রাধিকার পায়। এই প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর জানান ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে যোগ সম্পর্ক থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিষ্ঠা স্বতন্ত্র জিনিস। কাজেই বলা যেতে পারে, ধর্ম থেকে ধর্মান্ধতা এবং ধর্মান্ধতা থেকে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা জন্ম নেয়। এই পরিস্থিতিতে ধর্মের

আধ্যাত্মিক দিক প্রাধান্য পায় না বরং ধর্মান্ধ হয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অস্তিত্ব বিকাশের নেতিবাচক রাজনীতিকে প্রকট করে তোলা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারতে সাম্প্রদায়িকতা হল সেই আধুনিক বিষয় যা রাজনীতির সাথে গভীর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকটও বিপদ বাড়িয়েছে।

তাই বলা যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম ও সমাজবদ্ধ মানুষ উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তিগত আচার-আচরণের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে সেই ধর্মবিশ্বাসকে গণ রাজনীতির পরিধির অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টাই হল সাম্প্রদায়িকতা। এই অবস্থায় ব্যক্তি তার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচার বিবেচনাগুলি তার ধর্ম পরিচিতি অনুযায়ী বিবেচনা করা শুরু করে। ধর্মীয় মনোভাবকে সমস্তক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয় এবং ধর্মের প্রভাব ব্যক্তির জীবনের গণ্ডী পার হয়ে সমাজের চালিকা শক্তিতে পর্যবসিত হয়। সাম্প্রদায়িকতার বহুমুখী প্রভাব বিবেচনা করে কে. এন. পানিক্কার মন্তব্য করেছিলেন শেষ বিচারে সাম্প্রদায়িকতা একটি মতাদর্শ, একটি ভ্রান্তচেতনা, দুষ্প্রাপ্য সম্পদ পাওয়ার জন্য লড়াই। কাজের সুযোগ পাওয়া বা কর্মসংস্থানের জন্য অনৈতিক প্রতিযোগিতা, শাসকদের স্বার্থ চরিতার্থ করার রাজনৈতিক হাতিয়ার।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র সাম্প্রদায়িকতাকে সেই বিশ্বাস বলে গণ্য করেছেন যেখানে কোন একটি বিশেষ ধর্ম অনুসরণকারী মানুষরা তাদের ধর্ম সাপেক্ষে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে এক বলে গণ্য করে। এটা হল সেই বিশ্বাস যার ভিত্তিতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও শিখরা হল স্বতন্ত্র ও ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত ও সংহত। এই বিশ্বাস অনুযায়ী একটি ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের কেবল ধর্মীয় স্বার্থই এক নয় তাদের ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থ, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ এক ও অভিন্ন বলে মনে করা হয়। এই কারণে অধ্যাপক বিপান চন্দ্র সাম্প্রদায়িকতাকে একটি ভ্রান্তচেতনা বলে গণ্য করেছেন। তিনি একে পেটি বুর্জোয়া মানসিকতার সাথে তুলনা করেছেন।

সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা হল সেই বিপদ যা মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ককে সম্প্রদায়গত আনুগত্যের ভিত্তিতে বিযাক্ত করে তোলে। সমাজে ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ-এর পরিমণ্ডলকে লালন করে। সাম্প্রদায়িকতা এমন একটি পরিবেশ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে যেখানে গণতন্ত্র বিলীন হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িকতার ধারণাটি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে একটি বৃহত্তর ও বিপদজনক ধারণা। যা কখনোই কোন একটি মাত্র কারণের পরিণতি নয়। সাম্প্রদায়িকতা নিছক হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের বা হানাহানির সম্পর্ক নয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় বিপান চন্দ্র, সুমিত সরকার, দীপেশ চক্রবর্তী প্রমুখ ভারতীয় ইতিহাসচর্চাকারীগণ সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণগুলির উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কারণ ভারতের বহুত্ববাদী সমাজের গোষ্ঠীসত্তা ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থকরণের প্রক্রিয়া ও কায়েমী স্বার্থ পূরণের প্রয়াসে সাম্প্রদায়িক সত্তায় পরিণত হয়। প্রাক্-ঔপনিবেশিক শাসনের পর্বে সাম্প্রদায়িকতা সেভাবে প্রতিভাত ছিল না। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে কোথাও কোথাও ধর্মীয় সংঘাত দেখা গেলেও সংগঠিত ধর্মীয় সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ব্রিটিশরা ভাগ কর ও শাসন কর নীতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দ্বিজাতি তত্ত্বের যে বিচার বিবেচনা জন্ম নেয় তা সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও শক্তিকে পুষ্টি জোগায়। এই প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে তোলা, সাম্প্রদায়িক পত্র-পত্রিকার প্রকাশ ইত্যাদি দিকগুলিও সাম্প্রদায়িকতার বিকাশে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। স্বাধীন ভারতে ধর্মের রাজনীতিকরণ, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের প্রভাব বৃদ্ধি ঘটা,

ভারসাম্যহীন ও বৈষম্যমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা, আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি একত্রে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে।

ঔপনিবেশিক শাসন পর্ব থেকে স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িকতার যে বিভিন্ন রূপ বা ধরণ লক্ষ করা গিয়েছে সেগুলিকে অধ্যাপক বিপান চন্দ্র তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। যথা— সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ, উদারনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা এবং চরম বা ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদে সম্প্রদায়গত বিকাশের প্রাথমিক উন্নয়মূলক উপাদান এবং সম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রকাশ ও চরিতার্থ করার দিক থেকে কার্যকরী হয় এই সাম্প্রদায়িকতা এবং এখানে জাতীয়তাবাদের মূল কাঠামোর বহিরঙ্গের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ লুকিয়ে থাকে। উদারনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা, উদারপন্থী, গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলির প্রতি সমর্থন জানালেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক স্বার্থ বিভিন্ন বলে মনে করা হয় এবং সেই স্বার্থগুলি বিভিন্ন চাপ সৃষ্টি ও দড় কষাকষির মাধ্যমে আদায় করার চেষ্ট করা হয়। চরম বা ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িকতা হল সাম্প্রদায়িকতার সবথেকে ক্ষতিকারক বা ভয়াবহ রূপ। এই সাম্প্রদায়িকতায় যুক্তির কথা বিবেচনা করা হয় না। ভয় বা ঘৃণা প্রতিষ্ঠা এর লক্ষ্য। বিরোধী সম্প্রদায়ের উপর হিংসা প্রয়োগ, সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থপূরণ এই সাম্প্রদায়িকতার প্রধান লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে শিখ সাম্প্রদায়িকতা, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা এভাবেও ভাগ করা হয়।

স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িকতা কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই তার ব্যাপ্তী ঘটেছে। আর তার সম্প্রসারণ হয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের আর্থিক ও অন্যান্য অসাম্যকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টায়। রাজনৈতিক নেতারা বা দলগুলি নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য যে কোন পথ বা কৌশল গ্রহণ করেছেন, যার পরিণতি হিসাবে সাম্প্রদায়িকতা এখন সর্বাত্মক রূপ ধারণ করেছে। সাম্প্রতিককালে রজনী কোঠারী, আশীষ নন্দী, টি. এন. মদন প্রমুখ দক্ষিণ এশিয় দেশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে জানান এই অঞ্চলের নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবী ও সম্প্রদায়বিরোধী আলোচনায় দেখা যায় ধর্মের পরিবর্তে অ-ধর্মীয় বিষয়ের আলোকে সাম্প্রদায়িকতাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু এতে ধর্মানুরাগী সকলকে সাম্প্রদায়িক বলে মনে করতে হয়। যা কোনভাবে সঠিক নয়। গান্ধীজী রাজনীতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি রাজনীতিতে অনেক ধর্মীয় ভাষা বা সংকেত ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভারতীয় কৃষ্টির 'সর্বধর্ম সমভাব' রক্ষা করার জন্য যে কোন সাম্প্রদায়িক চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এমন কি নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। ভারতীয় পরম্পরা অনুযায়ী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মীয় সহনশীলতাই হল সব থেকে বড় নিশ্চয়তা।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পুঁজি বিশ্বায়নের সাথে যে স্বার্থ জুড়ে আছে, প্রতিদেশের উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থার বিশ্বজনীন চরিত্র নির্মাণের যে প্রচেষ্টা চলছে, তাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে ইন্ধন জোগান হচ্ছে। নতুন বিবাদমান গোষ্ঠীর জন্ম দেওয়া হচ্ছে। এটা সহজেই অনুভব করা যাচ্ছে যে বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব ছোট হয়েছে না বড় হয়েছে তার বিচার বড় কথা নয়। কিন্তু মানুষ ক্রমশই বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের মধ্যে উত্তেজনা হিংসা বাড়ছে এটা ঘটনা। সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ ইত্যাদিরও বিশ্বায়ণ হচ্ছে। অর্থাৎ বলা যায় বিশ্বায়ন বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মীয় মৌলবাদীদের সঠিক আশ্রয় হয়ে উঠেছে।

সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই কেবল রাষ্ট্র বা সরকারী স্তরে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সমাজের সকল স্তরকেই আজ ঐ লড়াই-এ সামিল হতে হবে। সংখ্যা লঘুর স্বার্থ নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা কেবল রাষ্ট্রীয় ঘোষণার বিষয় নয়। প্রয়োজন সমাজের সার্বিক সদিচ্ছা। সকলের মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

প্রয়োজন। তাই সমাজের নিম্নস্তর থেকে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, নিরপেক্ষ বলিষ্ঠ ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গঠন, দুর্বল পক্ষপাত পূর্ণ সরকারী নীতির বদল ইত্যাদি ভীষণ ভাবেই জরুরী। সর্বোপরি ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতির ভিত্তি মজবুত করা এবং জাতীয় সংহতির ভিতকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। নিছক অবস্থানগত পরিবর্তন না ঘটিয়ে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। কারণ, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বা মুসলিম মৌলবাদ রাজনীতির মূল ধারায় যে রকম নিবিড়ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে সেই রাজনীতি চর্চায় ধর্ম বিশ্বাসের স্তর নিতান্তই অগভীর। গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য স্থাপন নির্মাণে উন্নত প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন গণ মাধ্যমের ব্যবহার ঐ অগভীর ধর্মবিশ্বাস অনুন্নত দেশগুলির বিভিন্ন প্রান্তে রাজনীতি ও সমাজচর্চার এক নতুন আঙ্গিকের সূচনা করেছে। ফলে রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি তৈরী হচ্ছে নিছক ধর্মের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচার প্রণালীর সমন্বয়ে নয়। সংখ্যা গুরু না সংখ্যা লঘু তার বিচার সাপেক্ষে ধর্মীয় গোষ্ঠীর অধিকার বোধ তৈরী হচ্ছে। আর ঐ অধিকার আদায়ে ধর্মীয় পরিচিতির ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই লড়াই-এর ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করছে এবং তা দেশ কালের সীমা পার হয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে স্থানীয় ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন ধর্মীয় রাজনীতির সুচারু মেলবন্ধন ঘটাচ্ছে। আধুনিকতার নানা উপাদান ব্যবহার করে মৌলবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি আধুনিকতা বিরোধী সনাতন ধর্মমত ও বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী। সম্প্রদায় মনস্কতার দ্বারা শ্রেণী সচেতনতাকে আবৃত ও অবদমিত রাখাই এই মৌলবাদী সংগঠনগুলির মূল উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির ব্যাপারীরাও এই কাজে সামিল হয়েছে। ফলে স্বাধীনতার পর প্রথম চারটি দশক ধরে সর্বধর্ম সমভাব এর ভাবমূর্তি আশির দশক থেকেই আন্তর্জাতিক বাজার অর্থনীতির চাপে পরিবর্তন হতে শুরু করে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানটি সম্প্রদায় নির্ভর হয়ে পরে। নাগরিক সমাজেও ধর্মীয় গোষ্ঠী চেতনার আধিপত্য বাড়তে থাকে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় আজ মৌলবাদী ভাবধারার প্রাবল্যে আবৃত এবং রাজনীতিচর্চায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক চেতনায় আচ্ছাদিত। ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে ধর্মসাপেক্ষ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বর্জন-ই এখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূলবৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা আর সাম্প্রদায়িকতা একে অপরের অনুবর্তী সামাজিক রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া হিসাবে ভারতে জনজীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। তবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য যেহেতু ভারতের দীর্ঘ পুরাতন ঐতিহ্য তাই সাম্প্রদায়িকতা এককভাবে ভারতের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল নয়। তাছাড়াও স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তার প্রকরণ, আচারবিধির উপস্থিতি বলিষ্ঠভাবে টিকে থাকায়, তা ভারতের রাজনীতির পরিপূর্ণ সাম্প্রদায়িকীকরণে প্রতিষেধক রূপে কাজ করছে।

৩.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী :

1. বড়ো প্রশ্ন :
   (a) সাম্প্রদায়িকতার আধুনিক চর্চার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা কর।
   (b) স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি চর্চার মূল সমস্যাগুলি বিবৃত কর।
2. মাঝারি প্রশ্ন :
   (a) সাম্প্রতিককালে সাম্প্রদায়িকতার পুনরাবির্ভাবের কারণগুলি কি?
   (b) ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

3. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(a) সাম্প্রদায়িকতাকে সংজ্ঞায়িত কর।

(b) ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করা যায় কি?

৩.৭ গ্রন্থসূচি :

1. Kaviraj, Sudipta, 'Religion, Politics and Modernity' in Baxi, U and Parekh, B (Eds) *Crisis and Change in Contemporary India.* (New Delhi, Sage, 1995).
2. Madan, T.N., 'Secularism in its place', *The Journal of Asian Studies, Vol. 46, No.4,* 1987.
3. Beteille, A, 'Civil Society and its Institutions'. The first Fulbright Memorial Lecture, USEFI, Kol., 22 February, 1996.
4. Mukhopadhyay, Apurba, 'Against Secularism : For an Alternative Discourse' in Dattagupta, Sobhanlal (Ed), *India : Politics and Society,* (Kol., K.P.Bagchi, 1999).
5. Chatterji, Rakhahari (Ed), *Religion, Politics and Communalism : The South Asian Experience,* (New Delhi, South Asian Publishers, 1994), See the introduction by the editor.
6. Sen, Amartya, 'Secularism and its discontents' in Basu, Kaushik and Subrahmanyam, S(Eds), *Unraveling the Nation* (New Delhi, Penguin Books, 1996). P. 13.
7. Varshney, Asutosh, *Ethnic Conflict and Civic Strife* (New Delhi, OUP, 2002).
8. Bhargava, Rajeev, (Ed), *Secularism and its critics*– OUP, New Delhi, 1998.
9. Paul, Brass, *The Politics of India since Independence,* Cambridge University Press, Cambridge, 2nd Edn, 1994.

একক ৪ ❑ ভারতের রাষ্ট্র এবং জাতি গঠন

গঠন :

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৪.৪ স্বাধীনতার পর জাতি ও রাষ্ট্রের নির্মাণ

৪.৫ উপসংহার

৪.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.৭ গ্রন্থসূচি

৪.১ উদ্দেশ্য :

- জাতি রাষ্ট্র হিসাবে 'ইন্ডিয়া' তথা 'ভারতের' উদ্ভবের পটভূমি ব্যাখ্যা করা।
- স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনের ধারায় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং বিকাশ ও তার পরিণাম হিসাবে স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের আবির্ভাব অনুধাবন করা।
- রাষ্ট্রের নির্মাণ ও জাতির নির্মাণের বহুমাত্রিক জটিল আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ।
- জাতি গঠনের সমস্যা ও সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করা।
- রাষ্ট্র নির্মাণের সমস্যা ও সম্ভাবনা অনুধাবন করা।
- স্বাধীন ভারতে জাতি রাষ্ট্র গঠনের সমকালীন সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করা।

৪.২ ভূমিকা :

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর একটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের আবির্ভাব। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে আছে ১০০ বছরেরও বেশি সময় ব্যাপী ভারতীয় জনগণের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী এক দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস। তাই, ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদের ধারণাটি উপনিবেশ বিরোধী নানা সংগ্রামের টানাপোড়নের ভিত্তির উপর নির্মিত। তাছাড়া একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে ভারতের ধারণাটি ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর কালপর্বে বহু সমস্যা ও সংকটের উপর দাঁড়িয়ে

আছে। এক অর্থে ভারত এখনও প্রকৃতপক্ষে একটি নির্মিয়মান জাতিসত্ত্বা যা আবর্তিত হচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় রাজনীতির অনেক গবেষকদের মতে ভারতে জাতির নির্মাণ ঔপনিবেশিকোত্তর রাষ্ট্র নির্মাণের পরবর্তী একটি প্রক্রিয়া। তাই ভারতে জাতি গঠন হচ্ছে রাষ্ট্র গঠনের আগে নায়, পরে। এই অর্থে পাশ্চাত্যের জাতি রাষ্ট্রগুলির যেমন ফ্রান্স, ইংলন্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐ সব দেশে জাতির আবির্ভাব ঘটেছিল এক বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক বিপ্লবের মধ্যস্থতায় এবং আধুনিক শিল্পমুখী এক বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে। ভারতের ক্ষেত্রে এক বিপরীত সুপ্রাচীন সভ্যতার বহুবিধ রূপান্তরের মাধ্যমে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পরবর্তী পর্যায়ে নতুন রাষ্ট্রের নানাবিধ চাহিদা পূরণের প্রক্রিয়ায় জাতি গঠনের প্রয়াস শুরু হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় যেখানে জাতিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের নির্মাণ, ভারতবর্ষে সেখানে রাষ্ট্রকেই কেন্দ্র করে জাতির নির্মাণ কিংবা বিনির্মানের চর্চার সূত্রপাত।

৪.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

জাতি এবং রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হলে দেখা যায় পশ্চিম ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের সময় জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাটি জন্ম নিয়েছিল। অনেকে মনে করেন পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা লগ্নের পর্বে নতুন সামাজিক শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশকারী বুর্জোয়া শ্রেণী পণ্য বিক্রয় এবং মুনাফা সংগ্রহের বাজার তৈরীর লক্ষ্যে জাতি-রাষ্ট্র গড়ার কাজে সামিল হয়েছিল। অনেকে আবার জাতি ও রাষ্ট্রকে সমার্থক মনে না করে মনে করেন একটি জাতীয় জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং সার্বভৌম স্বাধীনতা অর্জন করে জাতিতে রূপান্তরিত হয়। বলা যায় ঐক্যবদ্ধ চেতনা হল, জাতির ভিত্তি এবং জাতির ধারণা হলো সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক। কাজেই লক্ষণীয় বিষয় হল তত্ত্বগতভাবে সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যবদ্ধ চেতনা সমৃদ্ধ জাতীয় জনসমাজের আনুগত্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষ একটি বহু জাতি সমবেত দেশ। এখানে বিভিন্ন জাতির সাধারণ অতীত (Common Past) বিভিন্ন। ফলে এখানে জাতি গঠনের সাধারণ অতীত রূপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতাকে তুলে ধরা হয়। রজনী পাম দত্তকে অনুসরণ করে বলা যায় ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের স্বার্থে ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী সনাতনী ভারতকে ভেঙে ইতিহাসের অচেতন শক্তি হিসাবে ভারতে নতুন সমাজের উপাদান জোগানে যে ইতিবাচক ভূমিক পালন করেছিল তার ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতে জন্ম নেয় দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী যারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা করে এবং গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করে। এই প্রসঙ্গে এ. আর দেশাই জানান "ব্রিটিশ আমলে বিদেশী শাসনের চাপ ও বিশ্বব্যাপী শক্তি সমূহের প্রভাবে ভারতীয় সমাজের মধ্যে অসংখ্য বিষয়াশ্রিত ও ব্যক্তিচেতনাগত শক্তি ও উপাদান সৃষ্টি হয়। এদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব।

এ. আর দেশাই রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের জাতি গঠনের জনক বলে গণ্য করেছিলেন। যদিও রামমোহনকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে নানা বিতর্ক রয়েছে কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্য যে রামমোহন যে সংস্কার কাজ শুরু করেছিলেন তা ডিরোজিও, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী, বিদ্যাসাগর প্রমুখের সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করেছিল। ঐ সংস্কার কর্মসূচী ক্রমশ রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে ফলে দাদাভাই নওরোজি, ফিরোজশা মেহেতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখের হাত ধরে ভারতীয়

জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথ প্রস্তুত হয়। পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতে জাতি গঠন ও জাতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠায় দয়ানন্দ সরস্বতী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার অতীত গৌরবময় ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পথ প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল যে জাতীয় ঐক্য-এর ভিত্তি শক্ত না হলে জাতিগঠন সম্ভব নয় এক্ষেত্রে তিনি ধর্ম ও রাজনীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার সুপারিশ জানান। তার মতে ভারতবাসীর জাতীয় কর্তব্য হলো সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করা ও ক্ষমতাশালী করার মাধ্যমে এমন এক জাতি গড়ে তোলা যা জাতি রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন শক্তিশালী ভারতীয় জাতি গঠনের সাপেক্ষেই বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি সম্ভব। পাশাপাশি তিনি এটাও জানিয়েছিলন যে ভারতের জাতিগঠনের প্রধান বাধা হলো ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্য। জাতি, ধর্ম, ভাষা, সরকার সব একত্রে জাতি গঠন করে। ভারতের ক্ষেত্রে জাতি ধর্ম ভাষার এত বৈচিত্র্য যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ছিল জটিল সমস্যা। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধানে তিনি ধর্মীয় ঐক্য সৃষ্টির সুপারিশ জানান। এক্ষেত্রে তাঁর অভিমত ছিল বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আপাত পার্থক্য থাকলেও সকল ধর্মেরই এমন কতকগুলি সাধারণ মূলসূত্র আছে যেগুলি মানুষের জীবন পরিচালনায় নিয়োজিত থাকে ঐ সূত্রগুলিকে ভিত্তি করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের দ্বিতীয় আর একটি সুপারিশ ছিল দারিদ্রের অবসান নিশ্চিত করা এবং দরিদ্র ও সামাজিকভাবে অবহেলিত মানুষদের সমাজে ন্যায্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করা। নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ববৃন্দ ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের শোষনমুলক দিকটি ভিত্তি করে অর্থনৈতিক সূত্রের উপর নির্ভর করে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। এক্ষেত্রে নওরোজির 'ড্রেন থিওরি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ জাতির ঐক্য বা ভাষাগত ঐক্য বা ধর্মীয় ঐক্য বা পুঁজিবাদী বিকাশকে জাতি গঠনের কারণ বলে গণ্য করেননি। তাঁর কাছে সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত জাতি একটি মানসিক পদার্থ, একটি সজীব সত্তা। একটি মানস পর্দার্থ। তিনি বিশ্বাস করতেন সাধারণ সম্মতি, সকলে মিলে একসাথে বেঁচে থাকবার সুস্পষ্ট ইচ্ছা থেকে জাতি গড়ে ওঠা সম্ভব। জাতি সম্পর্কে এই ধারণার থেকেই রবীন্দ্রনথ পশ্চিমী জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা সমর্থন করেননি। তিনি পশ্চিমী জাতি-রাষ্ট্রের আত্মম্ভরিতা ও আধিপত্যকে সমর্থন করেননি। পশ্চিমী জাতিয়তাবাদকে এক নিষ্ঠুর সংক্রামক মুর্ত্তিমান অশুভ শক্তি বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

বস্তুত ভারতীয় জাতি সত্তাকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ শাসন যে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের উপাদান সরবরাহ করছিল তা গান্ধীজীর নেতৃত্বে গণভিত্তি লাভ করে। গান্ধীজী দেশের সকল অঞ্চলের সকল শ্রেণী এবং সকল ধর্মের মানুষকে এক করে ভারতীয় জাতিসত্তাকে গণভিত্তি সরবরাহ করেছিলেন। যে গণভিত্তির প্রধান ঐতিহাসিক কাজটি ছিল নতুন ভারত গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে ভারতের মতো বহুত্ববাদী দেশে, জাতিসত্তার ভিত্তি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব ভারত বলতে কি বোঝাতে চান তা স্পষ্ট করার উপর প্রাধান্য দেন। এই জাতি সত্তা কী ভৌগোলিক ঐক্য ভিত্তিক অথবা বিশেষ এক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ সমাজ ভিত্তিক, অথবা বিশেষ এক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ সমাজভিত্তিক অথবা বিশেষ ইতিহাস এবং বৌদ্ধিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ সেই প্রশ্নে নানা বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে ভারতীয় জাতি সত্তাকে একটি বিশেষ সভ্যতার সাপেক্ষ বলে গণ্য করা হয়। বলা হয় ভারতীয় জাতিসত্তা পাশ্চাত্য জাতিসত্তার নির্মাণের উপাদান বা মূল্য সাপেক্ষ নয়। বস্তুত রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ,

অরবিন্দ, বানার্ডে, গোখেল. রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, নেহেরু প্রমুখ তাঁদের লেখায় ভারতীয় জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠার কাজে নানা মত ও পথের অনুসারী হলেও সকলই একমত ছিলেন যে ভারতীয় সভ্যতা হলো বহুত্ববাদী। ভারতীয় সভ্যতায় নানা ধরনের নৈতিক ও দার্শনিক চিন্তার অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য করা যায়। কাজেই ভারতের জাতিসত্তার নির্মাণ বিশ্বের দরবারে এক অনন্য উদাহরণ স্বরূপ। ভারতীয় জাতিসত্তা নির্মাণে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যের উপর নির্ভর করা হয় এবং তার সাপেক্ষে ভারতীয় জাতিসত্তা নানা ভিন্নতার মধ্যেও এক স্বতন্ত্র বিশ্ববীক্ষার প্রকাশ ঘটায়। পশ্চিম ইউরোপে জাতিগঠনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক ছিল ভাষা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি। আর ভারতীয় জাতি গঠনে যে উপাদানটি প্রাথমিকভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল তা হলো ভারতের দীর্ঘ পুরাতন ঐতিহ্য ধ্বংসকারী ব্রিটিশ শাসন, যা অচেতনভাবে ভারতে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় শক্তির উন্মেষের কারণে পরিণত হয়।

৪.৪ স্বাধীনতার পর জাতি ও রাষ্ট্রের নির্মাণ :

বস্তুত ভারতবর্ষের উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করা হলে দেখা যাবে যে সে ইতিহাস ছিল মূলত প্রতিক্রিয়া শক্তির সাথে প্রগতি শক্তির সংগ্রামের ইতিহাস আর এক্ষেত্রে প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কোন শক্তির সাপেক্ষে এগিয়ে যাবে তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে তা বিচার করা। কাজেই এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম সবসময় ধর্মনিরপেক্ষ ও আধুনিক পথে অগ্রসর হয়নি বরং অনেক ক্ষেত্রেই গোঁড়া আধুনিকতা বিরোধী হওয়া সত্বেও জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক বলে গণ্য হয়েছে। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী শক্তির উন্মেষের পর্যালোচনায় আর একটা বিষয় অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন তদানিন্তন সমাজের প্রবর গোষ্ঠীভুক্ত সমাজ সংস্কারক ও বুদ্ধিশালী সম্প্রদায়ের পক্ষে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন বৃহৎ কৃষিনির্ভর দেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব ছিল না। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ায় একটি রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে জাতিকে পেশ করার ক্ষেত্রে কৃষি কেন্দ্রীক শ্রেণি সংগ্রামে সরাসরিভাবে সম্পর্কিত হয়ে কৃষকদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সামিল করা সেই কারণেই অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করা হয়েছিল। কারণ এটা না হলে উদীয়মান ভারতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে ঔপনিবেশিক শক্তির যথাযথভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। পাশাপাশি ঐ বিপুল কৃষক সম্প্রদায়ের উপর যথাযথ বৌদ্ধিক ও নৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাও ছিল ভীষণ জরুরী না হলে স্ব-শাসনের স্ব-জাতীয় সহমত নির্মাণের জৈব ক্রিয়া ব্যর্থ হওয়ার সম্ভবনা ছিল। আর এক্ষেত্রে গান্ধীজীর নেতৃত্ব বিশেষ ভাবে সক্রিয় হয়েছিল জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থানের বাঁধা কাটিয়ে তার পথ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে। আর ঔপনিবেশক শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতে জাতীয়বাদী আখ্যানের পরিমার্জনা ঘটিয়ে রাষ্ট্রের বিশেষভাবে বৈধ ভূমিকার কথা বলা হয়। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় স্বাধিকারযুক্ত এবং নির্দেশাত্মক ভূমিকার বৈধকরণ করা হয় প্রগতি ও সামাজিক ন্যায় ধারণার মাধ্যমে। জানানো হয় সাবেক পরিকাঠামো সাপেক্ষে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কাজেই নতুন পরিকাঠামো নির্মাণ জরুরী যা প্রগতিকে নিশ্চিত করবে। আর এই কাজে প্রথমেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বদল ঘটিয়ে তার জায়গায় জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলা, গ্রামীণ স্তরের সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোকে ধ্বংস করা এবং সারা দেশের রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে শিল্পভিত্তিক বিকাশের পথ প্রস্তুত করার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। জাতি গঠনের পথে বাঁধা স্বরূপ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধানে রাষ্ট্রের ভূমিকা মুখ্য বলে স্বীকার করা হয়। ভারতীয় সভ্যতাকে পূর্ণজাগরিত করার প্রধান কাণ্ডারী করা হয় রাষ্ট্রকে। স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রধানমন্ত্রী

ভারতকে নিছক একটি প্রবুদ্ধ সত্তা (civilizational entity) বলে চিহ্নিত করেননি, তিনি ভারতকে একটি জাতি রাষ্ট্র বলে গণ্য করেছিলেন। তিনি ভারতকে জাতি রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করে একাধিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলন। যেমন ভারত তার অধিবাসীদের অংশ স্বরূপ যারা সমষ্টিগতভাবে জাতি গঠন করে। এক্ষেত্রে সংবিধানের শুরুতেই 'আমরা ভারতের জনগণ' এই শব্দ ব্যবহার করে ঘোষণা করা হয় যে এই দেশ ভারতবাসীর দেশ ঘোষণা করা হয় স্বাধীন অধিবাসীদের রাষ্ট্র নির্মাণের কথা এবং জানানো হয় ভারতবাসী কী ধরনের রাষ্ট্র নির্মাণ করতে চাইছে, কোন ধরনের বাহ্যিক চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারতীয় জাতি রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ধারণাটিকে জোড়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি কারণ ভারত জাতি রাষ্ট্রের মধ্যেই গণতন্ত্র ধারণা অন্তর্নিহিত ছিল। সমষ্টিগত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য 'আমরা ভারতবাসী' এই মানসিকতা গড়ে তোলার আবেদন জানানো হয় এবং এই মানসিকতার নির্মাণ সাপেক্ষে অটলভাবে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সম্প্রদায় গড়ার অঙ্গীকার করা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, চিন্তা মত প্রকাশ বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন, সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য ভ্রাতৃত্বের বোধ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়। ভারতের সংবিধানের রূপকারগণ বিশ্বাস করতেন যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যজনিত ক্ষতচিহ্ন দূর না করে ভারত কখনোই ঐক্যবদ্ধ জাতিতে রূপান্তরিত হতে পারবে না। নেহেরু তার স্বাধীনতালগ্নের ভাষণে যাকে তিনি ভারতের জাতীয় দর্শন (National Philosophy of India) বলে গণ্য করেছিলেন সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সুযোগের সমতা, সামাজিক ন্যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তিবাদী অনুসন্ধানের প্রেরণা বা বৈজ্ঞানিক মেজাজ ইত্যাদিকে জাতিগঠনের সহায়ক উপাদান বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রে ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার এবং ধারাবাহিকতার পাশাপাশি বহুত্ববাদী সভ্যতার ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে অত্যন্ত যত্নসহকারে ও সতর্কভাবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতীকগুলি নির্বাচন করা হয়। মহাভারত থেকে জাতীয় আদর্শ হিসাবে 'সত্য মেব জয়তে' গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় ঐতিহ্যে সত্য ধারণার কেন্দ্রীয় গুরুত্বকে স্বীকৃতি জানানো হয়। ও গান্ধীজীর আদর্শানুযায়ী সত্য, সত্যনিষ্ঠা ও সত্যাগ্রহের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। জাতীয় প্রতীক হিসাবে অশোক স্তম্ভ ও অশোক চক্রকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবের স্বীকৃতি জানানো হয়। জাতীয় পতাকার রং-এর মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ধ্বনির অনুরণন লক্ষ্য করা যায় তা ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রতীক চিহ্ন স্বরূপ। জাতীয় স্তোত্র দ্বারা আমাদের ভারতীয় পরিচিতিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে কোন জয়োল্লাস প্রকাশ করা হয়নি এবং এক্ষেত্রে ভারতের সাথে ফ্রান্স ব্রিটেনসহ অনেক দেশেরই মিল লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় স্তোত্রের মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে দেশের জাতীয় ভূচিত্র প্রকাশের পাশাপাশি জনজাতির বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে। ভৌগলিক ক্ষেত্রকে দেবভূমি গণ্য করে দেশের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য বিধাতার আশীবাদ কামনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ধর্মীয় নিরপেক্ষতাকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। নিছক কোন অতিপ্রাকৃত দেবত্বের কাছ আবেদন না জানিয়ে ভারতের ভাগ্য বিধাতা স্বরূপ এমন দেবতার কাছে আবেদন জানানো হয়েছে যা কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় দেব-দেবীর রূপ নয় বরং 'ভারত ভাগ্য বিধাতা'র কথা শোনানো হয়েছে।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও জাতি সত্তা নির্মাণের আদর্শগত ভিত্তির আলোচনায় জওহরলাল নেহেরুর রাজনৈতিক ভাবনার উল্লেখ অবশ্যই করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র নির্মাণে গান্ধীজী ছিলেন মূলত ঐতিহ্যাশ্রয়ী বা অনেকাংশে পাশ্চাত্তীয় আধুনিকতার ভারতীয়করণে অভিলাষী। অন্যদিকে নেহেরু গান্ধীবাদকে অবলম্বন

করে তাকে অতিক্রম করে আধুনিক ধাঁচের জাতি রাষ্ট্র নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করতেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসাবে ভারত তার সমাজ কাঠামোর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী ও গোষ্ঠীসমূহকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বৃহৎ পুঁজির তাঁবেদার না হয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্ত করার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য ভোগ করবে এই জাতি রাষ্ট্র। নেহেরু জানান এই জাতি রাষ্ট্র সব সময় রক্তচক্ষুধারী হয়ে দমন নিপীড়নের মাধ্যমে ভূস্বামী ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের আর্থ সামাজিক আধিপত্য রক্ষা করবে না বরং গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ এমনকি সমাজবাদের মতাদর্শ প্রচার করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মনে আধিপত্য স্থাপন করবে।

৪.৫ উপসংহার :

একটি শক্তিশালী জাতি রাষ্ট্ররূপে ভারতকে গড়ে তোলার নানা অঙ্গীকার ও ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পার করে আজও ভারতীয়দের মধ্যে বিভিন্ন সত্তা, আনুগত্য ও পরিচিতি লক্ষ্য করা যায়। 'মেরা ভারত মহান' এধরনের অঙ্গীকার প্রচার করা হলেও ভারতবাসী জাতীয় সত্তা এবং জাতীয় ঐক্য ও আনুগত্যের উপর জাতি, ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল ইত্যাদি ভিত্তিক আনুগত্যকে গুরুত্ব দেয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পার করেও ভারতীয় সত্তা স্বাভাবিক কিংবা অপরিবর্তনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেনি। বরং দেখা যায় কোন বিশেষ সময় বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ সত্তা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। মজার বিষয় হলো বিদেশী কোন দেশে আমাদের পরিচয় যে আমরা ভারতীয়, কিন্তু দেশে আমরা আমাদের পরিচয় হিসাবে কখনো বাঙ্গালী কখনো মারাঠি কখনো পাঞ্জাবী কখনো হিন্দু কখনো মুসলিম কখনো শিখ ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াও অধিকাংশ ভারতীয়দের মধ্যে জাতিসত্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারেনি। ভারতে জাতীয়তার প্রকাশ রূপে কোন প্রাকস্থিরীকৃত সত্তা নেই। সময় পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি অপর সত্তার উপস্থিতি ভারতবাসীর সত্তার জগত নির্ধারণ করে দেয়। তাছাড়াও আধুনিকীকরণের ধারার অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপ্তী ও আধুনিকীকরণ, সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার, সংসদীয় গণতন্ত্র, ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি ভারতীয়দের অনেকের মধ্যে সাবেকি, ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতিগত ও অঞ্চলগত আনুগত্যকে অনেকক্ষেত্রেই শক্তিশালী করে তুলছে। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ গুরুত্ব পাচ্ছে। যা সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনের বিপন্নতা বৃদ্ধি করে জাতি গঠনের দুর্বলতা প্রকাশ করছে।

আসলে রাষ্ট্রগঠন বলতে যেমন আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা সংহতিকে বোঝানো হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়, তেমনই জাতি গঠনের ক্ষেত্রেও বিভাজনকারী শক্তিসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎকরণের সুপারিশ জানানো হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ না করে ভারতের মতো দেশে জাতি গঠন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে রাষ্ট্র গঠন ও জাতি গঠনকে সুচারু করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং শাসনতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক করা হয়। কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠছে, বিভিন্ন জাতি, ভাষা, ধর্ম গোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমন্বিত দাবী রাষ্ট্রীয় স্তরে অনৈক্য সৃষ্টি করছে ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা বৃদ্ধি করছে।

এক্ষেত্রে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে অনুসরণ করে বলা যায়, নিছক ইঁট বালি দিয়ে জাতীয় সত্তা নির্মাণ করা যায় না। জাতীয় সত্তা কোন শিল্প পরিকল্পনার বিষয়ও নয়, এটা ভারতবাসীর হৃদয়ের চেতনার বিষয়। জাতীয় সত্তা যেহেতু একটা ভাবগত ধারণা বা সাময়িক অনুভূতি, তাই আপামর ভারতবাসী গভীর ঐক্যবোধের সাপেক্ষে সংযুক্তি বোধ বা অন্তর্ভুক্তি বোধের সামিল না হলে জাতীয় সত্তা নির্মাণ সম্ভব নয়। মইরন ওইনার (Myron Weiner) জানান জাতীয় সত্তা হলো নানান মানবিক সম্পর্ক ও মনোভাবের আধার। জাতীয় সত্তা বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন জীবন ধারাগত সত্তার সংহতি ও জাতীয় চেতনার বিকাশকে নির্দেশ করে, যার সাপেক্ষে জাতীয় ও জনস্বার্থ অগ্রাধিকার পায়। কাজেই ভারতের সাপেক্ষে বলা যায় যে জাতীয় সত্তা হলো সেই বিশেষ অবস্থা যেখানে সমাজের সকল অংশকে সমমর্যাদার অধিকারীগণ্য করে এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে স্বীকার করে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুপারিশ জানানো হয়। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার লাগাম ছাড়া বৃদ্ধির সমস্যা মোকাবিলা করে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় একটা প্রগতিশীল ভারসাম্য বজায় রাখা।

ভারত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র হওয়ায়, রাষ্ট্র চিন্তাবিদ ও বুদ্ধি জীবীদের মধ্যে অনেকে যেমন ভারতকে একটি জাতি হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন তেমনই তার দুর্বলতার বা সীমাবদ্ধতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক্ষেত্রে প্রকৃত বিচারে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে ভারতে জাতি গঠনের প্রক্রিয়া এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। জাতি গঠনের জন্য এখনো ভারতবাসীকে অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। বর্তমানে ভারতবাসী রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে জাতিগঠন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বলা যায় A Nation in the Making. ভারতবাসীর ঐক্যবোধের অভাব অস্বীকার করা যায় না। সকলে এক অভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত এই বোধ বা 'আমরা বোধ' ভারতীয়দের মধ্যে দেখা যায় না। কাশ্মীর সমস্যা, উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্যা ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যা জানান দেয় যে সঠিক অর্থে ও সম্পূর্ণরূপে আজও ভারতীয়রা একটা জাতি হয়ে উঠতে পারেনি। সংবিধান, জাতীয় পতকা, জাতীয় সংগীত ইত্যাদি যেমন জাতীয় সত্তা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করছে তেমনই তার অবমাননাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাজেই বলা যায় শক্তিশালী জাতীয় সত্তার উপযোগী সুদৃঢ় ভিত্তি যুক্ত রাজনৈতিক গণতন্ত্র সহায়ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি জাতীয় স্তরের উপযোগী উদার মূল্যবোধ ছাড়া জাতি গঠন সম্ভব নয়।

স্বাধীনতাউত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িকতা জাতিভেদপ্রথা, জাতের রাজনীতিকরণ, আঞ্চলিকতা ভাষাগত বিবাদ ইত্যাদি বিষয় যেমন জাতি গঠনের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে, তেমনই সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকাও অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ছিল না। জাতি গঠনে রাজনৈতিক দলগুলির সদর্থক ভূমিকা একান্তভাবেই অপরিহার্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলি সংকীর্ণ আনুগত্যকে স্বার্থের গ্রন্থনার ভিত্তি গণ্য করে সামাজিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করছে। ভূমিপুত্র মতবাদকে দলীয় নীতির মধ্যে স্থান দেওয়া হচ্ছে ও ভারতীয় পরিচিতিকে দুর্বল করে তোলা হচ্ছে।

নেহেরু সমাজের গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ও শ্রেণি সমূহকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ভারতকে একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। জাতি রাষ্ট্র গঠনের পথ সুগম করে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯৬১ সালে জাতীয় সংহতি পরিষদ গঠন করেছিলেন। এই পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ভারতের এক নাগরিকত্ব বা অভিন্ন নাগরিকত্বের ধারণা গড়ে তোলা। পরিষদ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সম্মেলনে একত্রিত হয়ে কেন্দ্রাতিরা শক্তি সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার নীতি গ্রহণ করে সাম্প্রদায়িকতা,

আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতা মৌলবাদী কাজকর্ম ইত্যাদির বিরোধিতার ভিত শক্তিশালী করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার জাতীয়সত্তা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দুটি আইন প্রণয়ন করে যেমন বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বংশ সম্প্রদায় ও ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে ঘৃণা বা শত্রুতা সৃষ্টিকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। আর দ্বিতীয় আইনে জাত-পাত, ভাষা ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক আবেগ অনুভূতিকে নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতের মতো বহুত্ববাদী দেশে জাতীয় সত্তা গঠন বা জাতি গঠন কোন সহজ বিষয় নয়। আবার এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা হলো রাষ্ট্রের। আরো পরিষ্কারভাবে বলা হলে বলা যায় রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের সদর্থক ও সক্রিয় ভূমিকা, এই কাজে সরকারের যে যে কর্মসূচি গুলির উপর প্রাধান্য দেওয়া জরুরী সেগুলি হলো শিক্ষার ভিত্তি সম্প্রসারিত করে সকলকে শিক্ষিত করে তোলা ও জাতীয় সত্তার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা করা।

গণমাধ্যম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে বহুত্ববাদী ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুধাবনের উপযোগী ব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব-সম্প্রীতির সম্পর্ক রক্ষার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। সরকারকে নিজে জাতীয় আদর্শের প্রতি অনুগত থেকে দেশবাসী যাতে আন্তরিক উদ্যোগ ও আয়োজনের মাধ্যমে জাতীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখায় এবং জাতীয় আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার বদ্ধ থাকে তার যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় প্রতীক সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য বজায় রাখতে হবে। দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। ন্যায়নীতি ভিত্তিক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতাবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে।

৪.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী :

১. বড়ো প্রশ্ন :

ক) ভারতে রাষ্ট্র ও জাতি গঠনের ধারাটি আলোচনা কর।

খ) ভারতের জাতিগঠনের সমস্যা পর্যালোচনা কর।

২. মাঝারি প্রশ্ন :

ক) ভারতের জাতিগঠনের প্রধান উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

খ) স্বাধীন ভারতে জাতি গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক) পাশ্চাত্যের জাতিগঠনের সাথে ভারতীয় জাতিগঠন প্রক্রিয়ার পার্থক্য নির্দেশ কর।

খ) ভারতে জাতীয় সত্তা নির্মাণে জওহরলাল নেহেরুর অবদান সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

৪.৭ গ্রন্থসূচি :

1. Surendranath Banerjee : *A Nation in Making : Being the Reminiscences of Fifty years of Public Life*, OUP, London, 1925.
2. Partha Chatterjee : *Nationalist Thought and the Colonial World : A Derivative Discourse*, 2ed Books, London, 1986.
3. Ernest Gellner : *Nations and Nationalism*, Blackwell Publishing, Oxford, 1983.
4. Atul Kohli : *The State and Poverty in India : The Politics of Reform*, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.
5. Anil Seal : *The Emergence of Indian Nationalism*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
6. Partha Chatterjee : *The Nation and Its Fragments*, Princeton University Press, Princeton, 1993.
7. Apurba Mukhopadhyay : *Post-Colonial Democracy in India: Structures and Processes*, Setu Prakashani, Kol & New Delhi, 2013.
8. Niraja Gopal Jayal & Pratap Bhanu Mehta (Eds) : *Oxford Companion to Politics in India OUP*, New Delhi, 2010. : See the article on 'State' by Partha Chatterjee and that on 'nationalism' by Sudipta Kaviraj.

একক ১ □ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা

১.৪ ভারতের সংবিধান সভা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

১.৫ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিবর্তন

১.৬ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি

১.৭ উপসংহার

১.৮ নমুনা প্রশ্ন

১.৯ গ্রন্থসূচি

১.১ উদ্দেশ্য :

এই এককটিতে একদিকে আমরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো, তেমনই আবার এর সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে উদ্যোগী হব।

১.২ ভূমিকা :

ভারতের শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি একটি বিতর্কিত বিষয়। ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র (federal state) আখ্যা দেওয়া যায় কিনা তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। পল্ অ্যাপলবি ভারতকে 'অতিমাত্রায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ('extremety federal') বলে মন্তব্য করেছেন (প্যাপলবি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৬৩ : ৫১, ডি. ডি. বসু, ১৯৯৪ : ৬৯ থেকে উদ্ধৃত। অন্য দিকে শান্তনম প্রমুখ অনেকে মনে করেন যে, বস্তুতপক্ষে ভারত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসাবে কাজ করেছে ('India has practicaly functioned as a Unitary State...")। (শান্তনম, ইউনিয়ন-স্টেট রিলেশন্স্ ইন ইন্ডিয়া, ১৯৬০ vii, ৫১, ৫৯, ৬৩ থেকে উদ্ধৃত)। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি নিয়ে এই পরস্পর বিরোধী মতের মূল্যায়ণের মধ্যে প্রবেশ করার আগে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেওয়া দরকার।

১.৩ যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা :

যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা রাষ্ট্রতত্ত্বে একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। ডাইসি, ব্রাইসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নানা দিক নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। সেইসব আলোচনার জটিল দিকে না গিয়ে আমরা যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সাবেকি ও সাম্প্রতিক ধারণার সহজ সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রথমে করবো।

লাতিন 'foedus' শব্দটি থেকে 'federal' অর্থাৎ 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ চুক্তিপত্র বা অঙ্গীকারপত্র (covenant)। 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটির প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় বাইবেল ধর্মগ্রন্থে, যেখানে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে অংশীদারিত্ব বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের হাতে শব্দটি ভিন্নমাত্রা লাভ করে একটি রাষ্ট্রের সরকার ও অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ডাইসি ব্রাইস, হোয়ার প্রমুখ বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের লেখায় যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সাবেকি ধারণা পাওয়া যায়। এই সনাতনী ধারণার মূল বক্তব্য হল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুইপ্রস্ত সরকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ ও স্বাধীন (coordinate and independent within their own sphere)।

যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ে এই দ্বৈতবাদী ধারণার (dualistic concepet of federalism) বিরূপ সমালোচনা করা হয় যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ক্রিয়া তত্ত্বে (functional theory of federalism)। যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ে এই ক্রিয়া তত্ত্বে যে কথা বলা হয় তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সাবেকি ধারণার মতো এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় না যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমগুরুত্বপূর্ণ ও স্বাধীন। বরং উভয় ধরণের সরকারের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর এই তত্ত্বে বেশি জোর দেওয়া হয়।

এই ক্রিয়া তত্ত্বেরই একটি বিশেষ রূপ হল সহযোগিতাভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা (concept of corperative federalism)। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী এ. এইচ. বার্চ নিম্নলিখিতভাবে সহযোগিতাভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, সহযোগিতাভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে বোঝায়...."কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে প্রশাসনিক সহযোগিতার রীতি, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ প্রাপ্তির জন্য আঞ্চলিক সরকারগুলির আংশিক নির্ভরতা। আর যে সব উন্নয়নমূলক কাজ অঞ্চলগুলির উপর সাংবিধানিকভাবে ন্যস্ত, সাধারণ সরকার শর্তসহ অনুদানের মাধ্যমে প্রায়শই সেইসব কাজের অগ্রগতি ঘটায়" (...the practice of administrative cooperation between general and regional governments, the partial dependence of the regional governments upon payments from the general governments, and the fact that the general government by the use of conditional grants, frequently promote development in matters which are constitutionally assigned to the regions." A. H. Birch.)

(Federalism, Finance, and Social Legislation in Canada, Australia and the United States, London OUP, 1955 ; G. Austin, 1966/1999 : 187 থেকে উদ্ধৃত।)

সাম্প্রতিককালে এলজার, ওয়াট্‌স্ প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার মধ্যে দুই-একটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। তাঁরা মনে করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দুটি মূলনীতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। নীতি দুটি হল—অংশীদারী শাসন (shared rule) ও স্বশাসন (self rule)। দেশের ঐক্য রক্ষার জন্য সর্বজনীন উদ্দেশ্যে বণ্টিত ক্ষমতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি যেমন শাসন করে, তেমনি অন্তরাজ্যগুলির স্বশাসনের অধিকারও স্বীকার করা হয়েছে যাতে রাজ্যগুলির স্বার্থ রক্ষা করা যায়। হোয়ার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্রর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু আধুনিককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে সব দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ কোনো মডেল নেই। তাঁরা মনে করেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একই ধাঁচের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। গড়ে ওঠেওনি।

১.৪ ভারতের সংবিধান সভা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা :

এখন আমরা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্পর্কে সংবিধান প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করব। এক বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ। প্রায় মহাদেশের মতো ভারতবর্ষ। প্রায় মহাদেশের মতো ভারতের আয়তন। এখানে বাঙালি, ওড়িশা, বিহারি, পাঞ্জাবী, মারাঠি, গুজরাতি, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি নানা ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষ বসবাস করেন। সংবিধান প্রণেতাদের মনে হয়েছিল যে, এ রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশাল দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই উপযুক্ত হবে। তবে সংবিধান সভার সদস্যরা যে ধরণের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা প্রথমে ভেবেছিলেন, পরে তার কিছু পরিবর্তন হয়।

সংবিধান সভার সদস্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন চেয়েছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সংবিধান সভায় নেহরুর প্রস্তাবিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাবে। আট দফা সম্বলিত এই প্রস্তাবের অন্যতম প্রস্তাব ছিল সুগঠিত স্বশাসিত একক (autonomous units) হিসাবে অন্তরাজ্যগুলিকে স্বীকৃতি দিতে হবে (জে. দাশগুপ্ত, ২০০১:৫৩)। তা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধান অনুসারে যে ক্ষমতা দেওয়া হবে, সেগুলি বাদে অন্যসব ক্ষমতা অন্তরাজ্যের সরকারের হাতে থাকবে। অন্যভাবে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) রাজ্য সরকার ভোগ করবে।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এই আদি ছকটি (Original Design) ভারতের জাতীয় আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে পুষ্ট হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের সর্ববৃহৎ সংগঠন কংগ্রেস আন্দোলনের সময় জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াসের পাশাপাশি ভারতের বহুসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের (multi-cultural diversity) প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ও আঞ্চলিক শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছে বলে মনে করেন বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত (জে. দাশগুপ্ত, তদেব ৫০-৫২)।

কিন্তু যে ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত সংবিধান অনুসারে গড়ে উঠল তা উপরের ভাবনা থেকে পৃথক। ভারতের সংবিধান রচনার কাজে সংবিধান সভা যে সময়ে (১৯৪৬-১৯৪৯) ব্যস্ত ছিল,

সে সময়ে ভারতের কিছু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রভৃতি অশুভ শক্তির উদয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দেশভাগ এবং তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনীতিক ও আর্থ-সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয় (পল ব্রাস, ২০০০ : ৬০-৬৯)। এই ধরনের গভীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সংবিধান সভার সদস্যরা এমন এক ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইলেন, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ শক্তিশালী।

১.৫ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিবর্তন :

যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গড়ে ওঠার ইতিহাস সব যুক্তরাষ্ট্রে এক ধরনের নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তির মাধ্যমে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই পদ্ধতিকে যুক্তরাষ্ট্রের একত্রীকরণ পদ্ধতি (federation by aggregation or integration) বলা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে কানাডায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উদ্ভবের ইতিহাস আলাদা। ঔপনিবেশিক কানাডা সরকার থেকে কানাডার প্রদেশগুলির কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না। কানাডায় প্রদেশগুলির মধ্যে স্বেচ্ছায় কোনো চুক্তি সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কানাডা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ছিল। প্রদেশগুলি সেখানে যাতে স্বশাসনের অধিকারী হয় তার জন্য প্রদেশগুলিকে নিয়ে ব্রিটিশ সংবিধির (statute) সাহায্যে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের এই পদ্ধতিতে বিভক্তিকরণের পদ্ধতি (federation by disintegration or disaggregation) বলা হয়।

ভারতে এই বিভক্তিকরণের পদ্ধতিতেই যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। দুর্গা দাস বসুর মতে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ব্রিটেনের সংসদ "ভারতে ঠিক সেইভাবেই একযুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি স্থাপন করে যেভাবে তারা ক্যানাডায় করেছিল।" (দুর্গাদাস বসু ১৯৯৪ : ৬১)। ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে সম্রাটের অধিরাজত্ব (suzerainty) প্রতিষ্ঠা করে। সেই সময় থেকে শুরু করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন গৃহীত হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা চালু ছিল। এই আইনের ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলিকে 'একটা সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কৃত্রিমভাবে স্বশাসিত করা হয়েছিল' (তদেব : ৬২)। অর্থাৎ আগের এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সাহায্যে বিভক্তিকরণের মাধ্যমে প্রদেশগুলিকে সীমাবদ্ধ স্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। অবশ্য তখন ভারতের পাঁচ শতাধিক দেশীয় নৃপতিদের শাসিত রাজ্য এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেনি। ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভারত স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act, 1947 অনুযায়ী)। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগদান করে। ভারতের সংবিধান প্রণেতারা দেশীয় রাজ্যগুলিকে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসেন।

১.৬ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি :

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে শুরুতেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে,

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা বা কোনো ধারায় 'যুক্তরাষ্ট্র' (federation) শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। সংবিধানের প্রথম ধারায় [১(১) ধারা] ভারতকে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' (Union of States) বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল 'ইউনিয়ন' শব্দের অর্থ কী? বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থে 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু আছে। অথচ মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনায় আরও উৎকৃষ্ট ইউনিয়ন গড়ে তোলার (to form a more perfect union) অঙ্গীকার করতে গিয়ে 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কানাডার সংবিধানেও 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও দুটি দেশই যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান এককেন্দ্রিক হলেও সে দেশের সংবিধানে ওই দেশকে 'ইউনিয়ন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহলে ভারতকে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' বলে উল্লেখ করার তাৎপর্য কী? ভারতের সংবিধান সভার খসড়া কমিটির সভাপতি ড. বি. আর. আম্বেডকর সংবিধান সভায় ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর খসড়া সংবিধান পেশ করার সময় ব্যাখ্যা করেন যে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও খসড়া কমিটি সচেতনভাবেই 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করেছে। আম্বেডকরের মতে, দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'ইউনিয়ন' শব্দটি সংবিধানের ১ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তির ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। **দ্বিতীয়ত,** চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার ভারতের কোনো অঙ্গরাজ্যের নেই।

যে কোনো যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে দেখা যায় কি না তা এখন আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতেও দু-ধরনের সরকার আছে। একদিকে সমগ্র ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার ; অন্যদিকে ভারতে যতগুলি রাজ্য (বর্তমানে ২৮টি), ততগুলি রাজ্য সরকার আছে প্রতিটি রাজ্যের শাসনকার্য পৃথকভাবে পরিচালনার জন্য।

দ্বিতীয়ত, এই দু-ধরনের সরকারের মধ্যে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বন্টন করা হয়। ভারতের সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ অংশে (Part XI and XII) আইনসংক্রান্ত, শাসনসংক্রান্ত এবং অর্থসংক্রান্ত সব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। সেজন্য সংবিধানের সপ্তম তপশীলে তিনটি তালিকা দেওয়া হয়েছে ঃ ইউনিয়ন তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা।

তৃতীয়ত, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতেও সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ বিধি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগ (যেমন—শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ প্রভৃতি) সংবিধান থেকেই স্ব স্ব ক্ষমতা লাভ করে।

চতুর্থত, তবে ভারতের সংবিধান মার্কিন সংবিধানের মতো অনমনীয় না হলেও যুক্তরাষ্ট্রীয়

ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য যে সব অংশ অনমনীয় হওয়া প্রয়োজন, সেইসব অংশকে অনমনীয় রাখার ব্যবস্থা আছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ভারতে কেন্দ্রের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার পরিধি (৭৩ ধারা), রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার পরিধি (১৬২ ধারা), আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন (২৪৫-২৫৫ ধারা), সপ্তম তফশিলির অন্তর্গত কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে কোনো বিষয় প্রভৃতি সংশোধনের জন্য সংশোধনী বিলটি সংসদে বিশেষ সংখ্যাধিক্যে (অর্থাৎ সংসদের উভয় কক্ষে মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত আছেন এবং ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ) পাশ হওয়ার পর ভারতের অন্তত অর্ধেক রাজ্যের আইনসভায়, অর্থাৎ কমপক্ষে ১৪টি রাজ্যের আইনসভায় অনুমোদিত হতে হয়। সুতরাং উপরোক্ত বিষয়গুলি সে দুষ্পরিবর্তনীয় যে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চমত, ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতা যেভাবে বন্টন করা আছে তা কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কোনো রাজ্য সরকার না মানলে শীর্ষ আদালত স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

এইসব কারণে ভারতের শীর্ষ আদালত ভারতের শাসনব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলে মনে করে। বস্তুত, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভারতের সংবিধানের একটি অন্যতম অপরিহার্য মৌল বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য ভারতীয় সংবিধানের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত দেখা যায় না। এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান আছে। অন্যদিকে ভারতে জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া অন্য রাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান নেই। ভারতে একই সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয়ত, কোনো যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য পুনর্গঠন অথবা রাজ্যের সীমানা, নামকরণ প্রভৃতি পরিবর্তন করতে হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতি প্রয়োজন। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য আইনসভার সম্মতি ছাড়া নতুন রাজ্য গঠন অথবা রাজ্যের সীমানা বদল করা যায় না। অস্ট্রেলিয়াতেও অনুরূপ ব্যবস্থা। উপরন্তু রাজ্যের সীমানা বদল করতে গেলে অস্ট্রেলিয়ার সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কিন্তু ভারতে রাজ্যের মানচিত্র পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতি নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা, অর্থাৎ সংসদ এককভাবে ভারতে নতুন রাজ্য গঠন করতে পারে অথবা রাজ্যের সীমানার রদবদল করতে পারে। সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতির সাহায্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সংসদ এই পরিবর্তন করতে পারে। সংসদে রাজ্য পুনর্গঠন বিল পেশ করার আগে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মতামত চাইতে পারেন ; তবে সেই মতামত মেনে নিতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নন।

তৃতীয়ত, ভারতের সংবিধানে যেভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা আছে তাতে কেন্দ্রের প্রাধান্য স্পষ্ট। (১) সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। (২) বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ভারতে কেন্দ্রীয় সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইনপ্রণয়ন করতে পারে। (৩) ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের হাতে দেওয়া হয়নি এমন অবশিষ্ট ক্ষমতা সংসদের হাতে দেওয়া হয়েছে, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্রে এই অবশিষ্ট ক্ষমতা রাজ্যের হাতে ন্যস্ত হয়েছে।

চতুর্থত, ভারতের সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব শুধু সংসদেই পেশ করা যায় ; রাজ্য আইন সভায় নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশোধনের প্রস্তাব সংসদের দুটি কক্ষে (অর্থাৎ রাজ্যসভা ও লোকসভা) সাধারণ সংখ্যাধিক্যে (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কক্ষের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন) অথবা বিশেষ সংখ্যাধিক্যে (অর্থাৎ উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিতি আছেন ও ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ) অনুমোদিত হয়। এই সব ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। সংবিধানের উল্লিখিত মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে (যেমন—৫৪ ও ৫৫ ধারা, ৭৩ ও ১৬২ ধারা, ২৪৫-২৫৫ ধারা প্রভৃতি) ভারতের অর্ধেকসংখ্যক রাজ্যের (অর্থাৎ অন্ততপক্ষে ১৪টি রাজ্য) অনুমোদনই যথেষ্ট। এ সব ক্ষেত্রেও সংসদের অনুমোদন পাওয়ার পর রাজ্যের অনুমোদন চাওয়া হয়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সংশোধন করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চমত, যে কোনো যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ বা উচ্চকক্ষ, রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। রাজ্যগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত করতে হলে প্রতিটি রাজ্যকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। এই কাজ করতে হলে রাজ্যের আয়তন বা জনসংখ্যা যাই থাক না কেন, প্রতিটি রাজ্যকেই কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ দিতে হবে। এই নীতিকে সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সুইৎজারল্যান্ড প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে ওই নীতি মানা হয়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা অথাৎ কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের নাম সিনেট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি সিনেটে নির্বাচিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যের সংখ্যা ৫০; ফলে সিনেটের সদস্য সংখ্যা ১০০।

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ সংসদ দুটি কক্ষ (রাজ্যসভা ও লোকসভা) নিয়ে গঠিত। কিন্তু ভারতের সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি মানা হয়নি। ভারতে প্রতিটি রাজ্য থেকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি সংসদের দ্বিতীয় কক্ষ রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন না। রাজ্যসভার আসনগুলি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া হয়। ফলে জনবহুল উত্তরপ্রদেশ রাজ্য থেকে বর্তমানে ৩১জন সদস্য রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। আর অরুণাচল, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, সিকিম, ত্রিপুরা প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্য থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। তাছাড়া ১২ জন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় মনোনীত করতে পারেন। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন যে, এই বিষয়গুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

ষষ্ঠত, ভারতে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আরও নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের শাসনবিভাগের প্রধান হলেন রাজ্যপাল। অথচ তাঁর নিয়োগ, কার্যকাল প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যের কোনো ভূমিকা নেই। রাষ্ট্রপতি তাঁকে নিয়োগ করেন এবং তাঁর কার্যকালের মেয়াদ রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আসলে রাজ্যপালকে নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ। আর এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুসারেই রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এমন সব ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সুইৎজারল্যান্ড প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে কল্পনাও করা যায় না।

সপ্তমত, ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য প্রশাসনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য দেখা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো সময়ে সংবিধানের উল্লিখিত কিছু প্রশাসনিক বিষয়ে এবং জরুরি অবস্থার সময় যে কোনো প্রশাসনিক বিষয়ে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে এবং সেই নির্দেশ রাজ্য সরকার মানতে বাধ্য। রাজ্য সরকার নির্দেশ অমান্য করলে কেন্দ্রীয় সরকার ধরে নেবে যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সংবিধান অনুসারে শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছে না। ফলে সেই রাজ্যে ৩৬৫ ধারা প্রয়োগ করে সাংবিধানিক অচলাবস্থা ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে এমন ব্যবস্থা নেই।

অষ্টমত, ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতা যেভাবে ভাগ করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আর্থিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক কেন্দ্রীয় প্রাধান্য রয়েছে। সংবিধান অনুসারে রাজ্যের নিজস্ব আয়ের উৎস সীমিত। ফলে রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সাহায্য, অনুদান, ঋণ প্রভৃতির উপর নির্ভর করতে হয়।

নবমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকত্ব স্বীকৃত। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সমগ্র দেশের নাগরিক এবং একই সঙ্গে তিনি সেই রাজ্যের নাগরিক যে রাজ্যে তিনি বসবাস করেন। যেমন একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং আলাস্কা রাজ্যের নাগরিক।

কিন্তু ভারতে দ্বিনাগরিকত্ব স্বীকৃত নয়। আমরা শুধু ভারতের নাগরিক ; কোনো রাজ্যের নাগরিক নই। এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যতিক্রম হল জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য। অন্যভাবে বলা যায়, ভারতে একনাগরিকত্ব স্বীকৃত। এমন ব্যবস্থা কানাডাতেও আছে।

দশমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আলাদা আধিকারিক আছে কিন্তু ভারতে এমনটি নয়। তবে সেইসব কর্মচারীবৃন্দ যে রাজ্যে কর্মরত আছেন, সেই রাজ্যে প্রযোজ্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইন প্রয়োগ করেন। ভারতের সংবিধানের ৩১২ ধারা অনুসারে সংসদ সর্বভারতীয় কৃত্যক আইন (All India Services Act) রচনা করে। এই বিধির সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বভারতীয় কৃত্যকে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তসমূহ বিষয়ে নিময়কানুন রচনা করে। বর্তমানে এই বিধি অনুযায়ী তিনটি সর্বভারতীয় কৃত্যক আছে—ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক (Indian Administrative Service ; সংক্ষেপে IAS), ভারতীয় আরক্ষা কৃত্যক (Indian Police Service ; সংক্ষেপে IPS), এবং ভারতীয় বন কৃত্যক (Indian Forest Service ; সংক্ষেপে IFS)। সর্বভারতীয় কৃত্যকের সদস্যরা কেন্দ্র ও রাজ্য এই দুইস্তরের সরকারে কর্মরত থাকার সুযোগ পান।

একাদশত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মতো বিচারবিভাগ ও বিভক্ত, যেমন কেন্দ্রীয় বিচারবিভাগ ও রাজ্য বিচারবিভাগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(ক) কেন্দ্রীয় আইন ও বিষয়গুলি সম্পর্কে মামলার বিচারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা এবং (খ) রাজ্যগুলির আইন বিষয় সম্পর্কে মামলার বিচারের জন্য অঙ্গরাজ্যের বিচারব্যবস্থা।

ভারতে কিন্তু দুই ধরনের বিচারব্যবস্থা নেই। অন্যভাবে ভলা যায় যে, ভারতে বিচারব্যবস্থা কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগ এবং রাজ্য বিচার বিভাগ এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়নি। ১৯৩৫ সালের ভারত আইনের অনুকরণে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের এক-অখণ্ড বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। ভারতের বিচারব্যবস্থার শীর্ষে আছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের অধীনে বিভিন্ন রাজ্যে হাইকোর্ট অবস্থিত। হাইকোর্টের নীচে ও নিয়ন্ত্রণে আছে বিভিন্ন ধরনের নিম্ন আদালত।

দ্বাদশত, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ভারতে একটি নির্বাচন কমিশন আছে। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা, লোকসভা, রাজ্যের বিধান পরিষদ ও বিধানসভার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব এই নির্বাচন কমিশনের হাতে। (অবশ্য সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনের (১৯৯২) পর কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে দেওয়া হয়েছে)।

ত্রয়োদশত, কেন্দ্রীয় সরকারের ও রাজ্য সরকারের হিসাব পরীক্ষার আলাদা ব্যবস্থা করা হয়নি। এই দুই ধরনের সরকারের হিসাবসংক্রান্ত দায়িত্ব মহাহিসাবনিয়ামক ও নিরীক্ষকের (Comptroller Auditor General) হাতে দেওয়া হয়েছে।

চতুর্দশত, ভারতের সংবিধানের অষ্টাদশ অংশে ৩৫২-৩৬০ ধারায় ভারতের রাষ্ট্রপতিকে তিন ধরনের জরুরি ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে—(ক) জরুরি অবস্থা ঘোষণা (৩৫২ ধারা); (খ) রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা ঘোষণা (৩৬৫ ধারা) এবং (গ) আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা (৩৬০ ধারা)। এই জরুরি ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে সাহায্য করে এবং এর পাশাপাশি রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করে।

১.৭ উপসংহার :

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির পর্যালোচনা করে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ভারতের সংবিধান সভার খসড়া কমিটির সভাপতি ড. বি. আর. অম্বেডকর সংবিধান সভায় মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতের সংবিধানে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা 'সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় উভয়ই হতে পারে।" (the political system adopted in the Constitution could be "both unitary as well as federal according to the requirements of time and circumstances" অম্বেডকর। CAD, Vol. 7, পৃঃ ৩৩-৩৪, দুর্গা দাস বসু, ২০০৮ পাদটীকা ৪২ পৃঃ ৬৬ থেকে উদ্ধৃত)। সংবিধান বিশেষজ্ঞ কে. সি. হোয়ার ভারতের শাসনব্যবস্থাকে

আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় (quasi-federal) আখ্যা দিয়েছেন, তাঁর মতে ভারতের শাসনব্যবস্থাকে "বলা যায় এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যসহ এক যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে বরং যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যসহ এক এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র"। ('a System of Government which is quasi-federal... a Unitary State with subsidiary federal features rathan than a Federal State with subsidiary unitary features." কে. সি. হোয়ার (১৯৫১) ডি. ডি. বসু (২০০৮ : ৬০) থেকে উদ্ধৃত)। হোয়ার-এর এই অভিমতের সঙ্গে বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ সি. এইচ. আলেকজান্দ্রোভিচ একমত হতে পারেননি। তাঁর মতে, ভারতের বিষয়টি অনন্য (sui generis)। তাঁর বক্তব্যের মূল সুরের সঙ্গে একমত হতে বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গা দাস বসু মন্তব্য করেছেন, "ভারতের সংবিধান সম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়, আবার সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিকও নয়, উভয়ের সংমিশ্রণ। এ এক অভিনব ধরনের সংঘ বা যৌগিক রাষ্ট্র। এর মধ্যে এই নীতি নিহিত আছে যে, যুক্তরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে।" ("The constitution of India is neither purely federal nor purely unitary but is a combination of both. It is a Union or composite State of a novel type. It enshrines the principle that in spite of federalism the national interest ought to be Paramount" ডি. ডি. বসু, তদেব, ৬০)।

আর এক বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ গ্র্যানভিল অস্টিন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে 'ভারতের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য এক নতুন ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' ('a new kind of federalism to meet India's peculiar needs') বলে মন্তব্য করেছেন। (অস্টিন, ১৯৬৬/১৯৯৯ : ১৮৬)। তিনি এই ব্যবস্থাকে 'সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' ('Cooperative federalism') যেখানে 'এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ....সরকার আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অপরিহার্যভাবে এমন দুর্বল প্রাদেশিক সরকার সৃষ্টি করেনি যাতে তা অনেকাংশে কেন্দ্রীয় নীতি রূপায়ণের প্রশাসনিক সংস্থামাত্র হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এটা প্রমাণ করেছে।' ("Cooperative federalism produces a strong or general government, yet it does not necessarily result in weak provincial governments that are largely administrative agencies of central policies. Indian federalism has demonstrated this." অস্টিন, তদেব, ১৮৭)।

এক্ষণ যাঁদের মন্তব্য উল্লেখ করা হল তাঁরা সকলেই বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন বেশ কিছুকাল আগে। এখন যাঁর অভিমত উল্লেখ করা হবে তিনি এ যুগের এক বিশিষ্ট ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। তিনি সাম্প্রতিক কালে তাঁর একটি প্রবন্ধে তাঁর মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নাম জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই এমেরিটাস অধ্যাপক আর এক বিশিষ্ট ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অতুল কোহলি সম্পাদিত একটি গ্রন্থে (The Success of India's Democracy, Cambridge : C.U.P., 2001) যে মূল্যবান প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন ('Indian's federal design and national construction') তার মূল বক্তব্য খুবই সংক্ষেপে বলা হল।

ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় যে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা আছে দাশগুপ্ত তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে এ কথাও মনে করেন যে, এই ব্যবস্থার মধ্যে এমন নমনীয়তা আছে যাতে সময়ের

সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্খা পূরণ করার সুযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রসার ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিবর্তনে সহায়তা করেছে। এই গণতন্ত্র আছে বলেই আঞ্চলিক শক্তিগুলি তাদের দাবি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ পায়। আঞ্চলিক দাবি মানা হয়েছিল বলেই ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের পুনর্গঠন সম্ভব হয়েছে।

এতক্ষণ তো বিশেজ্ঞদের মতামত নিয়ে আলোচনা করা হল। একথা মনে রাখতে হবে ভারত প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র, যদিও এই শাসনব্যস্থার কিছু এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যও আছে। গোড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতের মতো বিশাল দেশে বহু ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে বসবাস করেন। ভারতের সংবিধান রচয়িতারা যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ভারতে গ্রহণ করেছেন। ফলে কেন্দ্র এবং রাজ্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করে। সংবিধানের ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধনের (১৯৯২) পর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রও সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত হয়। ফলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় স্তর, রাজ্য স্তর হয়ে স্থানীয় স্তর পর্যন্ত প্রসারিত। এই তিনটি স্তরের শাসনব্যবস্থাই জনগণের আস্থা লাভ করেছে। অনেক সমস্যা সত্ত্বেও ভারতে আজও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আছে। তবে কিছু বিরল ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যও ভারতে বর্তমান, যেগুলি সাধারণত এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় দেখা যায়। সুতরাং উপসংহারে বলা যায় ভারত প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র হলেও তার কিছু এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়।

১.৮ নমুনা প্রশ্ন :

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা

(১) যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সাবেকি ধারণা উল্লেখ কর।

(২) যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ক্রিয়া তত্ত্ব (functional theory) উল্লেখ কর।

(৩) সমবায়িক/সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র (cooperative federalism) কাকে বলে?

(৪) যে দুটি মূলনীতির সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে বলে সাম্প্রতিককালে মনে করা হয়, সেই নীতি দুটি ব্যাখ্যা কর।

(৫) ভারতের সংবিধান সভার সদস্যরা প্রথম কী ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন?

(৬) তুমি কি মনে কর যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আদি ছক (original design) ভারতের জাতীয় আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে পুষ্ট হয়েছে?

(৭) ভারতে শেষ পর্যন্ত যে ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠল তা আদি ভাবনা থেকে পৃথক হওয়ার পিছনে কারণগুলি কী কী?

(৮) যুক্তরাষ্ট্রের একত্রীকরণ পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

(৯) যুক্তরাষ্ট্রের গঠনের বিভক্তিকরণ পদ্ধতি বলতে আমরা কী বুঝি?

(১০) ভারতে কি বিভক্তিকরণের পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে?

(১১) ভারতের সংবিধানের প্রথম ধারায় ভারতকে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১২) ভারতকে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন'বলে উল্লেখ করার তাৎপর্য কী?

(১৩) ভারতের সংবিধানের কোন অংশে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইনসংক্রান্ত ও আর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন করা হয়েছে?

(১৪) যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে লক্ষ করা যায় কী?

(১৫) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তত তিনটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর যা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না।

(১৬) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে অম্বেডকরের অভিমত উল্লেখ কর।

(১৭) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে কে. সি. হোয়ারের মতামত উল্লেখ কর।

(১৮) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে দুর্গা দাস বসুর অভিমত উল্লেখ কর।

(১৯) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি বিষয়ে গ্র্যানভিল অস্টিনের মতামত উল্লেখ কর।

(২০) বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত কীভাবে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন?

(২১) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?

বড় প্রশ্নমালা

(১) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি পর্যালোচনা কর।

(২) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(৩) তুমি কি গ্র্যানভিল অস্টিনের সঙ্গে একমত যে, ভারতে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে?

১.৯ গ্রন্থসূচি :

1. Austin, Granville, (1966/1999) *The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation*, Bombay, OUP, Oxford India Paperback, 1999

2. Basu, D. D., 2008—*Introduction to the Constitution of India*, Nagpur : Lexis Nexis Butterworths Wadhwa, 20th Edn.

3. Bhattacharyya, H. (2005)—'Changing Contours of India's Federal Debate', *The West Bengal Political Science Review* VIII (I & II), January-December.

4. Brass, Paul R. (2000)—'The Strong State and Fear of Disorder'in Frankel. F. R. et al (eds), *Transforming India's Social and Political Dynamics of Democracy*, New Delhi : OUP.

5. Dasgupta, J, (2001), 'India's federal design and multinatural national construction in Kohli, Atul (ed.), *The Success of India's Democracy*, Cambridge : OUP.

6. Mitra, Subrata, K. 2011—*Politics in India : Structure, Process and Policy*, London and New York : Routledge.

7. বসু, দুর্গা দাস—*ভারতের সংবিধান পরিচয়*, নিউ দিল্লি : প্রেন্টিস হল অফ ইন্ডিয়া।

একক ২ ❑ দলব্যবস্থা, নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং জোট রাজনীতি

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ ভারতে দলব্যবস্থা

২.৪ দলব্যবস্থার বিবর্তন

২.৫ নির্বাচনী প্রক্রিয়া

২.৬ পরিবর্তিত সময়ে নির্বাচনী রাজনীতি

২.৭ জোট রাজনীতি

২.৮ সারাংশ

২.৯ নমুনা প্রশ্ন

২.১০ গ্রন্থসূচি

২.১ উদ্দেশ্য :

এই একক পাঠ করার পর আপনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

(ক) ভারতের দলব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে উপলব্ধি

(খ) দল ব্যবস্থার বিবর্তনের পর্যায়গুলি সম্পর্কে পরিচিতি লাভ।

(গ) ভারতের নির্বচনী প্রক্রিয়া ও নির্বাচনী রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণালাভ

(ঘ) জোট রাজনীতিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ।

(ঙ) ভারতীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জন।

২.২ ভূমিকা :

প্রায় ছয় দশকের বেশি সময়কাল ধরে ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের চর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ ক্ষেত্র। কারণ ভারতের গণতান্ত্রিক মডেল বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে আছে যেখানে উন্নয়নশীল অধিকাংশদেশের গণতন্ত্র সংকটে পড়েছে। এমন এক বিশ্বে আমরা বাস করছি, যেখানে

গণতন্ত্র পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে সমার্থক হয়ে পড়েছে সেখানে ভারতের গণতন্ত্র যথার্থই আকর্ষণীয় কূটাভাসের অধিকারী। বিশেষত শত শত বছর ধরে ভারতে সমাজ ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যস্ত, কর্তৃত্বমূলক এবং ভারতের অর্থনীতি দরিদ্র। শুধু তাই নয় দীর্ঘস্থায়ী স্থিরতা এবং রাজনীতিতে জনপ্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগও তেমন নেই।

১৯৪৭ সালে ভারত ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমী উন্নত রাষ্ট্রগুলির মতো তার জাতি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় যেখানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দিকে দল ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নাগরিক কার্যকরী অংশগ্রহণ ঘটবে। সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের চাবিকাঠি ছিল রাজনৈতিক দলগুলির চরিত্র ও প্রকৃতি। সমাজের গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ এবং ধারণা রঙ্গার্থে কেন্দ্র দলগুলি গড়ে ওঠে। সামগ্রিক ব্যবস্থা তৈরীতেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তবে এই সম্পর্ক একমুখীন নয় দলব্যবস্থা যেমন—রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে ঠিক তেমনি রাজনীতিও জটিল জালের মতো দল ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়কে প্রভাবিত করেছে।

২.৩ ভারতে দল ব্যবস্থা :

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত ভারতের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। স্বাধীনতা উত্তর ভারতের দল ও দলব্যবস্থা সম্পর্কে বুঝতে হলে রাজনী কোঠারী ও মরিস জোন্স-এর 'কংগ্রেস ব্যবস্থা' অথবা 'প্রাধান্যকারী দল ব্যবস্থা'র ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। দুজনের বক্তব্য এককভাবে প্রকাশিত হলেও বৃহত্তর প্রেক্ষিতে এর মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কংগ্রেস ব্যবস্থা বলতে তারা বুঝিয়েছেন কংগ্রেস দলকে কেন্দ্র করে দল ব্যবস্থার আবর্তনকে। এটি ছিল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে আসন সংখ্যার বিচারে কংগ্রেস দল প্রাধান্যকারী ভূমিকা পালন করেছিল। বিদ্যমান সাংগঠনিক শক্তির দিক থেকে তখন কংগ্রেস একমাত্র জাতীয় দল হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। কংগ্রেস দলের প্রাধান্য শুরু শাসক দল তথা সরকার গঠন কি বা সাংগঠনিক শক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি। বরং জাতীয় আন্দোলনে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহ্য ও তাদের পক্ষে গিয়েছিল। কংগ্রেস ছিল একটি বৃহত্তর ছাতা স্বরূপ সংগঠন যারা একই সাধারণ কারণে জনগণের সমর্থন পেয়েছিল।

ভারতের দলব্যবস্থাকে আবার 'একদলীয় প্রধান্যকারী' ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করা হয় কারণ এখানে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই মুক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের প্রাধান্য বজায় ছিল। আকর্ষণীয় বিষয় হল ভারতের দল ব্যবস্থাকে প্রাধান্যকারী দল ব্যবস্থা রূপে চরিত্রায়িত করা হয়েছিল যেখানে প্রধান্য আছে আবার প্রতিযেগিতাও ছিল, তাছাড়া কংগ্রেসের মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব ছিল তেমনি কংগ্রেস দলের বিকল্প দলগুলির মধ্যেও তখন দ্বন্দ্ব ছিল।

ভারতের স্বাধীনতা উত্তর সময়কাল থেকে ১৯৬০'র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দলব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক অভিনব প্রতিযোগিতা দেখা যায় যেখানে দলগুলি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভূমিকা

পালন করে। শাসক কংগ্রেস দল 'ঐক্যমত্যের দল' হিসাবে কাজ করে, এটা এমন এক অভিনব অবস্থা যে দলগত অবস্থানে বিরোধীরা কংগ্রেসের কাছাকাছি আসতে পারছিল না কিন্তু নির্বাচনী রাজনীতিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যেকার বিভিন্ন গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে কর্যোদ্ধার করতে চেয়েছিল কংগ্রেসের মধ্যেই বিরোধীদলের ভূমিকা অধিগৃহীতহতে দেখা যায়, তাছাড়া কংগ্রেস দল কাঠামোর অধিকতর গণতান্ত্রিক পরিসর তৈরী করে ভিন্ন মতগুলিকে গুরুত্ব দেয়। যেগুলি আবার বিরোধীদের মতাদর্শ ও স্বার্থকে প্রতিফলিত করে।

কংগ্রেস হয়ে ওঠে, 'ঐক্যমত্যের দল', এই সময়কার দল ব্যবস্থার সব থেকে অভিনব দিক ছিল বিভিন্ন মুখ্য দ্বন্দ্বগুলো কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঘটে নি এবং দ্বন্দ্বটি ছিল কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই কংগ্রেস দল ভারতীয় রাজনীতির সমস্ত মতকেই গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করত। দল বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর দর কষাকষির উপর আলোকপাত করে মেটানোর চেষ্টা করত। সমাজ ও রাষ্ট্রকে এটা বন্ধনের মধ্যে আনয়নের সক্ষমতা কংগ্রেস দলের সাংগঠনিক শক্তির প্রকাশ। রাষ্ট্রের কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কংগ্রেস ছিল প্রভূত শক্তিশালী।

ভারতের রাজনীতির ডান ও বাম মনোভাবকে একই সঙ্গে সংমিশ্রিতকরণের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় শক্তি। ফলত, বাম ও ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের আসন্ন বিলুপ্তিথেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বারংবার বৈপ্লবিক শক্তিশালী মতাদর্শকেন্দ্রিক সংগঠন গড়ে তুলতে চায়।

কংগ্রেসের প্রাধান্যকারী ভূমিকার পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বিভিন্ন বিষয়কে দক্ষতার সঙ্গে পৃষ্ঠপোষণ করা। এর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতামত কংগ্রেসের মধ্যেই থেকে যায় যা আসলে বিরোধী দল তৈরী কিংবা বিরোধীদের উৎসদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারত।

এটাও অবশ্যই বিচার্য যে যখন কেউ অকংগ্রেসী বিরোধী দলগুলোর দুর্বলতা তথা কংগ্রেসের প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষেত্রে অপারগতা নিয়ে কথা বলেন তখন এটা ঠিক যে নির্বাচনী ভোট সংযুক্তির নিরিখে তা বলেন না, কারণ, ১৯৬৭ সালে পূর্বের লোকসভা নির্বাচনেও অ-কংগ্রেসী প্রার্থীরা শতকরা ৫০-এর বেশি ভোট পেয়েছেন। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে অ-অংগ্রেসী দলগুলির প্রাপ্ত ভোটের সম্মিলিত সংখ্যার শতাংশের বিচারে অর্দ্ধেকেরও বেশি ছিল। নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যা এবং নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরোধীদের ছন্নছাড়া অবস্থা ও ভোট ভাগাভাগি কংগ্রেসের আসন লাভের স্বাভাবিক সুবিধা করে দিয়েছিল। অন্যান্য অ-কংগ্রেসী দলগুলো তাদের বহুমাত্রিকতার সমস্যায় ভুগছিল, ভারতীয় সমাজের বিষয়ধর্মী চরিত্র প্রাধান্য দলের বাইরে থাকা দলগুলির মধ্যে নানা বিভাজন স্বাভাবিক করে তুলেছিল।

২.৪ দলব্যবস্থার বিবর্তন :

ভারতের স্বাধীনতাউত্তর দলব্যবস্থার বিবর্তন ইতিহাস বুঝতে হলে আমাদের নিম্নোক্ত মূল পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা যুক্তিযুক্ত।

অ. প্রথম পর্যায় ঃ ১৯৪৭-১৯৬৭ যা ছিল প্রাধান্যকারী দল ব্যবস্থা আগের অংশে আলোচিত হয়েছে।

আ. দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ১৯৬৭-১৯৭৭

ই. তৃতীয় পর্যায় ঃ ১৯৭৭-১৯৮৪

ঈ. চতুর্থ পর্যায় ঃ ১৯৮৪ পরবর্তী

ভারতীয় রাজনীতির চর্চায় দ্বিতীয় পর্যায়ের দলব্যবস্থার বিকাশ ছিল জল বিভাজিকা স্বরূপ। প্রথম পর্যায়ে যেখানে দেশ দেখেছিল ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি আধিপত্যকারী স্থায়ী সরকার গঠনে ভূমিকা, দ্বিতীয় পর্বে হেরুরু মৃত্যুর পর কংগ্রেস আধিপত্য হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৬৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্যে পরাজয় এবং এরই সূত্র ধরে ১৯৭৭ সালে সাধারণলোকসভা নির্বাচনে পরাজয় তা পুষ্ট করে। কংগ্রেস আধিপত্যের ক্রমান্বয়ে অবক্ষয় দলের মধ্যেনেহরু উত্তর পর্বে নতুন ধারা তৈরী করে যা ভারতের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে, নেহরুর মৃত্যুর পর দলের মধ্যে নেতৃত্বের সংঘাত ও উপদলীয় কোন্দল বাড়তে থাকে। দলের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে নানা ধরণের দরকষাকষি দুর্বলতা তৈরী করে। কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু বিরোধী দল তৈরী করে, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিরোধী দলগুলি অনেক রাজ্যে ১৯৬৭ সালের পর জোট সরকার তৈরী করে।

১৯৬৭ সালের পর কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে এই ধরনের প্রবণতা আরও বাড়তে থাকে। কংগ্রেসের অপেক্ষাকৃত বয়ঃজ্যোষ্ঠ অংশ শ্রীমতি গান্ধীর বিরোধিতা করলে কংগ্রেসে ভাঙন হয়। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস (ই) ও কংগ্রেস (ও) তৈরী হয়। ইন্দিরা গান্ধী নিজের কর্তৃত্ব দলের এবং সরকারে বাড়িয়ে নিজেকে জাতীয় স্তরের নেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই ধরনের বহু বিষয়কে কেন্দ্রে করে নির্বাচনে তিনি জয় লাভ করেন। দলত্যাগের ক্ষেত্রে এই সময় দু ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। প্রথমত, কংগ্রেস থেকে যেমন বেরিয়ে যাওয়া ঘটে ঠিক তেমনি কংগ্রেসে অন্তর্ভুক্তিও ছিল। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস এই সময় ডান ও বাম ঘেঁষা নীতি বাদ দিয়ে নিজের শক্তিশালী মতাদর্শকেন্দ্রিক সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

১৯৬৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের আধিপত্যমূলক তথা প্রাধান্যকারী ভূমিকার অবসান হতে শুরু করলে ইন্দিরা গান্ধী রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিরোধী দলগুলির প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। এমনকি বিরোধী দল দ্বারা পরিচালিত রাজ্যগুলিও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। তিনি নতুন ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করেন যা ছিল অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সরকার ও দলের নীতি নির্ধারণে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে দেওয়ার প্রবণতানুসারী। এই ব্যবস্থার ফলে দেখা গেল বহুমাত্রিক বিষমধর্মী সমাজে প্রতিযোগিতামূলক নানা সমস্যা রাজনৈতিক সমাধান করতে অক্ষম।

১৯৭৪ সালে উপরোক্ত সমস্যার হাত ধরে জয়প্রকাশ নারায়ণ সারাদেশে অ-কংগ্রেসী আন্দোলন চালু করেন। এই চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়ায় শ্রীমতি গান্ধী বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে জাতীয় জরুরী

অবস্থা চালু করেন। যদিও এই ধরনের কাজ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিকভাবে তাকে অনেক বেশি হিংসাশ্রয়ী পরিচিত এনে দেয়।

তৃতীয় পর্যায় : ১৯৭৭-৮৪

এই পর্যায় শুরু হয়েছিল ইন্দিরাগান্ধীর কংগ্রেস দলের পরাজয়ের মাধ্যমে প্রথম কেন্দ্রে অ-কংগ্রেসী জনতা সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। জনতা দল ছিল বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের জোট যারা মার্চ ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল। এটা ছিল কংগ্রেসের পরাজিত করার জন্য একটি তালগোল পাকানো জোট, এই দলটির মধ্যে ছিল বিভিন্ন বিরোধীগোষ্ঠী যেমন পুরনো কংগ্রেস (ও), জনসংঘ. ভারতীয় লোকদল, সমাজতান্ত্রিক দল এবং গণতন্ত্রের জন্য কংগ্রেস দলের সমষ্টি। মতাদর্শগত, নেতৃত্বের সামাজিক অবস্থানগত তেমন কোনও সাধারণ যোগসূত্র এখানে ছিল না তাই জনতা দলের এই বিষমধর্মী গঠনের কারণে সরকারকে তদের জোট বেশিদিন স্থায়ী করতে পারে নি। তবে এই সময় কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক দুর্বল হয়েছে। বেশির ভাগ সময়ে কেন্দ্র রাজ্য টানাপোড়েনের কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্যা তৈরী হয়েছিল।

জনতা সরকার যে দল গঠন করেছিল শেষ পর্যন্ত তা ভেঙে যায় এবং ১৯৭৯'র মাঝামাঝি সময়ে সরকার থেকে জনতা দল সরে আসলে সরকার ভেঙে পড়ে। ফলে এই সময়কালে ব্যক্তিগত চাহিদা তথা আকাঙ্খার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অধিকাংশ দল ভারতীয় দলব্যবস্থার বিবর্তনে একটি বিভ্রান্তির তৈরী করে। আরেকবার কংগ্রেস (ই) দলই জাতীয়স্তরে স্থায়ী সরকার দিতে পারবে বলে প্রমাণিত হয়।
কংগ্রেস (ই) দল ১৯৮০ সালে জনতা সরকারের অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ক্ষমতা আসে।

কংগ্রেস বিরোধি দলগুলি কোনও সাধারণ সমস্যার কারণে একীভূত হতে পারেনি, ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার ফলে কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতির হওয়া বইতে থাকে এবং রাজীব গান্ধী হয়ে ওঠেন প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

রাজবংশীয় ধাঁচে উত্তরাধিকারের ধারণা অব্যাহত থাকে এবং ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের ভাঙনের পরও তা নতুন করে রূপান্তরিত হয়।

১৯৮৪'র শেষ দিকের সময়কাল পর্যন্ত ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকলেও প্রকৃত অর্থে তা 'প্রাধান্যকারী দল ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করা যায়, বেশির ভাগ জাতীয় এবং রাজ্য নির্বাচন বিকল্পকে গুরুত্ব দেয়, নির্বাচকদের সচেতনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি সাবালকত্ব দলগুলির পূর্ণ নির্বাচিত হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য স্তরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক দল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই দলগুলির অন্যতম হল লোকদল, সি. পি. আই (এম.) ও বি. জে. পি. ইত্যাদি।

চতুর্থ পর্যায় : ১৯৮৪ পরবর্তী সময়

১৯৮৪'র সময় থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবিধ পরিবর্তন দলব্যবস্থার আলোচনাকে বিভিন্ন দিক থেকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আঞ্চলিক বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে রাজ্য ও কেন্দ্র রাজনীতি ঘুরপাক খাচ্ছে। জাত-পাত, সাম্প্রদায়িকতা ভাষা, নৃ-তত্ত্ব ও বিভিন্ন পরিচিতির ব্যবহার বর্তমানে জাতীয়

ও আঞ্চলিক স্তরের রাজনৈতিক দলগুলির এজেন্ডায় রূপান্তরিত হয়েছে। এটা ঠিক যে, ভারতীয় গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব বিকাশের জন্য নানাভাবেসচেষ্ট। এই পরিস্থিতি কংগ্রেস দলের রাজবংশীয় চরিত্রকে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ধরে রাখতে চায়নি, বরং 'একক প্রাধান্য ধরে রাখতে চায় নি, বরং 'একক প্রাধান্যকারী দলব্যবস্থার' মডেল যা বেশ কিছু দশক চালু ছিল সেখান থেকে বিচ্যুতি ঘটেছিল। এর ফলে ভারতের রাজনৈতিক শক্তির বিভিন্নতা স্বীকৃতি পায়। আমরা এ বিষয় নির্বাচনী রাজনীতিতে পরিবর্তনের আলোকে পরবর্তী অংশে ব্যাখ্যা করব।

২.৫ নির্বাচনী প্রক্রিয়া :

ভারতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার কে কেন্দ্র করে হয়। ১৮৮৯ সালের স্থানীয়নির্বাচনে প্রথম এবং ১৮৯২ সালের আঞ্চলিক পরিষদেও প্রথম নির্বাচনী নীতি কার্যকর করা হয়, ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে বৃটিশ শাসনের অবসানের সময় তারা সংসদীয় প্রতিষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্রীয়কাঠামো প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, নির্বাচনী প্রক্রিয়া রাজনৈতিক দলব্যবস্থা এদেশের শাসন-সংস্কৃতিতে রোপনকরে দিয়ে যায়।এই ব্যবস্থা ১৯৫০ সালের সংবিধান গ্রহণের সময় পুর্ণস্থাপিত করাহয়, প্রতিনিধিত্বমুলক গণতন্ত্রের ভিত্তি ছিল সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার, সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় রাজ্য আইন সভাগুলিকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচিত হতে হবে। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন তৈরীর কথা বলা হয় যার দায়িত্ব হবে নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ করা। যথা—লোকসভা ওবিধানসভা নির্বাচনী এলাকার পুর্নবিন্যাস, যোগ্য ভোটদাতাদের তালিকাভুক্তকরণ, জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলিকে স্বীকৃতিদান এবং প্রতীক প্রদান, প্রার্থীর মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া তৈরী ইত্যাদি। হাজারেরওবেশি নথিভুক্ত কিন্তু অস্বীকৃত রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক ও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ইতিবাচক ক্ষেত্রে স্বার্থের বৃহত্তর ক্ষেত্রে গ্রন্থীকরণ এবং গণতন্ত্রীকরণকে তুলে ধরে নেতিবাচক অর্থে তা ভোট বিভাজনের মং; দিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরী করে।এইধরণের উপাদানগুলি নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও নির্বাচনী রাজনীতিকে জটিল করে তুলেছে।

২.৬ পরিবর্তিত সময়ে নির্বাচনী রাজনীতি :

ভারতের নির্বাচনী রাজনীতির পরিবর্তন সংস্কার শেষ কিছু দশক জুড়ে রাজনীতির পরিবর্তনকে সূচীতকরে। ভারতের প্রতিযোগিতামুখর রাজনীতি বছর বছর বেশ কিছু পরিবর্তনশীল ঘটনার সাক্ষী। ১৯৯০-এর দশকে এই পরিবর্তন অনেকবেশি স্পষ্টভাবে সামনে আসে, রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক উন্নয়ন কিছু অংশে দ্বিমেরুকেন্দ্রীকতার উত্থান ঘটিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে কেউ কেউ আবার এই প্রবণতার মধ্যে একটি দোদুল্যমানতালক্ষ্য করবেন। ১৯৬৯'র পর থেকে সময়কালকে 'নয়া নির্বাচনী ব্যবস্থা' নামে চরিত্ররায়িত করা যায়। এই নয়া নির্বাচনী ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভোটারদের কাছেবহু পছন্দের উপস্থিতি। বিপ্রতীপে পূর্বের নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেস ভাবনা ছিল নির্বাচকদের কাছে

পছন্দের মূল কেন্দ্র। কংগ্রেসের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে ভোটদানের পছন্দই ছিল। কিন্তু বর্তমানে বহু অ-কংগ্রেসী দলের উত্থানের ফলে তা নানা বিকল্প সামনে এনেছে। এই অর্থে ভারতের নির্বাচনী রাজনীতি কংগ্রস-উত্তর রাজনীতি নামে চিহ্নিত করা যায়। ১৯৮৯ ও ১৯৯১'রমধ্যেকার এই পরিবর্তনের মূল নির্দ্ধারকরূপে তিনটি 'এম'কে দায়ী করা যায়, মণ্ডল মন্দির এবং মার্কেট তথা বাজার, এই সকল বিষয়ে ভারতীয় রাজনীতিনয়া সমস্যার সম্ভাবনা তৈরী করেছে। এখানে নতুন ধরনের রাজনৈতিকসচলায়ন সংগঠিত হয়েছে। প্রচ্ছন্ন কিছু উপাদানের উপস্থিতিনির্বাচনী রাজনীতিও ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে। বি. জে. পি—র উত্থান বিশেষ করে হিন্দি বলয়ের রাজ্য, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহারসহও কেরালায় কংগ্রেস বিরোধী ভোট বামদলগুলিকে দেওয়ার দীর্ঘ ঐতিহ্য তৈরী হয়েছে। ভারতীয় নির্বাচনী রাজনীতিতে জাতীয় দলরূপে বি.এস.পি., সমাজবাদী দল সমতা পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, এন. ডি. সি মমতা ব্যানার্জীর টি. এম. সি., ডি. এম. কে., এ. আই. এ. ডি. এম. কে. এবং টি. ডি. পি. ইত্যাদির উত্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যদিও তাদের রাজনৈতিক অভীপ্সা প্রাথমিক পর্বে রাজ্য কেন্দ্রিক হলেও পরবর্তী সময়ে তারা দীর্ঘমেয়াদিভাবে জাতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করার কথা ভাবেন।

২.৭ জোট রাজনীতি :

১৯৮৯ সালের জাতীয় নির্বাচনের পরে ১৯৯৯ সালের রাজ্যগুলির নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভাঙন ও পুনর্গঠন জোট রাজনীতির একনতুন বাতাবরণ তৈরী করেছে। ১৯৭০'রদশকে জাতীয় কংগ্রেসও জনতা দলের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা তৈরী করেছে। এর মধ্যে দিয়ে রাজ্যগুলির সমর্থনের ভিত্তির পরিবর্তন হয়েছে। দলব্যবস্থার এই পরিবর্তন ১৯৮০'র দশকে প্রতিযোগিতাকে দলগুলির মধ্যে অনেক উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এই ধরনের ঘটনাপ্রবাহ রাজনীতিতে নতুন সম্ভাবনা তৈরী করেছিল। কেন্দ্রে জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলি সরকার গঠনের এগিয়ে আসে। অন্যদিকেএকই সঙ্গে রাজগুলিতেও আঞ্চলিক ও জাতীয় দলের মিলিত জোট সরকার তৈরী করে। শেষ পনের বছরের বেশি সময় ধরে জোট রাজনীতির যুগে তিন ধরনের চরিত্রবিশিষ্ট জোট তৈরী হয়েছে। যথা—কংগ্রেসদলকে কেন্দ্রে রেখে জোট, বি. জে. পি.-কে কেন্দ্র করে জোট এবং অ-কংগ্রেসী ও অ-বি.জে.পি. তৃতীয় ফ্রন্ট। কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত হয় ইউ. পি. এ তথা সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা, বিজেপি-র, নেতৃত্বে গঠিত হয় জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চাতথা এন. ডি. এ যারা ১৯৯৮ সালে ক্ষমতায় ছিল ; ২০০৪ সালে ইউ. পি. এ ঃ ক্ষমতায় আসে, তৃতীয় ফ্রন্ট এখনও সেভাবে বাস্তবায়িত হয় নি।

বেশির ভাগ রাজ্যে প্রতিযোগিতা মূলক দুটি শক্তিশালী দল, কিংবা দুটি জোট কিংবা দুটি রাজ্যদলের মধ্যে সংগঠিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কংগ্রেস ও বি. জে. পি-র মত মূল দল দিল্লী, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, গুজরাট ইত্যাদি রাজ্যে প্রতিযোগিতারত, কেরালা এবং ত্রিপুরা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট ও বাম নেতৃত্বাধীন জোটের মধ্যে লড়াই এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও আসাম প্রদেশে জাতীয় ও রাজ্যদল কিংবা তাদের জোটের মধ্যে লড়াই দেখা যায়।

যদি কেউ রাজ্যগুলির প্রতিযোগিতামূলক দলব্যবস্থার প্রতি আলোকপাত করেন তাহলে চারটি প্রবণতা দেখতে পাবেন।

প্রথমত, কিছু রাজ্য দ্বি-মুখী রাজনৈতিক লড়াইয়ের চরিত্র বিশিষ্ট কিন্তু দ্বি-দলীয় নয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরা মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, কর্ণাটক, বিহার ও উড়িষ্যার মতো রাজ্যগুলিতে নয়া জোট গঠনের ফলে দ্বিমেরু কেন্দ্রিকতা বেড়েছে।

তৃতীয়ত, বেশ কিছু রাজ্যে তৃতীয় কিছু দল রাজ্যগুলির দুটি মূল দল বা মূল জোটের বাইরে ভোটে ভাগ বসায়। আসাম উড়িষ্যা, গোয়া, পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর ইত্যাদি রাজ্যগুলির উদাহরণ দেওয়া যায়, বি. জে. পি. ও বহুজন সমাজ পার্টি রাজ্যগুলি উদীয়মান তৃতীয় দল।

চতুর্থত, উত্তরপ্রদেশে চর্তুমুখীলড়াই হয় এবং অভিনব এই লড়াইয়ে প্রত্যেক দলই জাতপাতকে বৃহত্তরভাবে ব্যবহার করে।

১৯৯০ সালের পর থেকে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার সচলায়েনের ফলে দলিত, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, ধর্ম, ভাষা, নৃতত্ত্বের মতো সামাজিক সমস্যা রাজনীতির ভিত্তি হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলি উক্ত সামাজিক সমস্যাগুলিকে নিয়ে এগোলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা সামনে আসবে। এই ধরনের বহুমাত্রিক রাজনৈতিক প্রবণতা জাতীয় স্তরের সরকার গঠনে আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। জোট রাজনীতি দলগুলির সংঘাত ও সহযোগিতার সমস্ত দিক উন্মুক্ত করেছে। সর্বভারতীয় দলগুলির সমর্থনের ভিত্তির ক্ষেত্রে নানা ধরনের সংঘাত দেখা যায় এবং আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব বাড়ে। অন্যদিকে আঞ্চলিক দলগুলির জাতীয় স্তরে এই গুরুত্ব বৃদ্ধি তাদের আরও বেশি যুক্তরাষ্ট্রমুখীন করে তোলে। এই সমস্তই হল ভারতের জোট রাজনীতির চরিত্র।

২.৮ উপসংহার :

ভারতের দলব্যবস্থার বিবর্তনের ক্ষেত্রে 'ঐক্যমত ভিত্তিক কংগ্রেসী ব্যবস্থা' থেকে প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক রূপান্তর আলোচিত হয়েছে, আরও আকর্ষণীয় বিষয় হল এই প্রতিযোগিতা মুখর দলব্যবস্থায় বিজেপি কিংবা কংগ্রেসের মতো কেউই এককভাবে নিবাচনী সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়েছে, নয়া নির্বাচনী ব্যবস্থা সমাজের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলোকে সামনে নিয়ে এসেছে। কেন্দ্রীয়স্তরে অনেক আঞ্চলিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন আমাদের জোট রাজনীতি যুগে নিয়ে গেছে। ভবিষ্যতে কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে দলগুলির মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্কের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে। কংগ্রেস উত্তর ভারতীয় রাজনীতিরপ্রবণতা অনেক বেশি প্রতিযোগিতা ও বহুমাত্রিক প্রতিনিধিত্বকে তুলে ধরেছে। এই বিষয়গুলি দীর্ঘমেয়াদিভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে দলব্যবস্থার প্রবেশ ঘটিয়েছে।

২.৯ নমুনা প্রশ্ন :

বড়ো প্রশ্নমালা

১। ভারতের কংগ্রেস ব্যবস্থার একটি রূপরেখা দিন।

২। ভারতের দলব্যবস্থার বিবর্তনের পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ করুন।

মাঝারি প্রশ্নমালা

৩। পরিবর্তিত সময়ে নির্বাচনী রাজনীতির উপর একটি টীকা লিখুন।

৪। জোট রাজনীতির সময় দলব্যবস্থার ভাঙনের প্রকৃতি পর্যালোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা

৫। ১৯৭৯'র পর 'নয়া নির্বাচনী ব্যবস্থার' বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৬। রাজনৈতিক দলের আঞ্চলিকীকরণের যুগে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার চরিত্র ও গতি প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

২.১০ গ্রন্থসূচি :

1. Rajni Kothari, *Politics In India*, New Delhi, Orient Longman, 1970.
2. Zoya Hasan (ed). *Parties and Party Politics In India*, Oxford University Press, New Delhi 2009.
3. Partha Chatterjee (ed), *State and Politics In India*, Oxford University Press, Delhi 1997.
4. Rajni Kothari, *Politics and the People* Vol I and II, Ajanta Publications (India),Delhi 1989.
5. W.H. Morris Jones, *The Government and Politics of India*, BI Publications, New Delhi 1979.

একক ৩ সংসদীয় সার্বভৌমত্ব ও বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা

৩ (ক) সংসদীয় সার্বভৌমত্ব

গঠন

৩ (ক).১ উদ্দেশ্য

৩ (ক).২ ভূমিকা

৩ (ক).৩ সংসদীয় সার্বভৌমত্বের অর্থ

৩ (ক).৪ ভারতের সংসদ কি সার্বভৌম?

৩ (ক).৫ ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সংসদের স্থান

৩ (ক).৬ সংসদীয় সার্বভৌমত্ব এবং বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার দ্বন্দ্বের স্বরূপ

৩ (ক).৭ উপসংহার

৩ (ক).৮ নমুনা প্রশ্ন

৩ (ক).৯ গ্রন্থসূচি

৩ (ক).১ উদ্দেশ্য :

এই এককটি দুটি অংশে বিভক্ত, ৩ (ক) অংশে আমরা ভারতীয় সংসদের সার্বভৌমিকতা বিষয়ে প্রধানতঃ আলোকপাত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছি। প্রসঙ্গতঃ বিচার বিভাগের অধিকারের কথাও এসেছে। তবে ৩ (খ) অংশে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৩ (ক).২ ভূমিকা :

ব্রিটেনের মতো ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে। এখানে সংসদের, বিশেষত সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ মন্ত্রী পরিষদ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু ব্রিটিশ সংসদের মতো ভারতীয় সংসদও কি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা? এ বিষয়ে পরস্পর বিরোধী মতামত দেখা যায়।

এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলার (১৯৫০) বিচারের সময় (ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিজনকুমার মুখার্জি বলেন যে, যদিও ভারতের সংবিধান ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থার অনেক নীতি গ্রহণ করেছে, কিন্তু আইন প্রণয়ণ সম্পর্কে সংসদের সর্বময় কর্তৃত্ব বিষয়ে ব্রিটিশ মতবাদ গ্রহণ

করেনি। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় (১৯৫৭) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মন্তব্য করেন, 'আমাদের একটি সংসদ আছে যা সার্বভৌম।'

৩ (ক).৩ সংসদীয় সার্বভৌমত্বের অর্থ :

এই বিতর্কিত বিষয়ের পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমে জানা দরকার সংসদের সার্বভৌমত্ব বলতে কী বোঝায়? 'ইনট্রোডাক্শন্ টু দ্য ল অব দ্য কনস্টিটিউশন' গ্রন্থে ডাইসি বলেন যে, সংসদীয় সার্বভৌমত্বের অর্থ হল সংসদ যে কোনো আইন রচনা বা বাতিল করার অধিকারী এবং ব্রিটেনে এমন কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ নেই যা সংসদীয় আইনকে বাতিল বা খারিজ করতে পারে।

৩ (ক).৪ ভারতের সংসদ কি সার্বভৌম? :

যে অর্থে ব্রিটেনের সংসদ সার্বভৌম সে অর্থে ভারতের সংসদ সার্বভৌম নয়। *প্রথমত,* ভারতের সংবিধান লিখিত। এই লিখিত সংবিধানের পঞ্চম অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (Chapter II of Part V) সংসদের গঠন প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। আমাদের সংসদ সংবিধান দ্বারা সৃষ্ট। *দ্বিতীয়ত,* ব্রিটেনের সংসদের মতো ভারতের সংসদ যে-কোনো আইন রচনা করতে পারে না। সংবিধানের একাদশ অংশের প্রথম অধ্যায়ের (Chapter I of Part XI) 'আইন সম্পর্ক' (Legislative Relations) অংশে আইন প্রণয়ন সম্পর্কে সংসদের ক্ষমতার পরিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সংসদকে আইন রচনা করতে হয়। *তৃতীয়ত,* ভারতের সংবিধানের আদালতকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনাকে ক্ষমতা (power of judicial review) দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা বলে সংসদে রচিত যে কোনো আইন সুপ্রিম কোর্টে বাতিল করতে পারে, যদি শীর্ষ আদালত মনে করে, সংশ্লিষ্ট আইন সংবিধান বিরোধী বা মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করে। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'রাষ্ট্র এমন কোনো আইন রচনা করবে না যা এই অংশে (মৌলিক অধিকার অংশে) প্রদত্ত অধিকার হরণ বা খর্ব করে এবং এই ধারা লঙ্ঘন করে কোনো আইন রচিত হলে তা যতখানি লঙ্ঘন করবে ততখানি বাতিল হবে" [১৩(২) ধারা]। অর্থাৎ মৌলিক অধিকার খর্ব বা ক্ষুণ্ণ করে কোনো আইন প্রণীত হলে সুপ্রিম কোর্ট সেই আইনকে সংবিধানসম্মত নয় বলে বাতিল করতে পারে। সুতরাং ব্রিটেনের মতো ভারতের সংসদকে সার্বভৌম বলা যায় না। বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ গ্র্যানভিল অস্টিন যথার্থই মনে করেন, 'এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না....যে সংবিধান সভা (Constituent Assembly) সংসদীয় সার্বভৌমত্বের পক্ষে ছিল। সদস্যরা বিশ্বাস করতেন যে, সংবিধান সভা উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং এর সৃষ্ট রচনাই দেশের সর্বোচ্চ আইন হওয়া উচিত" (অস্টিন ১৯৬৬/১৯৯৯ : ২৬৪)। ("It must not be assumed... that ... the Assembly favoured parliamentary Sovereignty. The members belived that the Assembly had superior status and that its product should be the supreme law of the land.")।

৩ (ক).৫ ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সংসদের স্থান :

তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বমূলক এবং আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে সংসদ ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। আইন প্রণয়ন, আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, লোকসভার কাছে মন্ত্রীপরিষদের দায়বদ্ধতা, রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন ও অপসারণ বিষয়ে— ক্ষমতা, সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে সংসদের প্রাধান্য প্রমাণ করে।

৩ (ক).৬ সংসদীয় সার্বভৌমত্ব এবং বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার দ্বন্দ্বের স্বরূপ :

ভারতে সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে সংসদ ও আদালতের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লয়েড রুডলফ ও সুজান রুডলফ এই দ্বন্দ্বকে সংসদীয় সার্বভৌমত্ব ও বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার দ্বন্দ্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন (রুডলফ ও রুডলফ ১৯৮৭ ঃ তৃতীয় অধ্যায়)। রুডলফদের মতে, এই দ্বন্দ্বের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সম্পত্তির অধিকারের অর্থ ও সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করা (রুডলফ ও রুডলফ, তদেব, ১০৮)। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে কংগ্রেস দলের ঘোষিত নীতি ছিল জমিদারি ব্যবস্থা বিলোপ করে কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষিত করা। স্বাধীনতার পর উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যের আইনসভার কৃষি সংস্কার আইন পাশ করা হয়। জমিদারদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টে মৌলিক অধিকার (বিশেষত সম্পত্তির অধিকার) খর্ব করার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভায় রচিত কৃষি সংস্কার আইন বৈধ বলে স্বীকার করে নিলেও, পাটনা হাইকোর্ট বিহার রাজ্যের সংশ্লিষ্ট আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। এ বিষয়ে আপিল সুপ্রিমকোর্টে বিবেচনাধীন থাকার সময় ১৯৫১ সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধন আইন পাশ করা হয়। এই সংশোধনের দ্বারা মৌলিক অধিকারের ব্যতিক্রম হিসাবে ৩১ক, ৩১খ এবং নবম তফশিলযুক্ত করা হয়। জমিদারি অধিগ্রহণ করে কৃষি সংস্কার যাতে করা যায় এবং এক্ষেত্রে আদালত যাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, সেই কারণে উপরোক্ত সংবিধান সংশোধন করা হয়।

ভারতের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনের (১৯৫৫) সাহায্যে ৩১ক ধারা শুধু কৃষি সংস্কার আইনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনকল্পে জমি অধিগ্রহণের জন্য আইন, সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বাণিজ্যিক ও শিল্প সংস্থা অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নানা সমাজকল্যাণমূলক আইনের ক্ষেত্রেও তা প্রসারিত হয়েছে।

শঙ্করীপ্রসাদ বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া মামলা— (১৯৫১) এবং **সজ্জন সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য মামলায়** (১৯৬৫) ভারতের সুপ্রিমকোর্ট স্বীকার করে নেয় যে, সংবিধান সংশোধন বিষয়ে সংসদের ক্ষমতা অসীম। অর্থাৎ সংসদ সংবিধান সংশোধন করে সংবিধানের যে কোনো অংশের সংশোধন করার অসীম ক্ষমতা ভোগ করে।

বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রতাপভানু মেহতা যথার্থই মনে করেন যে, সংবিধান চালু হওয়ার পর থেকে (১৯৫০) সতেরো বছর (১৯৬৭) যে ছবি পাওয়া গেল তা অনেকটা এই রকম ঃ আইনসভা আইন রচনা করে, সেই আইন সংবিধান বিরোধী এই যুক্তিতে আদালত তা অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। এর ফলে সংসদ সংবিধান সংশোধন করে এবং শীর্ষ আদালত সেই সংশোধনের বৈধতা স্বীকার করে নেয় (প্রতাপভানু মেহতা ২০০২ ঃ ১৮৩)।

কিন্তু **গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলা (১৯৬৭)** থেকে এই চিত্রটির পরিবর্তন হতে থাকে। অর্থাৎ এই সময় থেকে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সূচনা। **শঙ্করীপ্রসাদ** এবং **সজ্জন সিং** মামলার রায় খারিজ করে **গোলকনাথ মামলায়** সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করে যে, সংসদ মৌলিক অধিকার সংশোধন করার ক্ষমতা ভোগ করে না। (মেহতা তদেব ঃ ১৮৩ ; রাজু রামচন্দ্রন ২০০০ ঃ ১১১-১১২)।

শীর্ষ আদালতের এই রায়ের ফলে দেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এই বাধা দূর করার জন্য সংবিধানের ২৪তম ও ২৫তম সংশোধন বিধি (১৯৭১) সংসদে পাশ করা হয়। এই দুটি সংশোধনের ফলে সংবিধানের যে সব পরিবর্তন হয় তার মধ্যে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, সংবিধানের ৩৬৮(১) ধারায় উল্লেখ করা হল যে, সংবিধানের যে কোনো ধারার সংযোজন, পরিবর্তন বা বাতিল করে সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা সংসদের আছে। দ্বিতীয়ত, সংবিধানের ৩৯(খ) ও (গ) ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি সম্পর্কে আদালতের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে।

কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্য মামলায় (১৯৭৩) সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করে নেয় যে, সংসদ মৌলিক অধিকারসহ সংবিধানের যে কোন অংশের সংশোধন করতে পারে। তবে সংবিধানের ২৫তম সংশোধনের সাহায্যে ৩৬৮ ধারার যে অংশে সুপ্রিম কোর্টের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, তা শীর্ষ আদালত অসাংবিধানিক বলে খারিজ করেছে। কারণ এই ক্ষমতা সংবিধানের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং উপরোক্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য হল সংসদ সংবিধানের যে কোনো অংশের সংশোধন করতে পারলেও সংবিধানের অপরিহার্য মৌল কাঠামোর (basic structure) পরিবর্তন করতে পারে না। এই মৌল কাঠামোর ধারণার উদ্ভাবন করে শীর্ষ আদালত সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে।

মৌল কাঠামোর ধারণার সাহায্যে সুপ্রিম কোর্ট সংসদের ক্ষমতার উপর যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তা দূর করার জন্য সংসদ ৪২তম সংবিধান সংশোধন (১৯৭৬) দ্বারা ৩৬৮ ধারায় ৪ ও ৫ উপধারা যোগ করে। ৩৬৮(৪) ধারায় বলা হয় যে, কোনো সংবিধান সংশোধন বিধির বৈধতা নিয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। ৩৬৮ (৫) ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতার উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। তা ছাড়া সংবিধানের ৩১গ ধারা সংশোধন করে বলা হয় যে, সংবিধানের চতুর্থ অংশে (Part IV) উল্লিখিত যে-কোনো নির্দেশাত্মক নীতি কার্যকর করার জন্য কোনো বিধি রচনা করা হল তা ১৪ ধারা (আইনগত সাম্যের অধিকার),

১৯ ধারা (ছয় প্রকার স্বাধীনতার অধিকার) এবং ৩১ ধারার (সম্পত্তির অধিকার) বিরোধী হলেও অসাংবিধানিক বলে গণ্য করা হবে না।

সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনের (১৯৭৮) আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু মিনার্ভা মিল্‌স্ বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া মামলায় (১৯৮০) সুপ্রিম কোর্ট যে অভিমত প্রকাশ করে তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের সাহায্যে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি যেভাবে প্রসারিত হয়েছে তাতে মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এবং মৌল কাঠামো লঙ্ঘন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ৩৬৮(৪) এবং (৫) ধারাও সংবিধানসম্মত নয়, কারণ এ ক্ষেত্রেও মৌল কাঠামো লঙ্ঘিত হয়েছে। ৩৬৮(৪) ধারা অনুসারে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে এবং ৩৬৮(৫) ধারায় সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের মতে, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা এবং সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ভারতের সংবিধানের অপরিপার্য মৌল বৈশিষ্ট্য।

৩ (ক).৭ উপসংহার :

বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রতাপভানু মেহতা উল্লেখ করেছেন যে, অনেক পর্যাবেক্ষকের মতে, মৌল কাঠামোর ধারণার মাধ্যমে ভারতে সংসদীয় সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে বিচার বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (প্রতাপভানু মেহতা, তদেব, ১৮০)। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষ থেকে ভারতে এক দলীয় শাসনের অবসান এবং বহুদল নিয়ে গঠিত জোট সরকারের সূচনা হয়। এই অবস্থায় সংসদে কোনো একটি দলের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য নেই। মেহতা মনে করেন যে, ভবিষ্যতে সংসদে কোনো দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে সংসদ ও বিচারবিভাগের দ্বন্দ্ব কী রূপ নেবে তা বলা খুবই কঠিন (প্রতাপভানু মেহতা, তদেব ১৮৭)।

৩ (ক).৮ নমুনা প্রশ্ন :

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা

(১) সংসদীয় সার্বভৌমত্ব বলতে কী বোঝায়?

(২) সংবিধানের কোন অংশে সংসদের আইন প্রণয়ণ সংক্রান্ত ক্ষমতার পরিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে?

(৩) ভারতের সংবিধানের কি আদালতকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে?

(৪) মৌলিক অধিকার খর্ব বা ক্ষুণ্ণ করে রাষ্ট্র কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে কি?

(৫) ভারতে সংসদীয় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে গ্র্যানভিল অস্টিনের মত উল্লেখ কর।

(৬) ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সংসদের স্থান নির্দেশ কর।

(৭) ভারতের সংবিধানের প্রথম ও চতুর্থ সংশোধন করা হয়েছিল কেন?

(৮) ভারতের সংবিধানে সংশোধন সম্পর্কে শঙ্করীপ্রসাদ মামলায় সুপ্রিমকোর্টের বক্তব্য উল্লেখ কর।

(৯) ভারতের সংবিধান সংশোধন বিষয়ে গোলকনাথ মামলায় শীর্ষ আদালতের বক্তব্য উল্লেখ কর।

(১০) ২৪তম ও ২৫তম সংশোধনের দ্বারা সংবিধানের যে যে বিষয়ের পরিবর্তন করা হয়েছে তা উল্লেখ কর।

(১১) কেশবানন্দ ভারতী মামলায় ভারতের সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে সুপ্রিমকোর্টের বক্তব্য উল্লেখ কর।

(১২) ৪২তম সংশোধন দ্বারা ৩৬৮ ধারায় যে পরিবর্তন করা হয়েছে তা উল্লেখ কর।

(১৩) সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে মিনার্ভা মিল্‌স্‌ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য উল্লেখ কর।

(১৪) ভারতে বিচারবিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি?

দীর্ঘ প্রশ্নমালা

(১) যে অর্থে ব্রিটেনের সংসদ সার্বভৌম সেই অর্থে ভারতীয় সংসদ কি সার্বভৌম?

(২) ভারতের সংসদীয় সার্বভৌমত্ব ও বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

৩ (ক).৯ গ্রন্থসূচি :

1. Austin, Granville (1966/1999), *The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation*, Bombay : OUP, Oxford India Paper Book Edn., 1999.
2. ,, (1999) *Working a Democratic Constitution : A History of the Indian Experience*, New Delhi : OUP.
3. ,, (2000) 'The Supreme Court and the struggle for Custody of the Constitution', in B. N. Kirpal et at (edi.) *Supreme But Not Infallible : Essays in Honour of the Supreme Court of India*, New Delhi : OUP
4. ,, (2002) 'The Expected and the Unintended in Working a Democratic constitution', in Zoya Hasan etal (eds.) *India's Living Constitution* : Delhi : Parmanent Black.
5. Basu, D. D. (1996) *Shorter Constitution of India*, New Delhi, PH-I, 12 edition.
6. ,, (2008) *Introduction to the Constitution of India*, Nagpur : Lexis Nexis Butterworths Wadhwa, 20th edition.

7. Mehta, Pratap Bhanu (2002), 'The Inner Conflict of Constitutionalism : Judicial Review and the 'Basic Structure', in Zoya Hasan et al (eds), *Idia's, Living Constitution : Indeas Practices, Controverses*, Delhi : Permanent Black.

(2007) 'The Rise of Judicial Sovereignty' in Sumit Ganguly (ed.), *The State of India's Democracy*, Baltimore : The John Hopkins University Press.

8. Ramachandran, Raju (2002), 'The Supreme Court and the Basic Structure Doctrine' in B. N. Kirpal et al (eds) *Supreme But not Infallible : Essays in Honours of Supreme Court of India*, New Delhi : OUP

9. Rudolph, L. I. & Rudolph, S. H. (1987) *In Pursuit of Lakshmi : The Political Economy of the Indian State*, Chicago : University of Chicago Press, Reprinted 1998, New Delhi : Orient Longman.

একক ৩ □ বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা

৩ (খ) বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা

গঠন

৩ (খ).১ উদ্দেশ্য

৩ (খ).২ ভূমিকা

৩ (খ).৩ বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার অর্থ

৩ (খ).৪ মৌল কাঠামো সম্পর্কে ধারণার অর্থ

৩ (খ).৫ জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলার অর্থ

৩ (খ).৬ জনস্বার্থবিষয়ক মামলার শ্রেণিবিভাগ

৩ (খ).৭ জনস্বার্থবিষয়ক মামলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

৩ (খ).৮ আলোচনার সংক্ষিপ্তসার

৩ (খ).৯ সমালোচনা

৩ (খ).১০ উপসংহার

৩ (খ).১১ নমুনা প্রশ্ন

৩ (খ).১২ গ্রন্থসূচি

৩ (খ).১ উদ্দেশ্য :

এই এককের বর্তমান অংশে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার অর্থ এবং ভারতীয় প্রেক্ষিতে তার তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সংসদীয় সার্বভৌমিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটনে ও ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি অনুধাবনে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ

৩ (খ).২ ভূমিকা :

সংসদীয় সার্বভৌমত্ব এবং বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার দ্বন্দ্বের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বক্তব্য হল যে, অনেক পর্যবেক্ষকের মতে ভারতে সংসদীয় সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে বিচারবিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রাধান্যকে বোঝাতেই বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার কথা সাম্প্রতিককালে শোনা যাচ্ছে।

৩ (খ).৩ বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার অর্থ :

বিচারাবিভাগীয় সক্রিয়তার অর্থ হল ভারতে বিচারবিভাগ—বিশেষত ভারতের সুপ্রিম কোর্ট—সাম্প্রতিককালে এমন এক সক্রিয়, গতিশীল ভূমিকা পালন করছে যা ভারতের সংবিধান প্রণেতারা কল্পনাও করতে পারেননি। আইনের বিশিষ্ট অধ্যাপক উপেন্দ্র বক্সি-র মতে, ভারতে শীর্ষ আদালত বিচারের ক্ষেত্রে দুটি অনন্যসাধারণ বিষয় উদ্ভাবন করেছে, যার ফলে ভারতের বিচার বিভাগ বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই বিষয় দুটি হল ঃ (ক) সংবিধানের মৌল কাঠামো সম্পর্কে ধারণা (Concept of the basic structure of the constitute) এবং (খ) জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলা (Public interest litigation) (উপেন্দ্র বক্সি, ১৯৯৬ ঃ ১১)।

৩ (খ).৪ মৌল কাঠামো সম্পর্কে ধারণার অর্থ :

ভারতের সংবিধানের কোনো অংশে মৌল কাঠামোর উল্লেখ করা হয়নি। বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসুর মতে, "এটি একটি বিচারবিভাগীয় উদ্ভাবন যার সূচনা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ মামলায় ("... it is a judicial innovation, introduced in 1973 by the Supreme Court in Keshavananda's case.") (ডি. ডি. বসু, ১৯৯৬ ঃ ২২৩)।

২৫তম (১৯৭১) এবং ২৯তম (১৯৭২) সংবিধান সংশোধনের বৈধতা বিচার করতে গিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করে যে, ভারতের সংসদ মৌলিক অধিকারসহ সংবিধানের যে-কোনো অংশের সংশোধন করতে পারলেও সংবিধানের মৌল কাঠামোর পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ ভারতের শীর্ষে আদালতের মতে, ভারতের সংবিধানের কিছু অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলিকে মৌল কাঠামো বলা হয়। যেমন, সংবিধানের প্রাধান্য, আইনের শাসন, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা প্রভৃতি ভারতের সংবিধানের মৌল কাঠামো হিসাবে চিহ্নিত হয়। এর ফলে ভারতের সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ভারতের সংসদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল এবং একই সঙ্গে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা (power of judicial review) সুদৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ রাজু রামচন্দ্রনের মতে, কেশবানন্দ মামলায় সুপ্রিমকোর্ট ভারতের সাংবিধানিক রাজনীতিতে নিজের জন্য এক নতুন ও দুর্ভেদ্য ভূমিকা পালন করা সুনিশ্চিত করল ["In Keshavananda the Court assured for itself a new and impregnable role in the constitutional politics of India", রাজু রামচন্দ্র (২০০০ : ১৮)]।

৩ (খ).৫ জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলার অর্থ :

জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলা বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার আর একটি দিক। এই ধরনের মামলার উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিত প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষ জানেন না ভারতের সংবিধানে জনগণকে কী কী অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং কীভাবে সেই অধিকার রক্ষা

করা যায়। এর ফলে এই সব নিপীড়িত মানুষেরা নানা ধরনের অবিচারের শিকার হন। যেমন, হোসেনারা খাতুন নামে এক মহিলাসহ নিম্নবর্ণের মানুষ অতি সাধারণ অভিযোগের ভিত্তিতে দীর্ঘকাল বিনা বিচারে জেলে আটক থাকেন। ভাগলপুরে কারাগারে অবর্ণনীয় পুলিশি অত্যাচারের ফলে ৩১ জন বন্দি অন্ধ হয়ে যান। সংবিধানের ২৩ ধারায় বেগার ও অনুরূপ বলাৎশ্রম নিষিদ্ধ করা হলেও মুচলেকাবদ্ধ শ্রমিক (bonded labour) বেগার খাটতে বাধ্য হন।

এই পরিস্থিতিতে বিশ শতকের সত্তরের দশকের শেষে এবং আশির দশকের গোড়ায় ভারতীয় সমাজের এইসব অবহেলিত মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এক নতুন ধরনের মামলার উদ্ভব হয় যা জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা (Public Interest Litigation) নামে পরিচিত।

ভারতের শীর্ষ আদালতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পি. এন. ভগবতীর মতে, জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা "সেই মামলা যা জনগণের ক্ষতির প্রতিবিধান করে, সরকারি দায়বদ্ধতাকে সুনিশ্চিত করে, সামাজিক, সমষ্টিগত ও বিক্ষিপ্ত অধিকার ও স্বার্থগুলিকে সংরক্ষিত করে অথবা জনস্বার্থকে সুরক্ষিত রাখে" (Public interest litigation means a "litigation undertaken for the purpose of redressing public injury, enforcing public duty, protecting social, collective, diffused rights and interests or vindicating public interest..." AIR, ১৯৮২, বি. আর. আগরওয়াল, ১৯৯৩ ঃ ১৭৭ থেকে উদ্ধৃত)।

কে বা কারা এই জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলা রুজু করতে পারেন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে দু-একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে জনগণকে যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, তা রক্ষা করার জন্য ওই অংশের ৩২ ধারায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার আছে। আমাদের মৌলিক অধিকার খর্ব বা ক্ষুণ্ণ করা হলে আমরা সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারি। তাছাড়া মৌলিক অধিকারসহ সংবিধানে স্বীকৃত অন্যান্য অধিকার রক্ষার জন্য ২২৬ ধারায় হাইকোর্টেও আবেদন করা যায়।

আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে আদালতে আজ্ঞালেখ আর্জি বা আবেদন (writ petition) করতে হয়। সেই ব্যক্তিই আদালতে আর্জি পেশ করবেন যাঁর অভিযোগ হল তাঁর মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষ নিয়ে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আবেদন করলে তাঁর হস্তক্ষেপের অধিকার (locus standi) নেই এই যুক্তিতে তা খারিজ করা হতে পারে।

১৯৭০ দশকের শেষ থেকে ভারতে সুপ্রিম কোর্ট জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলার উপরোক্ত নিয়মকানুন শিথিল করেছে। অগণিত নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকার রক্ষার স্বার্থে জনস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন কোনো ব্যক্তি অথবা সংগঠন হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করলে আদালত সেই আবেদন গ্রাহ্য করতে পারে। তাছাড়া, আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে আজ্ঞালেখ আর্জি পেশ না করা হলেও আদালত একটি চিঠি, টেলিগ্রাম অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনকে (report) আজ্ঞালেখ আবেদন হিসাবে গ্রহণ

করতে পারে। অধ্যাপক উপেন্দ্র বক্সি একে শীর্ষ আদালতের "ইপিস্টোলারী জুরিসডিকশন" (Epistolary jurisdiction) বলেছেন (বক্সি, ১৯৮৩)।

আইনের প্রখ্যাত অধ্যাপক এস. পি. সাঠে মনে করেন যে, নিম্নলিখিত কারণে উপরোক্ত নিয়মকানুন শিথিল করা হয়। প্রথমত, অধিকার ভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির মানুষের দোর গোড়ায় আদালত যাতে পৌঁছতে পারে; দ্বিতীয়ত, দুর্নীতিগ্রস্ত ও অযোগ্য প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে উদ্ভুত সমস্যাগুলি জনস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে তুলে ধরতে পারেন ; তৃতীয়ত, বিচারব্যবস্থায় জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ যাতে বৃদ্ধি করা যায় (সাঠে, ২০০২ : ২০২)।

যে যে বিষয় জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলা হিসাবে গণ্য হতে পারে তার উল্লেখ করে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) মুচলেখাবদ্ধ শ্রমিকের (bonded labour) স্বার্থ ;

(খ) অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকের (unorganised labour) স্বার্থ ;

(গ) বন্দিদের স্বার্থ ;

(ঘ) মহিলা, শিশু, তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিকার সম্পর্কে ;

(ঙ) ঔষধপত্র ও খাদ্যে ভেজাল প্রভৃতির বিরুদ্ধে ;

(চ) পরিবেশ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ সম্পর্কে ;

(ছ) সর্বসাধারণের স্বার্থসম্পর্কিত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। (দেশাই ও মুরলিধর, ২০০০ : ১৬৫)।

৩ (খ).৬ জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলার শ্রেণিবিভাগ :

পূর্বোক্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে যে সব জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে হয়েছে দেশাই ও মুরলিধর তাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন—(ক) মানবাধিকার ; (খ) বিচারব্যবস্থা ; (গ) পরিবেশ দূষণ এবং (ঘ) সুশাসন ও দায়বদ্ধতা (দেশাই ও মুরলিধর, তদেব, ১৬৮-১৭৬)। বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(ক) মানবাধিকার ঃ জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলার সূচনা সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য। এই ধরণের অনেক মামলার বিচার করতে গিয়ে আদালত ভারতে সংবিধানের ২১ ধারায় উল্লিখিত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের উদার ব্যাখ্যা দান করে। এই ব্যাখ্যার মূল বক্তব্য হল, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার বলতে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকারকে বোঝায় ; কেবলমাত্র অন্য যে কোন প্রাণীর মতো বেঁচে থাকা বোঝায় না। এর জন্য যে সব অধিকার

অপরিহার্য আদালতের রায়ে সেগুলি স্বীকৃত হয়েছে। যেমন, খাদ্য ও পরিধানের অধিকার, মুচলেকাবদ্ধ শ্রমিকের পুনর্বাসনের অধিকার, অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সরকার দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি পাওয়ার অধিকার, প্রত্যেক শিশুর পূর্ণ বিকাশের অধিকার, দূষণ মুক্ত জল ও বায়ুর অধিকার প্রভৃতি (ডি. ডি. বসু, ১৯৯৬ : ২১ ধারা আলোচনার অংশ দ্রষ্টব্য)।

(খ) **বিচারব্যবস্থা** ঃ শীর্ষ আদালতে বিচারপতি নিয়োগ এবং হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগ ও বদলি সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা বিষয়ে একাধিক জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলা বিংশ শতাব্দীর আশি ও নব্বই-এর দশকে শীর্ষ আদালতে এসেছে। যেমন, এস. পি. গুপ্ত বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (১৯৮২) এবং এস. সি. অ্যাডভোকেটস্ বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (১৯৯৩) (রাজু রামচন্দ্রণ, ২০০০ : ১৭০-১৭১ ; লর্ড কুক অব থর্নডন, ২০০০ : ৯৭-১০৬)।

(গ) **পরিবেশ দূষণ** ঃ কারখানা থেকে নির্গত নানা ধরনের গ্যাস ও বর্জ্য পদার্থ আমাদের চারপাশের পরিবেশ কলুষিত করে। পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে আদলত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে।

(ঘ) **সুশাসন ও দায়বদ্ধতা** ঃ সুশাসন ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের উপর মহলের নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা আদালতে দায়ের করা হয়েছে। সি. বি. আই. (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন), সি. ভি. সি. (সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন) প্রভৃতি স্বশাসিত সংস্থা দুর্নীতি দমনের জন্য স্বাধীনভাবে যাতে কাজ করতে পারে, তার জন্য আদলত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে।

৩ (খ).৭ জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য :

এ পর্যন্ত যে আলোচনা আমরা করলাম তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, জনস্বার্থবিষয়ক মামলা ভারতের বিচারব্যবস্থায় এক অভিনব সংযোজন। এই ধরনের মামলার প্রকৃতি ও চরিত্র প্রচলিত প্রতিপক্ষমূলক মামলা (adversarial litigation) থেকে আলাদা। সুতরাং জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলার প্রকৃতি বুঝতে গেলে এর বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, আমরা প্রচলিত যে সব মামলার সঙ্গে পরিচিত তাতে এক পক্ষ থাকেন যাঁকে বা যাঁদের অভিযোগকারী অথবা ফরিয়াদি অথবা বাদী (plaintiff) বলা হয়। অন্যপক্ষে থাকেন অভিযুক্ত যাঁকে বা যাঁদের বিবাদী (defendant) বলে। উভয় পক্ষের আইনজীবীরা নিজ নিজ পক্ষের সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ বক্তব্য পেশ করেন। এই বক্তব্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে আদালত যে রায় দেয় তাতে এক পক্ষ বিজয়ী এবং অন্য পক্ষ পরাজিত হয়।

অন্যদিকে জনস্বার্থবিষয়ক মামলায় এ ধরনের বাদী-বিবাদী নেই; ফলে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নও নেই। জনস্বার্থ-সম্পর্কিত মামলার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. **উপেন্দ্র বক্সি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায় (১৯৮৬)** আদালত মন্তব্য করে যে, সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষের কাছে মানবাধিকার যাতে অর্থবহ হয়ে ওঠে, তার জন্য সরকার ও তার আধিকারিক, আইনজীবী, বিচারপতি প্রমুখ সকলে

একসঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টা করে (...public interest litigation... involves a collaborative and cooperative effort on the part of the...government and its officers, the lawyers appearing in the case and the Bench for the purpose of making human rights meaningful for the weaker section of the community. দেশাই ও মুরলিধর, তদেব, ১৬৭ থেকে উদ্ধৃত)। এই সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মুচলেকাবদ্ধ শ্রমিককে মুক্ত করা হয়, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, সরকারি প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের গাফিলতির কারণে নিম্নবর্গের মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে, আদালত এর প্রতিকারের জন্য জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হোসেনারা খাতুনের মতো সমাজের অসংখ্য অবহেলিত মানুষ বিনা বিচারে দীর্ঘকাল বন্দি থাকতে বাধ্য হন। এদের অনেককে তুচ্ছ অভিযোগের ভিত্তিতে আটক করা হয়েছিল। অভিযুক্তদের বিচার হলে এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে হয়ত কয়েক মাসের কারাদন্ড হত। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, এই সব হতভাগ্য অভিযুক্তরা দীর্ঘকাল বিনা বিচারে কারাগারে বন্দি থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিষয়টির প্রতি সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শীর্ষ আদালত এর প্রতিকারের জন্য এই হতভাগ্য বন্দিদের দ্রুত বিচারের এবং এদের মধ্যে যাঁরা কারাগারে আটক থাকার সর্বোচ্চ সীমা কাটিয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দানের নির্দেশ দেয় (দেশাই ও মুরলিধর, তদেব, ১৬৮-১৬৯)।

তৃতীয়ত, প্রচলিত প্রতিপক্ষমূলক মামলায় অভিযোগকারীকেই অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ দিতে হয়। অন্যদিকে জনস্বার্থবিষয়ক মামলায় অভিযোগকারীকে প্রমাণের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আদালত মামলার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিশনার নিয়োগ করতে পারে। আদালত বিভিন্ন মামলায় জেলা জজ, আইনজীবী, উচ্চপদস্থ আমলা, সাংবাদিক এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করেছে। পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়ে আদালত কেন্দ্রীয় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (Central Pollution Control Board, সংক্ষেপে C.P.C.B.) মতো বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে।

চতুর্থত, পোস্ট কার্ডে লিখিত একটি আবেদনকে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট যেমন গ্রাহ্য করেছিল [Gideon V. Wainright (1963)], তেমনি ভারতেও আদালত জনস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের লেখা চিঠি, টেলিগ্রাম অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো রিপোর্টকে আবেদন হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। পূর্বোক্ত হোসেনারা খাতুন বনাম বিহার রাজ্য মামলায় (১৯৮০) বিহারে বিনা বিচারে আটক বন্দিদের সম্পর্কে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনকে সুপ্রিম কোর্ট আবেদনরূপে গ্রাহ্য করেছিল।

পঞ্চমত, জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলায় আবেদনকারীরা অনেক সময় নিজেরাই আদালতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য সুসংবদ্ধভাবে পেশ করতে পারেন না। এ সব ক্ষেত্রে আইনজীবীদের সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। কারণ তাঁরা জনস্বার্থসম্পর্কিত বিষয়ের আইন-কানুন বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে পারেন। যেমন সুপ্রিম কোর্টের

প্রবীন আইনজীবীরা মুচলেকাবদ্ধ শ্রমিক, পুলিশি অত্যাচার, সরকারি দায়বদ্ধতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আদালতকে সাহায্য করে থাকেন।

৩ (খ).৮ আলোচনার সংক্ষিপ্তসার :

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল তা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মৌল কাঠামোর ধারণা এবং জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলার বিচারের মাধ্যমে ভারতের বিচারব্যবস্থা ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। প্রশ্ন হল কীভাবে? এর উত্তর হল ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল সরকার গঠন করে। সাময়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শাসক দল ক্ষমতার অপব্যবহার করে যাতে ভারতের সংবিধানের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করতে না পারে, তার জন্য মৌল কাঠামোর ধারণার উদ্ভাবন। অন্যদিকে আবার থানা, জেলখানাসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত কর্তৃপক্ষের অপদার্থতা, শৈথিল্য, গাফিলতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষ ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে তার প্রতিবিধানের জন্য জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলার সূচনা। "Like Keshavananda which songht successfully to limit the tyranny of temporary political majorities from rewriting the text of constitution in pursuit of power, SAL by its unusual expansion of judicial process and power continues to combat the scattered hegemonies of power masquerading its own excess as public interest." উপেন্দ্র বক্সি, ১৯৯৬-১২। অধ্যাপক বক্সি (Public Interest Litigation)-এর পরিবর্তে SAL (Social Action Litigation) কথাটি ব্যবহার করার পক্ষপাতি।

পরিশেষে অধ্যাপক রুডলফ এবং রুডলফ-এর বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। তাঁদের বক্তব্য : In the eighties of the Last Century attention 'shifted... from the macrodrama at the national level between the Supreme Count and Parliament to the myriad microdramas at the local level between the disadvantaged and the petty oppressive agents of the state: police rape, police blindings, social agency cosrruption, jail inhumanity. রুডলফ ও রুডলফ, ১৯৮৭-১২২।

৩ (খ).৯ সমালোচনা :

উভয় ধরনের বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা (অর্থৎ মৌল কাঠামো ও জনস্বার্থবিষয়ক মামলা) নানা দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথমত, দুর্গাদাস বসু, রাজু রামচন্দ্রন প্রমুখ সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ সংবিধানের মৌল কাঠামো ধারণার সমালোচনা করেছেন। রামচন্দ্রনের মতে, মৌল কাঠামোর ধারণা চরিত্রগতভাবে গণতন্ত্রবিরোধী এবং নির্বাচিত নন এমন বিচারপতিরাই বিপুল রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করছেন যা সংবিধানে তাঁদের দেওয়া হয়নি ("...the basic structure doctrine is anti-democratic... and that unelected judges have assumed vast political power not given to them by the constitution", রাজু রামচন্দ্রন, ২০০০-১০৮)।

দ্বিতীয়ত, প্রচলিত প্রতিপক্ষমূলক মামলার মাত্রাতিরিক্ত চাপে আদালতগুলি এমনিতেই নাজেহাল। তার উপর জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার অত্যধিক চাপের ফলে বিচার বিলম্বিত হচ্ছে।

তৃতীয়ত, দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নীতি নির্ধারণ এবং তার রূপায়ণের দায়িত্ব শাসন ও আইন বিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নারীদের উপর যৌননিগ্রহ, বিদেশিদের আমাদের দেশের শিশুদের দত্তক নেওয়া, হাজতে অত্যাচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে অতি সম্প্রতি আমরা একটি প্রবণতা লক্ষ্য করছি যে, বিচারবিভাগ নীতি নির্ধারকের নতুন ভূমিকায় নিজেকে জাহির করছে ("... the more recent trend ....is for the Court to assert its new role as policy-maker..." এ.এইচ. দেশাই ও এস. মুরলিধর, ২০০০-১৭৯)।

চতুর্থত, এই সমালোচনাও করা হয়ে থাকে যে, বিচারবিভাগ তার এক্তিয়ারের সীমা লঙ্ঘন করছে এবং নিজের আদেশ কার্যকরভাবে রূপায়ণের জন্য তদারকি করতে সক্ষম হচ্ছে না। যার ফলে জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলার প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ("... the credibility of the PIL process is now advessely affected by the critisism that the judiciary is overstepping the boundaries of its jurisdiction and that it is unable to supervise the effective implementation of its orders". তদেব, ১৮১)। ক্রমশ এটাও অনুভব করা হচ্ছে যে, কিছু মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ জনস্বার্থের মোড়কে প্রকাশ করে জনস্বার্থবিষয়ক মামলার অপব্যহার করছেন ("It has also been increasingly felt that the PIL is being misused by the people agitating for private grievances in the garb of public interest." তদেব।)

পঞ্চমত, সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ অভিযোগ করেছেন যে, ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে অনেক জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলার বিচারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের আচরণে সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের অধিকার রক্ষার প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে ('lack of sensitivity towards the rights of the poor and disadvantaged sections of society'. প্রশান্ত ভূষণ, ২০০৪-১৭৭০)।

৩ (খ).১০ উপসংহার :

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি যে, রাষ্ট্র জনসাধারণের মৌলিক অধিকার হরণ করছে, সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতি প্রশাসন উদাসীন অথবা রাষ্ট্র খেয়ালখুশি মতো ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তবে একইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা সর্বরোগমহৌষধ (panacea) নয়। তা ছাড়া, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ড. এ. এস. আনন্দের সতর্কবাণী যেন সব সময় মনে রাখা উচিত। তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, ভারতে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা শেষ পর্যন্ত 'বিচারবিভাগীয় হঠকারিতায়' ('judecial adventurism') যেন পর্যবসিত না হয়।

৩ (খ).১১ নমুনা প্রশ্ন :

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা

(১) ভারতে 'বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা' বলতে কী বোঝায়? বিচারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কোন দুটি বিষয় উদ্ভাবন করেছে যার ফলে বিচারবিভাগ বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছে?

(২) উদাহরণসহ ভারতের সংবিধানের মৌল কাঠামো ব্যাখ্যা কর। কোন মামলার রায়ে এই ধারণার উদ্ভব হয়?

(৩) জনস্বার্থবিষয়ক মামলা কাকে বলে?

(৪) জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলায় সাধারণত নিয়মকানুন কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়? নিয়মকানুন শিথিল করার কারণ কী?

(৫) ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সাধারণত যে সব বিষয়কে জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলা হিসাবে গণ্য করতে পারে তা উল্লেখ কর।

(৬) জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

(৭) কীভাবে মৌল কাঠামোর ধারণা ও জনস্বার্থসম্পর্কিত মামলার বিচারের মাধ্যমে ভারতের বিচারব্যবস্থা ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে?

(৮) ভারতে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা সম্পর্কে যে সব সমালোচনা করা হয় তার অন্তত দুটি উল্লেখ কর।

দীর্ঘ প্রশ্নমালা

(১) ভারতে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে কী বোঝায়?

(২) ভারতে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার উপর একটি সমালোচনামূলক টীকা লেখ।

৩ (খ).১২ গ্রন্থসূচি :

1. Basu, D. D. (1996), *Shorter Constitution of India*, New Delhi: PHI, 12 Edn

2. ,, (2008), *Introduction to the Costitution of India*, Nagpur: Lexis Nexis Butterworths Wadhwa, 20th Edn.

3. Baxi, U. (1996) 'Judicial Activism, Legal Education and Research in Globalising India, *Mainstream*, February 24.

4. Bhushan, Prasant (2004), 'Supreme Court and PIL: Changing Perspectives Under Liberalisation', *Economic and Political Weekly*, May 1.

5. Desai, A. H. & Muralidhar. S (2000) 'Public Interest Litigation: Potential and Problems' in B.N. Kirpal et al (eds), *Supreme But Not Infallible: Essays in Honour of the Supreme Court of India*, New Delhi : OUP.

6. Rajamani, L & Sengupta, A (2010), 'The Supreme Court in Jayal, N.G. & Mehta PB (eds), *The Oxford Companion to Politics in India*, New Delhi : OUP.

7. Remachandran, Raju (2000), 'The Supreme Court and the Basic Structure Doctrine' in *Ibid.*

8. Rudolph, L. I. & Rudolph, S.H. (1987), *In pursuit of Lakshmi : The Political Economy of the Indian State*, Chicago: The University of Chicago Press, Reprinted 1998, New Delhi: Orient Longman.

9. „ (2001) 'Redoing the constitutional design: from an interventionist to a regulatory state' in Atul Kohli (ed), *The Success of India's Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press.

10. Sathe, S.P. (2002), Judicial Activism in India: *Transgressing Borders and Enforcing Limits*, New Delhi: OUP.

একক ৪ □ পঞ্চায়েতী রাজ ও তৃণমূল স্তরের রাজনীতি

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ ভারতের পঞ্চায়েতী রাজ : বিবর্তনের ইতিহাস

৪.৪ গ্রাম উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতী রাজ

৪.৫ পঞ্চায়েতী রাজ ও বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা

৪.৬ পঞ্চায়েতী রাজে জনঅংশগ্রহন

৪.৭ তৃণমূল স্তরীয় রাজনীতি ও পঞ্চায়েতী রাজ

৪.৮ সারাংশ

৪.৯ নমুনা প্রশ্ন

৪.১০ গ্রন্থসূচি

৪.১ উদ্দেশ্য :

এই একক পাঠের পর আপনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন—

ক. পঞ্চায়েতী রাজের সঠিক অর্থ উপলব্ধি।

খ. ভারতের পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার বিবর্তন।

গ. বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রাম উন্নয়নে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার তাৎপর্য।

ঘ. জন অংশগ্রহন বৃদ্ধিতে পঞ্চায়েতী রাজের ভূমিকা।

ঙ. পঞ্চায়েতরাজ ও তৃণমূল স্তরের রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক নির্দ্ধারণকারী ইস্যুগুলি বিচার।

৪.২ ভূমিকা :

গণতন্ত্রের প্রাণ হল দেশের নীতি-নির্দ্ধারন প্রক্রিয়ায় জন-অংশগ্রহন। জনগণ কর্তৃক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রন ও অংশগ্রহন নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের অবশ্যই বোঝা উচিত যে এগুলি তখনই অর্থপূর্ণ হতে পারে যখন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতা জেলা ব্লক ও গ্রামস্তরে বন্টিত করা সম্ভব হবে।

কেন্দ্রীকরণ তখনই কার্যকর হবে যখন তৃণমূল স্তরের জনগণ তাদের সমস্যা সম্পর্কে নিজেরাই আলোচনা করবেন, সমাধানের পথ বাতলে দেবেন এবং তা কার্যকর করার জন্য তদারকি করার মতো সক্ষমতা অর্জন করবেন। আর এর জন্য প্রয়োজন অংশগ্রহণ মূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আনুসারি সঠিক ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি। স্বাধীন ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার মতো অন্যকোন সমাজ-রাজনৈতিক কর্মসূচী জনমনে এত প্রভাব ও আগ্রহ তৈরী করতে পারে নি।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মতাদর্শগত কাঠামো গ্রাম পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। মহাত্মা গান্ধীর 'গ্রাম স্বরাজ' গঠনের ধারণা জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমর্থন লাভ করেছিল। বিশেষ করে, স্বাধীন গ্রামীণ 'সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র' রূপে গ্রামগুলির বিকাশ ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে পুষ্ট করবে বলে গান্ধীজী মত প্রকাশ করেছিলেন। ভারতের পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। তাই আমাদের উচিত তা সংক্ষিপ্তাকারে পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা করা।

৪.৩ ভারতের পঞ্চায়েতী রাজ : বিবর্তনের ইতিহাস

প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতে স্বশাসিত গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। যদিও এর বর্তমান রূপ তথা স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার ব্রিটিশ সময়কার শাসন ব্যবস্থার অভিনব প্রভাবের ফল। একথা ঠিক যে স্ব-শাসন চালু করা ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং ব্রিটিশরা ক্ষমতা স্থানীয় স্তরে হস্তান্তর করেছিলেন যাতে প্রশাসনিক বিষয়ে তারা বেশি মনোযোগ দিতে পারেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকার গুলিকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া এই সরকারগুলি যাতে স্থানীয় স্বায়ওশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অধিক গণতন্ত্রীকরনের জন্য আইন প্রণয়ন করে সেদিকে নজর রাখা ও তাদের দায়বদ্ধ করা হয়। যদিও ১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতা লাভের সময়কাল থেকে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শ অনেক বেশী সংগঠিত রূপে সামনে আসে।

যাইহোক না কেন, উপরোক্ত উত্তরাধিকার বহণ করলেও স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক শ্রেণী ও আমলারা পঞ্চায়েত সম্পর্কে অনীহার ভাব পোষণ করতেন। ফলস্বরূপ ভারতীয় সংবিধানের প্রাথমিক খসড়ায় পঞ্চায়েত সম্পর্কে কোন ধারা যুক্ত করা হয়নি। গ্রামীণ জনগণের সমষ্টিগত অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫২ সালে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়। যদিও খুব দ্রুতই কার্যকরি অংশগ্রহনের অভাবে তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৫৩ সালে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপূরক হিসাবে জাতীয় সম্প্রসারণ পরিষেবা চালু করা হয়। কিন্তু অতিরাজনীতিকীকরণ ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রনের ফলে সরকারিভাবে গ্রাম উন্নয়নের জন্য শুরু হওয়া এই প্রকল্পগুলি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১৯৫৬ সালে বলবন্ত রায় মেহেতার নেতৃত্বে গঠিত সমীক্ষক দল সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিষেবার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করে। ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ বলবন্ত রায়

মেহেতার নেতৃত্বে গঠিত সমীক্ষক দলের সুপারিশ পর্যালোচনা করে রাজ্যগুলির কাছে সঠিক কাঠামো তৈরীর জন্য পাঠায়। এই সময় থেকেই পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার আলোকে গ্রামসভা থেকে লোকসভা পর্যন্ত জনগণের সংযোগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাজস্থান হল প্রথম রাজ্য যারা ১৯৫৯ সালে প্রথম পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৯৬৫ সালের মধ্যে প্রায় সব রাজ্যই এই ব্যবস্থা চালু করে। ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতী রাজ কাঠামো তথা জেলাস্তরে জেলাপরিষদ, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম স্তরে গ্রামপঞ্চায়েত ভারতের সব রাজ্যে একই ভাবে চালু হয় নি। ভারতের মত বিরাট দেশের গ্রাম সমাজের বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে কোথাও একস্তর, কোথাও দ্বিস্তর আবার রাজস্থান বা অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে ত্রি-স্তরীয় ব্যবস্থা চালু করেছে। ১৯৫৯ সালে চালু হওয়া প্রথম প্রজন্মের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা খুব দ্রুতই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক নতুন দিক নিয়ে এসেছিল।

১৯৬৫ সালের পর এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্থবিরতা এসে যায়। বিশেষ করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এবং আমলারা জনঅংশগ্রহণে ভীত হয়ে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার প্রতি অনীহা পোষণ করতে থাকেন।

অশোক মেহতা কমিটি

১৯৭৭ সালে অশোক মেহতা কমিটির নিযুক্তি পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার ধারণা ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই কমিটি ১৯৭৮ সালে তার প্রতিবেদন পেশ করে পঞ্চায়েতী রাজ সম্পর্কিত চিন্তার জগতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন আনতে চায়। যার অন্যতম হল দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থাকে সংযুক্তিকরণ। দ্বিতীয় প্রজন্মের পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে নতুন জীবন দিয়ে শুরু করেন। মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গসহ কিছু রাজ্য বিদ্যমান পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে নতুন আইন প্রনয়ণ করে। এই পরিবর্তনের সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল যে দ্বিতীয় পর্বের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে উন্নয়ন মূলক সংস্থা থেকে স্থানীয় স্তরের কার্যকরী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর। স্থানীয় স্তরে অধিকতর ক্ষমতা দানের ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মুখীনতা বৃদ্ধিপায় ও জনগণ তাদের নিজেদের উদ্যমে পঞ্চায়েতের কার্য সম্পাদনে সচেষ্ট হয়। ১৯৮০'র দশকের মাঝামাঝি সময়ে জেলা সরকারের ধারণা সামনে আসে, পশ্চিমবঙ্গ ও কর্নাটকে জেলা পরিষদের সাফল্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জেলাগুলিকে অধিকতর গুরুত্বদানের মতামতকে পুষ্ট করে।

১৯৮৮ শেষে পি.কে. থুঙ্গনের নেতৃত্বে সংসদীয় উপ-কমিটি পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সাংবিধানিক দিক থেকে স্বীকৃতি দানের কথা বলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৬৪ তম সংবিধান সংশোধিনী বিলের খসড়া তৈরী হয়। বিভিন্ন কামিটির প্রতিবেদন গুলোকে অনুসরণ করে কেন্দ্র সরকার পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবে। সমস্ত ভারতে একই রকম পঞ্চয়েতী রাজ ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধণী আইন পাশ হয়, এইভাবে ভারতের পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল 'স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন' থেকে 'স্বায়ত্ব শাসনের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর।

৪.৪ গ্রাম উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতী রাজ :

পঞ্চায়েতী রাজ আইনের নানাবিধ দিক থাকাব কারণে তা বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে চর্চা করা দরকার। এটি শুধু স্বায়ত্বশাসন নয় বরং এটি প্রশাসনিক ন্যায়, গ্রামীণ নীতি, অর্থনৈতিক প্রশাসনসহ উন্নয়নের সকল দিককে গুরুত্বদেয়। পঞ্চায়েত গুলি যাতে সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে তার জন্য এই আইনে প্রয়োজনীয় অর্থ ও মানবসম্পদ যোগানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭৩ তম সংশোধনী অনুসারে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থানুযায়ী রাজ্যগুলির অবশ্যপালনীয় দিক গুলি হল—

ক. প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন।

খ. একটি পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত যোগ্য ভোটারদের নিয়ে গ্রামসভা গঠনের কথা বলা হয়েছে যার কাছে পঞ্চায়েত উত্তরদায়ী থাকবে।

গ. তফশিলী জাতি, উপজাতি, নারী ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষন।

ঘ. রাজ্যে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন।

ঙ. প্রত্যেকেটি রাজ্যে একটি করে অর্থ কমিশন তৈরী। এই কমিশন পঞ্চায়েতগুলিকে অর্থনৈতিক সম্পদ বন্টনে সুপারিশ ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারগুলি বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহন করেছে। ভারতীয় সংবিধানের একাদশতম তপশীলে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েতের কাজের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে যদিও তা অনুসরণ করা রাজ্যগুলির স্বেচ্ছাধীন, ফলে গ্রাম উন্নয়নের সামগ্রিক দিকগুলি তুলে ধরার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলির কিছু সমস্যা এখনও রয়ে গেছে।

৪.৫ পঞ্চায়েতী রাজ ও বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা :

ক্রমোচ্চস্তর বিন্যস্ত ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীকরণ উন্নয়ন ওপরিকল্পনাকে অনেকাংশে দিশাহীন করে তোলে। জাতীয় পবিকল্পনার সঙ্গে রাজ্য, জেলা ও আঞ্চলিক পরিকল্পনার সংহতি থাকা দরকার। বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীক সমস্যা, চাহিদা, সম্পদ ও সামর্থ্যকে বিচার করে পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা সংহতিপূর্ণ না হলে তা শূন্যতার দিকে ধাবিত হয়। পঞ্চায়েতীরাজ বিকেন্দ্রীকরনের ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এটা সত্যি কারণ স্থানীয় সরকার জনগনের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। জনগণ চায় স্থানীয় স্তরের সরকার সঠিক ভাবে কর্মসূচীগুলি কার্যকর করুক। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীভূত মডেল কার্যকর করার জন্য পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থাকে ত্রিস্তরীয় করা হয়েছে। প্রথম স্তরকে গ্রাম পঞ্চায়েত বলা হয়, ব্লক পর্যায়ে দ্বিতীয় স্তরের কাঠামোকে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পর্যায়ে তৃতীয় স্তরকে জেলা পরিষদ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৯৯৩ সাল থেকে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার তাৎপর্য বেড়ে চলেছে। ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী স্থানীয় স্তরের স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় পরিকল্পনা তৈরি ও তা কার্যকর করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। জেলা পরিকল্পনা কমিটি পঞ্চায়েত ও পৌর সভা গুলির পরিকল্পনাকে একত্রিত করে

তা কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়। বেশির ভাগ রাজ্য এই ভাবনাকে সংযুক্ত করে আইন পাশ করে। যদিও ক্ষমতার সঠিক প্রর্তপন রাজ্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

১৯৯৩'র পর বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের যে ধারণা ও কৌশল তাৎপর্য পেয়েছে। তাকে আরও কার্যকর করার জন্য রাজ্যগুলির বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এক প্রস্তাবিত রাজ্য পরিকল্পনার বৃহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে স্থানীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এতে বহুস্তরীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সঠিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে। দুই প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সঠিক ও সুস্পষ্ট দিশা দেওয়া প্রত্যেকটা স্তরের জন্য প্রয়োজন। তিন মতপার্থক্য দূর করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লক এবং শহরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুযায়ী অর্থ হস্তান্তর করতে হবে। তাছাড়া, পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যকরকরণ, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দায়বদ্ধতা, আর্থিক নিয়ন্ত্রন ও অন্যান্য সংযুক্ত বিষয়গুলি নজরে রাখা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা সাফল্যের সঙ্গে এই বিষয় সংগঠিত করতে পারলেও অন্যান্য রাজ্যগুলি এখনও সঠিক ভাবে কার্যকর করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

৪.৬ পঞ্চায়েতী রাজে জনঅংশগ্রহন :

১৯৭০'র দশকের সময়কাল থেকে উন্নয়নের বৃদ্ধি-কেন্দ্রিক মডেলের বিকল্প হিসেবে অংশগ্রহনমূলক উন্নয়ন সামনে আসে। বৃদ্ধি-কেন্দ্রিক মডেল ভারতসহ উন্নয়ন শীল বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভের পর জাতিগঠনের স্বার্থে দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে নগরায়ন ও শিল্পায়নকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু শীঘ্রই এটা অনুভূত হয় যে দ্রুত বৃদ্ধির ফলে সামাজিক ও পরিবেশকে এর জন্য মহৎ মূল্য চুকাতে হচ্ছে। দারিদ্রতা বৃদ্ধি এবং জনগনের জীবন যাত্রার মান হ্রাস, ছাড়াও সামাজিক ব্যবধান বৃদ্ধির মতো বাস্তবতা উচ্চস্তরথেকে নিম্নে বৃদ্ধির মডেলের অসারতা প্রমাণ করে, দীর্ঘমেয়াদীভাবে জনগণকেন্দ্রীক তথা অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন উপরোক্ত মডেলের বিপ্রতীপে মানবিক, সংযুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়। বিকল্প এই মডেল উন্নয়নের ক্ষেত্রে তৃণমূল স্তরের উদ্যোগকে তুলে ধরে যেখানে সম্পদের সমান বণ্টন পরিকল্পনাগ্রহন ও কার্যকরকরনে জন অংশগ্রহন থাকে। গ্রামসভা হল জন অংশগ্রহন ও গনতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরনে মূল চালিকা শক্তি। এটা হল তৃণমূলস্তরের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার ফলে গ্রামসভা ভারতের প্রত্যেক রাজ্যেই আছে। প্রত্যেক রাজ্যের পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী গ্রাম সভাগুলি বছরে কম পক্ষে দু'বার বসবে। গ্রামসভা থেকে লোকসভার সঙ্গে জনগণের সংযোগ সাধনই হল 'নিম্ন থেকে উচ্চ' দৃষ্টিভঙ্গীর তথা অংশগ্রহনমূলক উন্নয়নের মূল কথা।

যদিও বাস্তবে দেখা যায় শক্তিশালী এবং সুস্থিতিশীল ব্যবস্থার প্রতি দূর্ভাগ্যবশত বেশির ভাগ অংশের অনীহা। কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রাম সুপারিশ করে যা পঞ্চায়েত বা জনগণ কর্তৃক খুব গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর করার প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারা ঋণ পাবেন তাদের চিহ্নিত করার মধ্যেই গ্রামসভাগুলির কাজ সীমিত থাকে। আবার পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য গ্রাম সভার পাশাপাশি দ্বিস্তরীয় কাঠামোর ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকর করার লক্ষ্যে গ্রাম

সংসদ গঠন করেছে। রাজস্থান রাজ্য জাতি, উপজাতি, মহিলা ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের এক-দশমাংশ জনগণের কোরাম অবশ্যপালনীয় করা হয়েছে। কেরালায়ও গ্রামপঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি হল গ্রাম সভা।

গ্রামসভার মর্যাদা সম্পর্কে ২০০১ সালে পর্যালোচনা করে একে আরও শক্তিশালী করনের কথা বলা হয়েছে। গ্রাম সভার মতো কোনও সমানুপাতিক সংস্থাগঠনকে অনুৎসাহিত করার পাশাপাশি গ্রাম উন্নয়নের সামগ্রিক তদারকির জন্য গ্রামসভাকে আরও ক্ষমতাশালী করা হয়েছে।

গ্রামসভায় জনগণের বৃহত্তর অংশের অংশগ্রহন পঞ্চায়েতকে কাজ করতে বাধ্য করবে এবং এদের এই অবস্থা উপদেশের বাইরে কর্মে সক্ষম করবে। তাছাড়া জন অংশগ্রহন তৃণমূলস্তরের গ্রামীণ মানুষের উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪.৭ তৃণমূলস্তরীয় রাজনীতি ও পঞ্চায়েতী রাজ :

পঞ্চায়েতী রাজ হল নিম্নস্তরে গণতন্ত্রের প্রসার। এটি সঠিক ভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে তখনই যখন তৃণমূলস্তরের জনগণের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন হবে। জনগণ তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে অংশগ্রহন করলেই গণতন্ত্র প্রসারিত হবে। আসলে উন্নয়নের প্রকল্প জনগণের জন্য জনগণের দ্বারাই সংগঠিত করা সম্ভব।

পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায় তৃণমূলস্তরের অংশগ্রহন কখনই সম্ভব হবে না যদি স্থানীয় সংস্থাগুলি সরকারি কিংবা এর বিভিন্ন দপ্তর দ্বারা তৈরী কর্মসূচী কার্যকর করার চেষ্টা করে, এমন কি এখনও আমরা দেখি পঞ্চায়েত ও গ্রাম সভা সরকারের সঙ্গেই কাজ করে, ফলে স্থানীয় সংস্থাগুলি স্বাতন্ত্রতা হারায়।

স্থানীয় এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাই বর্তমানে বেসরকারী সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দারিদ্র দূরীকরণ, স্বাক্ষরতা, স্বাস্থ্য এবং শৌচালয়ে তৈরীর মতো সরকারী কর্মসূচীগুলি বেসরকারী সংস্থাগুলি কার্যকর করে। গ্রামীণ উন্নয়নের কর্মসূচী ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট পরিকল্পিত কৌশলের মধ্য দিয়ে সামাজিক সচলায়ন ঘটাতে হবে যাতে করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে নিয়োজিত গোষ্ঠী গুলি দ্বারা সঠিক কার্য সম্পাদন করা যায়। বেসরকারী সংস্থাগুলি সামাজিক সচলায়নের ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ—বলা যায়।

উদারীকরণের যুগে ক্রমান্বয়ে সরকারের ভূমিকা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বে-সরকারী সংস্থাগুলি তৃণমূলস্তরের কাজের আরও সুযোগ পাচ্ছে। এরা সরকারি স্তরেও সমর্থন পাচ্ছে কারণ সরকার দূরবর্তী বিভিন্ন গোষ্ঠী কিংবা জনগণের কাছে সেভাবে পৌছাতে পারছে না। বে-সরকারী সংস্থাগুলি মূলত সম্প্রদায় কেন্দ্রিক এবং স্থানীয় লোকদের নিয়ে সংগঠিত ফলে তারা দ্রুত স্থানীয় স্তরের সমস্যাগুলি বুঝতে পারে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগ হল বন উন্নয়ন কমিটি, জলবিভাজিকা উন্নয়ন কমিটি, বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও স্বাক্ষরতা কর্মসূচী, ক্ষুদ্র পরিকল্পনা ইত্যাদি।

ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে বেসরকারী সংস্থা এবং পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নানা সময়

সংঘাত দেখা গেছে। এই দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে কারণ উভয় সংস্থাই গ্রাম উন্নয়নে নিয়োজিত তাই পরস্পর-পরস্পরের পরিপূরক ও সহযোগি। তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা গ্রাম-উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে চালিকা শক্তি হবে। সংখ্যাগত দিক থেকে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা হল ভারতের সর্ববৃহৎ প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা। তাছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে এই প্রতিনিধিদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি প্রান্তিক স্তরের তথা নারী, তফশিলী জাতি উপজাতি ও অন্যান্য অগ্রসর সম্প্রদায়ের জনগণ। পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা সামাজিক ন্যায় তৈরীতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করেছে। পাশাপাশি একই সময়ে উন্নয়নমূলক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক কল্যাণ লাভেও সচেষ্ট হয়েছে।

পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা হল গণতন্ত্রের অত্যন্ত প্রহরী। গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশীদারিত্বকে পঞ্চায়েতী রাজ গুরুত্ব দেয়। এই দিকে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার অন্যতম কাজ হল—

১. রাস্তা তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষন।

২. প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, নারী ও শিশু কল্যান।

৩. কৃষকদের কৃষিকাজ, সব্জি চাষ পশুপালনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং কৃষি ও অ-কৃষি ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের জন্য সঠিক প্রশিক্ষনদান।

৪. কৃষি উৎপাদিত পন্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

৫. ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প স্থাপন।

৬. রাস্তায় আলোকায়ন এবং নির্মলীকরণের ব্যবস্থা।

৭. জলাধার এবং জলাশয় ও অন্যান্য সরকারী ক্ষেত্র রক্ষনাবেক্ষন।

৮. গ্রামীণ জনগণের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় স্থাপন।

উপরোক্ত কাজগুলি ছাড়াও পঞ্চায়েত আরও কিছু স্বেচ্ছাধীন কার্য পালন করবে বলে আশা করা হয়। পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান সম্পাদনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও রয়েছে। যথা- এক পঞ্চায়েতের হাতে যথেষ্ট অর্থনৈতিক সম্পদ অনুপস্থিত। দুই সরকারী এজেন্সী অভাব। তিন বেশির ভাগ প্রতিনিধির শিক্ষার হার কম। চার প্রয়োজনীয় সামাজিক বিচারবিভাগীয় এবং প্রশাসনিক কাজ কাঁধে তুলে নেওয়ার মতো যথেষ্ট প্রশিক্ষণের অভাব। পাঁচ অনৈতিক ভাবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পঞ্চায়েতের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। রাজনীতি গ্রামে শক্তিশালী, ক্ষমতাবান গোষ্ঠী তৈরি করে। হাতে হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর ও অংশগ্রহনই সাধারণ মানুষ ও নির্বাচীত প্রতিনিধির মধ্যে ব্যবধান কমাতে পারে। তৃণমূলস্তরে সব থেকে বেশি কম্পনশীল গণতান্ত্রিক ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠানরূপে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠা করতে দালালি, নিজ স্বার্থ এবং পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার অবসান ঘটাতে হবে।

৪.৮ সারাংশ :

উপরে আমরা ভারতের পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার বিবর্তন আলোচনা করেছি। ভারত গণতন্ত্রের

প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং বিকেন্দ্রীকরণ ও উন্নয়নের হাত ধরে স্থানীয় স্তরে প্রশাসনের হাতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত করা হয়েছে। তৃণমূলস্তরে জন অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতী রাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বেসরকারী সংস্থাগুলিও এক্ষেত্রে সহায়কভূমিকা পালন করে। এটা বলা বাতুলতা যে, এই কার্যসম্পাদন করতে গিয়ে কিছু সমস্যা আছে তা সত্ত্বেও গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা জনমনে গণতন্ত্র ও প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে আশার সঞ্চার করেছে। বর্তমানে সামাজিক ন্যায়, অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন এবং সু-শাসনের মতো বিষয়গুলি ভারতীয় গনতন্ত্রের অন্যতম ভিত-পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান দ্বারা উপলব্ধি করা গেছে।

৪.৯ নমুনা প্রশ্ন :

১. ভারতে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে লেখ। ১৮

২. ভারতে তৃণমূলস্তরের গণতন্ত্র বৃদ্ধিতে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ১৮

৩. গ্রাম উন্নয়নে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার ভূমিকা বর্ণনা কর। ১২

৪. পঞ্চায়েতী রাজে জন অংশগ্রহনের তাৎপর্য লেখ। ১২

৫. বলবন্ত রায় মেহতা কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে একটি টীকা লেখ। ৭

৬. ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মূলবৈশিষ্ট্যগুলি কী? ৭

৪.১০ গ্রন্থসূচি :

1. Geroge Mathew, *Panchayati Raj: from legislation to Movement*, Concept Publishing Company, New Delhi, 1995.
2. R P Joshi, GS Narwani, *Panchayati Raj in India*, Rawat Publications, Jaipur 2002.
3. G Palanthurai (ed), *Dynamics of New Panchayati Raj in India*, Vol-1, Concept Publishing House, New Delhi, 2002.
4. J L Singh, G P Pandey (ed), *50 Years of Panchayati Raj and Rural Development*, Manak Publication Pvt. Ltd, New Delhi, 1998.
5. Institute of Social Sciences, *Status of Panchayati Raj in the States of India* 1994, Concept Publishing Company.

একক ১ ❑ সামাজিক বিভাজন - জাত ও শ্রেণি

গঠন :

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ ভূমিকা
১.৩ জাত-বর্ণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
১.৪ শ্রেণি সমাজের বৈশিষ্ট্য
১.৫ জাত ও শ্রেণি
১.৬ সাংবিধানিক ব্যবস্থা, রাজনীতি ও জাত-বর্ণ
১.৭ সারসংক্ষেপ
১.৮ নমুনা প্রশ্ন
১.৯ গ্রন্থসূচি

১.১ উদ্দেশ্য :

এই এককটি পড়ে আমরা জানতে পারবো —

- ভারতীয় সমাজের অনন্য বৈশিষ্ট
- জাত-বর্ণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট
- জাত ও শ্রেণির পার্থক্য ও সম্পর্ক
- জাত-বর্ণ ব্যবস্থার বিষয়ে রাষ্ট্রের অবস্থান
- রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে জাতি বর্ণ ব্যবস্থা

১.২ ভূমিকা :

ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য হল জাতপাত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা সামাজিক স্তর বিন্যাসের অনন্য উদাহরণ। মূলত হিন্দু ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থা ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করে। ভারতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ, তথা খ্রীষ্টান, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

জাত-বর্ণ ব্যবস্থা একটি বিচিত্র স্তর বিন্যাস বা stratification ব্যবস্থা যা মূলত ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য। সমাজজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। অলীক পার্থক্যের উপর

নির্ভর করে জাতপাতের গোষ্ঠীগুলির উচ্চ নীচ সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করে সাম্য ও গণতান্ত্রিক চেতনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিভক্ত জাত অনুগত্য জাতি গঠনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পরিচিতি বলতে বাস্তবে জাতীয় পরিচিতির উপরে জাতি গোষ্ঠীর পরিচিতিকে প্রায়শই প্রাধান্য পেতে দেখা যায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় জাতপাতের নামে শুধু ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর নয়, দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন নানা ভাবে হোঁচট খায়।

জাত একই সঙ্গে একটি তত্ত্বগত ধারণা, একটি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক চেতনার প্রকাশ, এবং একটি সামাজিক বিন্যাস ব্যবস্থার গঠনগত পরিচিতি। বলাবাহুল্য, এই দুটিই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও পরস্পরের পরিপূরক।

সময়ের সাথে সাথে জাত-বর্ণ ব্যবস্থা নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের অ-যৌক্তিক অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলেছে। কখনও তার নিয়ম কানুনের কঠোরতা বেড়েছে; কখনও বা তা কিছুটা শিথিল হয়েছে; আবার কখনও কোনো কোনো নিয়মকে শিথিল হতে দেখা গেলেও অন্য কিছু নিয়ম কঠোরতর হয়েছে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে, এই প্রথা অনুসারে ভারতীয় সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে চারটি বর্ণ নয়। দেখা যায় কয়েক শত জাতের অস্তিত্ব। চতুর্বর্ণ কোন দিন আদৌ ছিল কিনা সে নিয়ে বিদগ্ধ জনের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেন, অতীতে ছিল এবং পরবর্তীকালে বর্ণগুলির মধ্যে বহু বিধ বিভাজন হয়ে ক্রমে কয়েক শত জাতের উদ্ভব ঘটে। আবার কারো বা মত হল, বর্ণ বিভাজন কেবলমাত্র তত্ত্বগত ক্ষেত্রে ছিল। বাস্তব চিত্রটা চিরকালই জাত বিভাজনের চিত্র। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে না গিয়েও দেখা যায়, বাস্তব ক্ষেত্রে জাতের অস্তিত্বই আমাদের চোখে পড়ে, চতুর্বর্ণের নয়। তবে, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তত্ত্বগতভাবে অনেক সাদৃশ্য থাকায় জাত ও বর্ণকে অনেকটা সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তবে জাতগুলির অস্তিতত্ব অনেকটা আঞ্চলিকভাবে নির্দিষ্ট এবং তার কাঠামোগত গঠন বস্তুগত পরিবর্তনের ধারা অনুযায়ী অনেক বেশি নমনীয়। একটি অঞ্চলে যে নামে একটি জাতকে পাওয়া যায়, অন্য অঞ্চলে নাও পাওয়া যেতে পারে; তবে সেখানে একই ধরনের পেশায়, একই সামাজিক অবস্থানের সমতূল্য জাতকে পাওয়া যায়।

১.৩ জাত-বর্ণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য :

বিভিন্ন জাত গোষ্ঠীর ক্রমোচ্চ বিন্যাসে জাতপাত ব্যবস্থার গঠন। এই ব্যবস্থা কিছুটা হলেও পিরামিডের আকার নেয়। উচ্চতম জাত ব্রাহ্মণরা এই পিরামিডের শীর্ষে। একেবারে নিচুতে আছে একাধিক তথাকথিত অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য জাত। এই দুটি জাত গোষ্ঠীর মাঝে ধাপে ধাপে সাজানো আরো বহু জাত গোষ্ঠী আছে। জাতের অবস্থান যে হেতু জাত ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে, 'জাত' সম্পর্কিত কোন ধারণা লাভ করতে হলে তা 'জাতপাত ব্যবস্থার' ধারণার প্রেক্ষিতেই করতে হয়। জাত গোষ্ঠীগুলির মধ্যের পার্থক্যের ধারণার উপর জাতপাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণার বিজ্ঞান সম্মত কোন ভিত্তি নেই এবং গণতান্ত্রিক চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তবু কার্যত এই ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সমার্থক হয়ে উঠেছে।

জাতপাত ব্যবস্থার উৎসের কারণ নিয়ে নানা তত্ত্ব ও নানা মতভেদ আছে। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় ঋকবেদের সময়ের শেষের দিক থেকেই সম্ভবত এ ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটে। কারো মতে, বর্ণগত

পার্থক্য কারো মতে শ্রম বিভাজন, আবার কারো মতে শ্রেণিগত কারণ জাত বর্ণ ব্যবস্থার উৎপত্তির কারণ। কেউ কেউ আবার মনে করেন, এক নয় একাধিক কারণে এই ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটেছে।

জাত বর্ণ ব্যবস্থার কতকগুলি মূল বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, মনে রাখা প্রয়োজন এটি একটি সামাজিক বিভাজনের প্রক্রিয়া। হিন্দু ধর্মের সমস্ত মানুষকে এই ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা হয়। কোন ব্যক্তি কোন জাতিভুক্ত হবে তা তার নিজের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে তার জন্মগত পরিচয়ের উপর। অর্থাৎ তার পিতা যে জাত পরিচয় বহন করে সেও সেই জাত পরিচয় বহন করবে এবং তার সন্তানও সেই মত তার পিতার জাত পরিচয়ের অধিকারী হবে। জাত পরিচয় স্ব-ইচ্ছায় অর্জন করা যায় না, আবার তা স্ব-ইচ্ছায় পরিবর্তন করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, জাত গোষ্ঠীগুলি endogamous, যার অর্থ হল জাতব্যবস্থায় স-জাতি বিবাহ প্রচলিত। নিয়ম অনুসারে এক জাতের পাত্রের বিবাহ সেই জাতভুক্ত কোন পাত্রীর সঙ্গে হতে হবে। আজকাল যদিও তার ব্যতিক্রম কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহ হয়, তা এখনও নেহাৎই ব্যতিক্রম, সংখ্যার দিক থেকে কম এবং নিয়ম সিদ্ধ নয়।

তৃতীয়ত, জাতপাতের অবস্থান সমস্ত ধরনের সামাজিক আদান-প্রদানের নির্ধারক। শুধু যে কাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থাপিত হতে পারে তাই-ই নয়। কে কার বাড়ি যেতে পারে, কে কাকে নিমন্ত্রণ করতে পারে, কে কার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে, কে কার হাত থেকে খাবার নিতে পারে এমন আরো অনেক কিছুই জাতপাতগত অবস্থান নির্ধারণ করে দেয়।

চতুর্থত, মনে রাখা দরকার, 'শুদ্ধিতা', 'অশুদ্ধিতা'র ধারণা জাত ব্যবস্থার আদর্শগত ভিত্তি। এই ভিত্তি-র উপরেই সমাজের উঁচু এবং নিচু জাতের বিন্যাস হয়। এই ধারণা অনুসারে ব্রাহ্মণদের সব থেকে শুদ্ধ বা পবিত্র মনে করা হয় আর তার নীচে যে জাতগুলি আছে তারা ক্রমান্বয়ে কম শুদ্ধ বা বলা যেতে পারে অ-পবিত্র। সমাজের একেবারে তলায় অস্পৃশ্য জাতরা যারা অতি-শূদ্র বা দলিত হিসাবেও পরিচিত। আইনি পরিভাষাতে শেষোক্তদের আমরা আজ তফশিলী জাত হিসাবেও চিনি। আইনত, নিষিদ্ধ হলেও জাতপাতগত ভিত্তিতে অস্পৃশ্যতার প্রচলন এখনও দেশের বিভিন্ন স্থানে নজরে আসে। তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত মানুষদের নানা ধরনের অমানবিক আচরণের শিকার হতে হয়। তাদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার নেমে আসে। প্রতিবাদ করতে গেলে প্রায়শই অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে।

পঞ্চমত, খেয়াল রাখা আবশ্যিক যে জাত ব্যবস্থা কর্ম বিভাজনের সনাতন নিয়ামক। কে কি ধরনের কাজ করবে তা জাত ব্যবস্থায় জাতির অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হত। শাস্ত্র দ্বারাই তার রূপরেখা প্রতিষ্ঠিত। যথা, ব্রাহ্মণ জ্ঞান চর্চা করবে, পূজা-পাঠ করবে, ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ, বৈশ্যরা বাণিজ্য ও শূদ্ররা কায়িক পরিশ্রমের কাজে ব্রতী হবে। এমনই নানা ধরণের নিয়ম নীতির মধ্যে দিয়ে কর্ম বিভাজনের চিত্রটা ফুটে ওঠে। সময়ের সাথে সাথে জাত ভিত্তিক কাজ কর্মের ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও, ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে, মোটের ওপর বলা যায় যে, আজও কম আয়ের কঠোর শ্রমের কাজগুলিতে নিচু জাতির মানুষদের প্রাধান্য স্পষ্টতই দেখা যায়। এই কাজগুলিতে শুধু যে কঠিন পরিশ্রম করতে হয় এবং আয় কম ও অনিয়মিত তাই-ই নয়, সামাজিক সম্মানের দিক থেকে এগুলিকে কম সম্মানজনক বলে চিহ্নিত করা হয়।

ষষ্ঠত, সর্বোপরি মনে রাখা আবশ্যক যে, এই সামাজিক স্তর বিন্যাস যা ভারতবর্ষে অনন্য বৈশিষ্ট্য, ঈশ্বরের নামে প্রতিষ্ঠিত। জাত-বর্ণ ব্যবস্থার সমর্থকদের দাবী (যা হিন্দু ধর্মগ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত) যে ঈশ্বর তার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে বিভিন্ন জাতকে সৃষ্টি করেন এবং বিভিন্ন স্তরের মর্যাদা দিয়ে, বিভিন্ন কর্ম

সম্পাদনের লক্ষ্যে। ফলে স্পষ্টতই বোঝা যায় জাত বর্ণ ব্যবস্থা কায়েম থাকার কোন বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক যুক্তি না থাকলেও ঈশ্বরের নাম নিয়ে ধর্ম বিশ্বাসের অজুহাতে তাকে মানুষের মনে গ্রহণযোগ্য করে রাখা হয়। এর ফলে, অবদমিত জাতগুলির মধ্যে বিদ্রোহ হয় কম, প্রতিবাদ থাকে স্তিমিত।

পরিশেষে বলা যেতে পারে জাতগুলির মধ্যে অ-সম হলেও এক ধরনের আদান-প্রদানের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারই প্রতিফলন দেখা যায় জজমানি ব্যবস্থায়। এ ব্যবস্থা আজ কিছুটা দুর্বল হলেও তার পুরোপুরি অবলুপ্তি ঘটেনি।

১.৪ শ্রেণি সমাজের বৈশিষ্ট্য :

শ্রেণি বললে সাধারণভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোন জনসমষ্ঠির কথা মনে হয়, যে বৈশিষ্ট্যগুলির ফলে অন্য জনসাধারণের থেকে তাদের পৃথক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। শ্রেণির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের নানা ভিত্তি থাকতে পারে। তবে আমরা সচরাচর অর্থনৈতিক ভিত্তি ধরে শ্রেণিকে চিহ্নিত করি। যেমন, পুঁজিবাদী সমাজে আমরা বুর্জোয়া শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির কথা বলি। আমাদের এই আলোচনাতে আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকেই শ্রেণিকে বিবেচনা করবো।

বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময় একাধিক শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এই শ্রেণিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের নানা মাত্রা থাকে। কখনও কোন কোন শ্রেণির মধ্যে সহযোগিতা থাকে, কখনও দ্বন্দ্ব। কখনও একাধিক শ্রেণি জোটবদ্ধ অবস্থায় অন্য শ্রেণি বা একাধিক শ্রেণির জোটের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। সেই সংঘাতের মধ্যে দিয়েই সামাজিক বিবর্তন ঘটে এবং পুরাতন শ্রেণিদের ভারসাম্যের বদলে নতুন ভারসাম্য উঠে আসে। এই শ্রেণি চিত্রটা প্রধানত উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীক। সে ব্যবস্থার পরিবর্তন শ্রেণি চিত্রেরও পরিবর্তন আনে। নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন শ্রেণিদের উদ্ভব বা প্রাধান্য দেখা যায়। শ্রেণি সংঘাত নতুন রূপ নেয়।

১.৫ জাত ও শ্রেণি :

সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণে জাত ও শ্রেণি দুটিকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও তাদের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্কে সহমত নন। মোটামুটিভাবে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসে। কেউ কেউ মনে করেন, 'জাত' এবং 'শ্রেণি' সম্পূর্ণ আলাদা দুটি ধরনের সামাজিক স্তর বিন্যাসের ভিত্তি। দুটির মধ্যে কোন সাদৃশ্য ও সংযোগ নেই। জাতির কথা বললে তা শ্রেণির দিক থেকে অর্থবহ নয়। আবার শ্রেণির কথা আলোচনা করলে সেখানে জাতের আলোচনা আসে না। সম্পূর্ণ বিপরীত একটি দৃষ্টিকোণ হল যে ভারতের বিশেষ প্রেক্ষিতে জাত শ্রেণির নামান্তর। এখানে জাতের মাধ্যমে শ্রেণি বিভাজনকে কায়েম করা হয়েছে। এবং তার প্রমাণ হল যে নিচু শ্রেণির লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবার নিচু জাতভুক্ত হয়। যেমন উঁচু শ্রেণির মানুষরা এখানে প্রায়শই উঁচু জাতের লোক, তথা বর্ণ হিন্দু হয়।

এই দুটি দৃষ্টিকোণের মাঝে আরো একটি দৃষ্টিকোণ আছে। সেটি অনুসারে, জাত ও শ্রেণি দুটি পৃথক সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তি। দুটি এক নয়। দুটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আবার দুটির মধ্যে সাদৃশ্যও আছে ও সংযোগও আছে। একটিকে বুঝতে হলে অন্যটিকে বুঝতে হয়।

শেষোক্ত দৃষ্টিকোনকেই সব থেকে যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয়। কারণগুলি একটু খতিয়ে দেখা যাক। তত্ত্বগত দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, জাত ও শ্রেণির ধারণার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। জাত পরিচিতি ধর্মের উপর ভিত্তি করা একটি অ-পরিবর্তনীয় পরিচিতি, যা জন্মসূত্রে লব্ধ। কিন্তু শ্রেণি পরিচিতি তেমনটা নয়। শ্রেণি পরিচিতির কোন ধর্মীয় ভিত্তি নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা। কেউ একটি শ্রেণিতে জন্মগ্রহণ করলেও তার শ্রেণি অবস্থান অ-পরিবর্তনীয় নয়। তার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে তার শ্রেণি অবস্থানেরও পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, কারখানার মালিকের ছেলে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার শ্রেণিগত পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ জাতের ক্ষেত্রে যে ধরনর পরিবর্তন সম্ভব হয় না, শ্রেণির ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়।

জাত ব্যবস্থা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এই সামাজিক বিন্যাস পৃথিবীর সব দেশে সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ ও নেপালের বাইরে খুব সীমিত সংখ্যক দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। শ্রেণি বিন্যাস কিন্তু সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। যদিও ভিন্ন ভিন্ন দেশে শ্রেণি বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়।

জাতের তুলনায় শ্রেণির সংখ্যা অনেক কম। আমরা যেমন ধাপে ধাপে সাজানো কয়েক শত জাতের অস্তিত্ব দেখতে পাই শ্রেণির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তা পাই না। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের দিকে তাকালে আমরা পাঁচ-সাতটার বেশি শ্রেণি খুঁজে পাই না। তাদের মধ্যেও কতকগুলি প্রধান শ্রেণি থাকে এবং বাকিগুলি একেবারেই নগণ্য সংখ্যক এবং প্রভাবের দিক থেকেও তাদের গুরুত্ব কম। ফলে, মূল দ্বন্দ্ব দুইটি শ্রেণি বা শ্রেণিগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

জাত ও শ্রেণির মধ্যে এই ধরনের নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে ভারতে এই দুটি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জাতের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাষায় 'শুদ্ধতা', 'অশুদ্ধতা'-র কথা বললেও বাস্তবে এটি একটি জটিল সামাজিক-অর্থনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি করে। কে উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা ভোগ করবে ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করবে, কে উৎপাদনে শ্রম দান করবে তা জাতপাতের অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্য ভাষায় বললে বলা যায় যে এগুলিই শ্রেণি অবস্থানের নিয়ামক। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে সাংবিধানিক আইনী নানা সুরক্ষার পাশাপাশি অস্পৃশ্য, তথা তফশিলী জাতভুক্ত ব্যক্তিরা শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ পেয়েছে। এর ফলে, একাংশ প্রান্তিক মানুষের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অবশ্যই উন্নতি ঘটেছে। এত সব সত্ত্বেও কিন্তু বাস্তব ছবিটা হল যে, নিম্ন আয়ের, কঠোর শ্রমের সম্মানহীন কাজগুলি আজও নিচু জাতির মানুষরাই করে থাকে। সেখানে বর্ণ হিন্দুদের প্রায় দেখাই যায় না। যেমন, ক্ষেতমজুরের কাজ, সাফাই-এর কাজ, জুতা সেলাই-এর কাজ, কারখানার নিচু তলার শ্রমিকের কাজ, প্রাণ বিপন্ন করে জঙ্গলে কাঠ ও মধু সংগ্রহ করতে যাওয়ার কাজ সবই করে নিচু জাতি বা জনজাতির মানুষরা। অপর দিকে উঁচু তলার, সম্মানীয় অর্থকরী কাজগুলিতে তাদের উপস্থিতি তাদের জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য। যথা ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, পদস্থ আমলা, অধ্যাপক অধিকাংশই বর্ণ হিন্দু।

জাত ও শ্রেণি মধ্যে গভীর সংযোগ থাকলেও দেখা যায় সচরাচর জাত ও শ্রণিকে অনেকটাই পৃথক ভাবে দেখা হয়। তত্ত্বগত ক্ষেত্রে সমাজ সংক্রান্ত আলোচনা অনেক সময়েই 'জাত' বা 'শ্রেণি'র আলোচনা করে থাকে; একটিকে অন্যটি থেকে শুধু পৃথকই নয়, বরং তার বিপরীত হিসাবে দেখানো হয়। প্রতিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রধানত জাতপাতগত বা শ্রেণিগত আন্দোলনের অস্তিত্ব। যেমন দলিত সংগঠনগুলি অধিকাংশই জাতের উপর যতটা জোর দেয়, শ্রেণির উপর বা শ্রেণি আন্দোলনের উপর দেয়

না। আবার, শ্রেণি আন্দোলনে যুক্ত রাজনৈতিক দল বা সংগঠনগুলি তাদের আন্দোলনে জাতের প্রাসঙ্গিকতা কমই বিশ্লেষণ করে, যেটুকু করে তা মূলত আশি-র দশকের পর থেকে, এবং যথেষ্ঠ নয়।

১.৬ সাংবিধানিক ব্যবস্থা, রাজনীতি ও জাত-বর্ণ :

স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক আইনে জাত ভিত্তিক বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার জাতপাত ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিকদের সমান ভাবে প্রাপ্য। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার আছে, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ারও অধিকার আছে। অস্পৃশ্যতার উপর নিষেধাজ্ঞা একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার। এর পাশাপাশি দেখা যায় যে অস্পৃশ্য জাতভুক্ত মানুষের দীর্ঘদিনের সামাজিক অত্যাচার ও বঞ্চনা অতিক্রম করতে সাহায্য করতে তাদের জন্য কিছু বিশেষে সাংবিধানিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে বহু আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব কিছুর ফলে অবদমিত জাত ভুক্তদের কিছুটা উন্নতি হলেও জাত ব্যবস্থা বা জাতপাতের ওপর নিপীড়ন বিলুপ্ত হয়নি। অনেকেই এখনও অস্পৃশ্যতা ও জাত হিংসার বলি হয়ে চলেছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতপাতের পরিচিতি অতি গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে জাতভিত্তিক আর্থ-সামাজিক বিন্যাস ধরে রাখার প্রচেষ্টা, অপর দিকে নিচু জাতগুলির পক্ষ থেকে তা পরিবর্তন করার বা চ্যালেঞ্জ করার প্রচেষ্টা। এই আর্থ সামাজিক লড়াই-এর অনেকটাই রাজনৈতিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার রূপ পায়। সংসদীয় গণতন্ত্র ভোটের তথা সংখ্যার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এবং জাতপাতগত পরিচিতি গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হওয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ জাতভিত্তিক ভোট ব্যাঙ্ক গড়ে তোলায় সচেষ্ট থাকে।

১৯৫৩ ও ১৯৭৮ সালে ভারতে দুটি কমিশন— 'অন্যান্য পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণি' চিহ্নিত করার লক্ষ্যে গঠিত হয়। প্রথমটি কাকা কালেল্‌কার-এর নেতৃত্বে, দ্বিতীয়টি বি. পি. মণ্ডল-এর নেতৃত্বে। কমিশনগুলি মূলত ভারতে শ্রেণি বৈষম্য ও জাতপাতগত বিরোধের আর্থ সামাজিক কারণগুলি খোঁজার চেষ্টার করে। প্রথম কমিশন ১৯৫৫-তে তার রিপোর্ট জমা করে এবং দ্বিতীয় কমিশন ১৯৮০-তে। দুটি কমিশনই পশ্চাদ্‌পদতার সঙ্গে সমাজে জাতপাতগত অবস্থানের যোগ অস্বীকার করতে পারেনি। প্রথম কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেনি। দীর্ঘদিন পরে দ্বিতীয় কমিশন গঠন করে। এই ধরনের কমিশন গঠন করার কথা সংবিধানেই বলা ছিল। দ্বিতীয়, তথা মণ্ডল কমিশন ভারতের বাহান্ন শতাংশ মানুষকেই পশ্চাদ্‌পদ বলে চিহ্নিত করে। নানা জাত গোষ্ঠীর মানুষকে এই পিছিয়ে পড়া অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একটা বড় অংশ নিম্ন জাত, তা ছাড়াও অন্যান্য কিছু জাত ও মুলসলমান গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পশ্চাদপদ শ্রেণিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে মণ্ডল কমিশন নানা ধরনের সুপারিশ করে। তার মধ্যে চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুপারিশও করে। তবে সর্বমোট সংরক্ষিত আসন বিচার বিভাগীয় বাধ্যবাধকতা অনুসারে পশ্চাশ শতাংশের নীচে রাখার উদ্দেশ্যে কমিশন অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণিদের জন্যে ২৭ শতাংশ সুপারিশ করে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যায়, ইতিপূর্বেই তপশিলী জাত, জনজাতিদের জন্য ১৫ শতাংশ ও ৭.৫ শতাংশ সংরক্ষণ ছিল। অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির ২৭ শতাংশ যুক্ত হওয়ায় সর্বমোট সংরক্ষিত আসন দাঁড়ায় ৪৯.৫ শতাংশ। ১৯৯০-তে সরকার মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ আংশিকভাবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার মধ্যে থাকে ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ। সিদ্ধান্তটিকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পক্ষে বিপক্ষে এক ধরনের জাতপাতগত মেরুকরণ ঘটে। অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণি বা OBC (Other Backward

Classes)-দের পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন ও সংগঠিত হতে দেখা যায়। পার্থক্য, বিভেদ ও সংঘাত থাকলেও তাদের সঙ্গে তপশিলী জাত জনজাতিদের এক ধরনের সহমর্মিতার জায়গা গড়ে ওঠে।

ভারতের রাজনীতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে ১৯৮০ দশক থেকেই নিম্ন ও মধ্য জাতগুলির গুরুত্ব বাড়তে দেখা যায়। ১৯৯০-এর দশক থেকে এটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লালুপ্রসাদ যাদব, মুলায়ম সিংহ ও নীতিশ কুমারের মত মধ্য জাতিভুক্ত নেতার পাশাপাশি ভারতীয় রাজনীতিতে দলিত নেত্রী মায়াবতীর উত্থান আমরা দেখেছি। নিম্ন, অবদমিত জাতি অবস্থান ক্রমেই একধরণের স্বাভিমান ও পরিচিতির ভিত্তি হয়ে ওঠে। নিজেদের জাতের ঐতিহ্য, গল্প কথা, নেতা-নেত্রী ইত্যাদিকে আঁকড়ে ধরে গড়ে ওঠে এই পরিচিতি যা আবার তাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে সংগঠিত হতে সাহায্য করে।

১.৭ সারসংক্ষেপ :

ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল ধরে জাত ভিত্তিক সমাজ বিন্যাস চলে এসেছে। মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যের এই বিন্যাস হলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ও এর প্রভাব মুক্ত নয়। সময়ের সাথে সাথে নানা পরিবর্তন হলেও আজও সামাজিক অবস্থান, ক্রিয়া-কলাপ অনেকটাই জাতপাতের পরিচিতির-ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। অগণতান্ত্রিক, বৈষম্য-মূলক ও অ-বৈজ্ঞানিক এই ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত মূল্যবোধকে তুলে ধরা হয় ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থায়।

ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে জাতপাত বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্যর কোন স্থান নেই। অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ। তবু বাস্তবে দেখা যায় ভারতে আজও শ্রেণি কাঠামো অনেকটাই জাত নির্ভর। ভারতের সংসদীয় রাজনীতি জাতের পাটিগণিতে পরিণত হয়। তারই মধ্যেদেখা যায়, দীর্ঘ দিনের অবদমিত জাতগুলি তাদের নিজেদের জাত পরিচয় আঁকড়ে সংগঠিত হতে তৎপর হয়, ভারতীয় রাজনীতির ভারসাম্যকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার আপ্রাণ তাগিদে।

১.৮ নমুনা প্রশ্ন :

(ক) বড়ো প্রশ্ন :

(১) ভারতের জাত ভিত্তিক সামাজিক বিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিতভাব আলোচনা করুন।

(২) জাত ও শ্রেণির মধ্যে সম্পর্ক কী তা বুঝিয়ে বলুন।

(৩) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাত পরিচিতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্ন :

(১) জাত প্রসঙ্গে সাংবিধানিক অবস্থান কী?

(২) মণ্ডল কমিশন কী উদ্দেশ্যে গঠিত হয়?

(৩) জাতপাত ব্যবস্থার প্রভাব কি শুধু হিন্দু সমাজের উপর দেখা যায়?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) কোন ব্যক্তির জাত পরিচিতি কি সে তার নিজের ইচ্ছায় পরিবর্তন করত পারে?

(২) কাকা কালেল্‌কার কমিশন কবে গঠিত হয়?

(৩) মণ্ডল কমিশন ভারতের জনসংখ্যার কত শতাংশকে পশ্চাদ্‌পদ বলে চিহ্নিত করে?

১.৯ গ্রন্থসূচি :

1. G. S. Ghurye, *Caste and Class in India.*
2. Louis Dumont, *Homo Hierarchicus.*
3. Dipankar Gupta, ed., *Social Stratification.*
4. Christopher Jaffrelot, *India's Silent Revolution : The Rise of the Low Castes in North Indian Politics.*
5. Rajni Kothari, *Caste in Indian Politics.*

একক ২ ❑ শিল্প বাণিজ্য ও রাজনীতি

গঠন :

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত-এ ভারতীয় শিল্পের বিকাশ

২.৪ শিল্প বাণিজ্য সংস্থার উদ্ভব ও বিকাশ

২.৫ ভারতীয় রাজনীতিতে বাণিজ্য সংস্থার চাপ

২.৬ সারসংক্ষেপ

২.৭ নমুনা প্রশ্ন

২.৮ গ্রন্থসূচি

২.১ উদ্দেশ্য :

এই এককটি পড়ে আমরা জানতে পারবো —

- ভারতে শিল্পায়নের উদ্ভবের কথা
- বণিক সংগঠনগুলির গড়ে ওঠার পিছনের ইতিহাস
- বণিক/শিল্প সংগঠনগুলির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আগ্রহ ও চাপ সৃষ্টি করার কথা
- চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে তাদের অবলম্বন করা পদ্ধতিগুলি সচরাচর কেমন হয়।

২.২ ভূমিকা :

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনীতিতে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর গুরুত্ব অপরিসীম। তবে এ বিষয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা কম। যা আছে তাও প্রধানত পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলিতে করা পাশ্চাত্যের স্বার্থগোষ্ঠীগুলির বিশ্লেষণ। উন্নয়নশীল দেশগুলির চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা অনেকটাই অনালোচিত থেকে গেছে। অথচ সেই দেশগুলির রাজনীতিতে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আবার তা সঠিকভাবে বুঝতে গেলে সেই দেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া আবশ্যক। তার অর্থনীতি জানা দরকার, তার ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্পর্কে সচেতনতা দরকার।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি নানা প্রক্রিয়ায় সরকারের নীতিকে তাদের স্বার্থ রক্ষার অনুকূলে আনার চেষ্টা করে। কখনও তারা নিজেদের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করে, এ ব্যাপারে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা

অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কখনও তারা মন্ত্রী সাংসদদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়, তদ্‌বির করে, উপহার ইত্যাদি দেয়। কখনও একইভাবে আমলাদেরও তাদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করে। কখনও কখনও বিভিন্ন কমিটি কমিশনে তাদের নিজেদের অথবা বন্ধু সংগঠনের প্রতিনিধি থাকায় তাদের মাধ্যমে প্রভাব খাটাতে যায়। কোথাও কোথাও আবার আইন মোতাবেকই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীদের তাদের নিজেদের বক্তব্য জানানোর পদ্ধতি স্বীকৃত আছে। মোটের উপর বলা যায়, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীরা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে, নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা অনুযায়ী আইনী, আইন বহির্ভূত ও বে-আইনী প্রক্রিয়ায় সরকারকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

ভারতের ক্ষেত্রেও আমরা নানা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও প্রভাব ঘটানোর প্রচেষ্টা দেখতে পাই। তাদের নানা রূপে আমরা খুঁজে পাই, কোথাও যেমন দেখি পরিবেশ বিষয়ে আগ্রহী মানুষ হিসাবে সংগঠিত হতে, কোথাও কোন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে, কোথাও কৃষক বা শ্রমিকদের হয়ে Lobby করতে আবার কোথাও বা শিল্পগোষ্ঠীদের প্রবক্তা হিসাবে। বলা যেতে পারে, ভারতীয় রাজনীতিতে 'গোষ্ঠী'র গুরুত্ব ও গোষ্ঠী হিসাবে দর কাষাকষির স্থানটা থাকে বিস্তৃত।

ভারতে শিল্পগোষ্ঠীগুলির স্বার্থ তুলে ধরার জন্য এবং রাজনীতিবিদ, সরকার ও আমলাদের কাছ থেকে তাদর দাবী আদায়ের লক্ষ্যে নানা সংগঠনকে গড়ে উঠতে দেখা যায়। এদের মধ্যে আছে Nasscom, Confederation of Indian Industries (CII), Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (Ficci) ও Associated Chambers of Commerce (Assocham)। আজ উদারিকরণ পরবর্তীকালে, মাল্টি ন্যাশনাল সংস্থাগুলির সংগঠনও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। যেমন ধরা যাক, American Chamber of Commerce-এর কথা। মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশনরা অবশ্য নীচের তলায় কম লবি করে; এদের প্রভাব ঘটানোর প্রচেষ্টায় যোগাযোগ একেবারে উপরের রাজনৈতিক ক্রেতা/সরকারের স্তরে। তাই, Walmart যখন FDI-এর পক্ষে সওয়ালে করতে চায়, তখন নিচের তলায় লবি না করে হিলারি ক্লিনটনকে দিয়ে ভারত সরকারের কাছে লবি করা হয়।

২.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্পের বিকাশ :

ভারতে পুঁজির প্রবেশ ও অগ্রগতি ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে অত্যন্ত জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ঘটে। ভারতের সনাতন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভাঙ্গন ও ক্ষুদ্রশিল্পকে ধ্বংস করে গড়ে ওঠে ব্রিটিশ আধিপত্যের ইতিহাস। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালের গোড়ার দিকে ইংরাজরা ভারতে বিলিতি পণ্য চালানের উপর বেশি জোর দেয় এবং সেজন্য দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করে। প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরে সরাসরিভাব ব্রিটিশ সরকারের শাসন ভারতের আর্থ-সামাজিক শোষণের পথ উন্মুক্ত করে। শিল্প বিপ্লবের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে ভারত থেকে কাঁচা মাল আহরণের সুবিধার জন্য ভারতে যোগাযোগ পরিষেবা উন্নত করতে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়, রেল ব্যবস্থা চালু করে এবং তাকে কেন্দ্র করে নানা শিল্পে পুঁজির প্রবেশ ঘটতে থাকে। খনিজ পদার্থ— তথা কয়লা শিল্প, চা বাগান ও চা উৎপাদন শিল্প, পাট শিল্প প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুঁজির প্রবেশ ঘটে। অপর্যাপ্ত কাঁচা মাল ও সস্তা শ্রমের লোভে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারতকে তাদের পুঁজির বিনিয়োগের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে দেখে। ভারতের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে। ক্রমে এক শ্রেণির ভারতীয়ও শিল্পে বিনিয়োগে সক্ষম হয়ে ওঠে। স্বদেশী

আন্দোলনের সময়ে ব্রিটিশ সামগ্রী বর্জনের ডাক ভারতীয় পুঁজিপতিদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে। বিংশ শতকের গোড়ায় টাটা-দের ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠে। এ ছাড়াও বোম্বাই, আহমেদাবাদ ও বাংলায় টেক্সটাইল কারখানার প্রসার ঘটে।

বলা যেতে পারে, ভারতে ১৮৫০ থেকে ১৮৭০-এর মধ্যে আধুনিক শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৯০-এর মধ্যে ভারতে বেশ কিছু বড় শিল্প সংস্থা গড়ে ওঠে। ফলে কয়েক লক্ষ লোক কারখানা ও খনিতে কর্মরত হল।

ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে বিশেষত ১৯১৪ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে ছোট হলেও ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও ভারতীয় মালিকানার শিল্পের ভিৎ গড়ে ওঠে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৩০-এর দশকের বিশ্ব মন্দা, যা Great Depression নামে পরিচিত, সাম্রাজ্যবাদী দাপট ও নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হলেও আলগা করে দেয় আর সেই সুযোগটাই ভারতীয় পুঁজিপতিরা নিজেদের উন্নতি ঘটাতে সদ্ব্যবহার করে। স্বাধীনতার আগেই টাটা, বিড়লা, সিংহানিয়া, ডালমিয়া, জৈন প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পপতিদের বিকাশ ঘটে। ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যাংক, শিল্প, যোগাযোগ— নানা দিকে তাদের স্বার্থ জড়িয়ে থাকে।

এর পাশাপাশি মনে রাখা প্রয়োজন স্বাধীনতা উত্তর ভারতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অগ্রহে ও ব্যাপক জনসমর্থনের ভিত্তিতে, মিশ্র অর্থনীতি ও পরিকল্পিত উন্নয়নের পথকে বেছে নেওয়া হয়। প্রথম তিনটি যোযণাকালের মধ্যেই একটি শক্তিশালী পাব্লিক সেক্টর গড়ে ওঠে যা মৌলিক শিল্প স্থাপনে যথেষ্ট অবদান রাখে। ব্রিটিশ আমলে বেসরকারি সংস্থাগুলি যতখানি অ-নিয়ন্ত্রিতভাবে তাদের কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারতো তা স্বাধীনতার পর সম্ভব থাকে না। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়ন ঘটানোর দায়বদ্ধতা থাকায়, বে-সরকারি সংস্থাগুলির উপর সরকারের আইন-কানুনের বেড়াজাল অনেক বেশি এসে পড়ে। ক্রমে সৃষ্টি হয়, যাকে লোকে চলতি ভাষায় বলে, 'লাইসেন্স-কোটা রাজ্'। সরকারি অনুমতি ও সুযোগ সুবিধা পাওয়াকে কেন্দ্র করে নানা স্তরে নানা ধরনের দুর্নীতির প্রবেশ ঘটে। টাকা বা উপঢৌকন দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার বদনাম কি ছোট কি বড় ব্যবসায়ী সংস্থাদের একের পর এক নাম জড়িয়ে যেতে থাকে।

১৯৯১-এর পর থেকে উদারিকরণ নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে দেশী ও বিদেশী বে-সরকারী শিল্প সংস্থাগুলি আগের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে শুরু করে। বলা বাহুল্য, নীতি নির্ধারণে শিল্প সংস্থাগুলির মতামত অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয়। শুধু তাই-ই নয়। তার অনেক বেশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা থাকে। 'শিল্পের' স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে— এমনই একটি অবস্থান মূল ধারার রাজনীতিতে লক্ষ্য করা যায়। এ অবস্থান আগের অবস্থান থেকে স্পষ্টতই আলাদা যেখানে অগ্রাধিকার ছিল 'গণতন্ত্র' ও 'কল্যাণমূলক রাজনীতি'র এবং শিল্পের তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বাধ্যবাধ্যকতা।

২.৪ শিল্প বাণিজ্য সংস্থার উদ্ভব ও বিকাশ :

ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই শিল্প স্বার্থ রক্ষা করার ও প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি শিল্প সংস্থার উদ্ভব ঘটে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলাদের সঙ্গে সুষ্ঠু যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যে অনেক ব্যবসায়ী সংস্থা দিল্লিতে তাদের যোগাযোগ রক্ষাকারী দপ্তর বা 'industrial embassy' প্রতিষ্ঠা করে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সুষ্ঠ যোগাযোগ বজায়

রেখে সংস্থার কার্য সিদ্ধি করা। সরকারের দিক থেকেও বে-সরকারি সংস্থাগুলির উপর সঠিক নজরদারি রাখা ও তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার আইনী প্রক্রিয়া গড়ে তোলা আবশ্যক হয়। ফলে গৃহীত হয় Industries (Development and Regulation) Act, 1951।

ভারতের ব্যবসায়ী সংগঠনের মধ্যে Ficci বা Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry উল্লেখযোগ্য। Ficci ১৯২৭-এর প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে তার ইতিহাস যুক্ত। গান্ধীর পরামর্শক্রমে ও জি ডি বিড়লা এবং পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস-এর তৎপরতায় এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন Chambers of Commerce ও Industry-র এটি অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীন শীর্ষ সংগঠন। শিল্পের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে— গবেষণা, গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, সরকার ও শিল্প প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপচারিতা করানো ইত্যাদি।

১৯২০-তে Associated Chambers of Commerce (Assocham) গঠিত হয়। এটি মূলত দেশের বিভিন্ন স্থানের ব্রিটিশ শিল্প সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সংগঠন হিসাবে তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে গড়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গে অবশ্য Assocham-এর এক ধরনের ভারতীয়করণ ঘটেছে। তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন চেম্বার অফ্ কমার্স্-এর সদস্য সংখ্যা কয়েক হাজার। এর প্রধান লক্ষ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যর বিস্তার ঘটানো, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের বাধাগুলি হ্রাস করানোর প্রচেষ্টা করা ও ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা।

২.৫ ভারতীয় রাজনীতিতে বাণিজ্য সংস্থার চাপ :

স্বাধীনতা উত্তর ভারতের অন্তত প্রথম দশকে সংসদে শিল্প সংস্থাগুলির কণ্ঠস্বর দুর্বল ছিল। তবে ক্রমে তারা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় করে। তবে স্বাধীনতার আগে থেকেই রাজনীতিতে শিল্পপতি ও শিল্প সংস্থাদের আগ্রহ ও প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে শিল্প সংস্থাগুলির বিকাশ ঘটে। সরকারের নিয়ম নীতির মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়। ফলে কি ধরনের নিয়ম নীতি গৃহীত হল তার উপর শিল্প সংস্থাগুলির কাজ করতে পারা না পারা, তাদের সাফল্য ব্যর্থতা অনেকটাই নির্ভর করে। এর ফলে তাদের পক্ষে রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক গতি-প্রবাহকে তারা নিজেদের স-পক্ষে আনার চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এর অন্যতম প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক দলগুলির কী নীতি, কে নির্বাচনী প্রার্থী এ সব কিছুর উপরই শিল্প জগতের তীক্ষ্ণ নজর থাকে। এক দিকে তারা দলগুলির নীতি ও প্রার্থী বা নেতা নির্বাচনকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালায়, অন্য দিকে যে দলকে বিশেষভাবে বন্ধু ভাবাপন্ন মনে করে তাকে নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। অর্থের যোগান দেওয়া থেকে শুরু করে তার প্রচারে নানাভাবে সাহায্য করায় ব্রতী হয়। বিভিন্ন শিল্প গোষ্ঠী এক বা একাধিক দলের উপর তাদের ভরসা রাখে। যখন মনে করে ভুল বাজি ধরেছে তখন সমর্থন এক থেকে অন্য দলে সরিয়ে নিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, বড় জাতীয় দলে তাদের আগ্রহ বেশি থাকে।

সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে শিল্প সংস্থারা রাজনৈতিক নেতা, আমলা ও শিল্প প্রতিনিধিদের মধ্যে মাঝে মধ্যেই আলোচনা চক্রের আয়োজন করে যেখানে শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে মতের আদান-প্রদান ও আলাপ-আলোচনা সম্ভব হয়। এই সব আলোচনা চক্রের মাধ্যমে শিল্প সংস্থারা আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের শিল্প স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। কখনও কখনও জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরের সেমিনার বা এগ্‌জিবিসনেরও আয়োজন করতে দেখা যায়।

আইন প্রণয়নের দাবীতে কোন বিলের উপর তাদের মতামত ব্যক্ত করে ব্যবসায়ী সংস্থার প্রতিনিধিরা সাংসদ, মন্ত্রী বা আমলাদের কাছে তাদের নিজেদের অবস্থান জানায়। কখনও লিখিতভাবে, কখনও বা ব্যক্তিগত ভাবে তারা এই প্রভাব খাটাতে যায়। আইনত লবি করার স্বীকৃত সংস্থান না থাকলেও বাস্তবে লবি করা হয়ে থাকে। কখনও অর্থের বিনিময়ে, কখনও-বা উপঢৌকন বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কার্য সিদ্ধির প্রচেষ্টা চলে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক দুর্নীতির নানা কাহিনীর সঙ্গে শিল্পের নাম অনেক ক্ষেত্রেই জড়িয়ে গেছে। সাম্প্রতিক কালে 'দি হিন্দু'-তে ওয়ালমার্ট-এর লবি করার বিষয়ে ফাস হওয়া তথ্য (যা ডিসেম্বর ১২,২০১২-য় প্রকাশিত হয়) থেকে জানা যায় যে অন্তত ২৭টি ভারতীয় কোম্পানি তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লবি করার জন্য অর্থ ব্যয় করেছে। এই সংস্থাগুলির মধ্যে আছে রিলায়েন্স, র‍্যানব্যাক্সি, টাটা সন্স, উইপরো প্রভৃতি সংস্থা।

২.৬ সারসংক্ষেপ :

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিকীকরণ ও শিল্পায়নের সাথে সাথে যে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি উঠে এসেছে তার মধ্যে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা করা থেকে শুরু করে, নির্বাচনে তাদের প্রচার তহবিল বৃদ্ধি ইত্যাদির পাশাপাশি, সংসদের সদস্যদের প্রভাবিত করার লক্ষের নানাভাবে লবি করতে দেখা যায়। কোথাও বা আমলাদের প্রভাবিত করে কার্য হাশিল করার প্রচেষ্টা চালায়।

দেশের শিল্পনীতি কী হবে তা রাজনৈতিক ভাবে নির্ধারিত হয়। মন্ত্রী ও সাংসদদের তার দিক নির্দেশ করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। শিল্পসংস্থাগুলির স্বার্থ এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। তাই নানাভাবে, কখনও ব্যক্তিগত স্তরে কখনও বা সংগঠিত ভাবে তারা সরকারের নীতিকে তাদের স্বপক্ষে আনার প্রচেষ্টা চালায়। একদিকে দেখা যায় টাটা ও আম্বানি-দের মত বড় শিল্পপতিদের প্রভাব, অপর দিকে থাকে Assocham, Ficci প্রভৃতি সংস্থার গুরুত্ব। বলা বাহুল্য, নব্বুই-এর দশকের পর থেকে বে-সরকারিকরণকে সরকার প্রধান্য দেওয়ায় রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী প্রভাব অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৭ নমুনা প্রশ্ন :

(ক) বড়ো প্রশ্ন :

(১) ভারতে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে শিল্প সংগঠনগুলির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(২) ভারতে শিল্প সংগঠনগুলির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস ব্যাখ্যা করুন।

(৩) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে ভারতে শিল্প সংগঠনগুলি কিভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করায় সচেষ্ট হয় তা আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্ন :

(১) ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে শিল্পায়নের বিকাশ কীভাবে ঘটে?

(২) Assocham সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

(৩) FICCI সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) স্বাধীনতা উত্তর ভারতে নেহরু আমলে গৃহীত উন্নয়নের পথ কী ছিল?

(২) 'Industrial embassy' কাকে বলে?

(৩) FICCI কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

২.৭ গ্রন্থসূচি :

- Rob Jenkins, *Democratic Politics and Economic Reforms in India.*
- Stanley A. Kochanek, *Business and Politics in India.*
- Vineeta Yadav, *Political Parties, Business Groups, and Corruption in Developing Countries.*

একক ৩ ❑ নারী ও রাজনীতি

গঠন :

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও নারী
৩.৪ ভারতীয় রাজনীতিতে নারী
৩.৫ সারসংক্ষেপ
৩.৬ নমুনা প্রশ্ন
৩.৭ গ্রন্থসূচি

৩.১ উদ্দেশ্য :

এই এককটি পড়ে আমরা জানতে পারবো —

- ভারতে নারীর সামাজিক অবস্থান
- ভারতে নারীর সামাজিক অবদমনের মূল কারণ
- ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা
- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ও গৃহীত নানা পদক্ষেপ

৩.২ ভূমিকা :

ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় নারীরা ভারতে জাতপাত ও পিতৃতান্ত্রিক রীতিনীতির বেড়াজালে ক্রমাগত নিপীড়নের শিকার হয়ে এসেছে। ধ্রুপদী হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় স্পষ্টতই অনেক নিচুতে স্থান দেওয়া হয়। বর্ণ বিভেদের মূল কথা বর্ণ ভিত্তিক অন্তর্বিবাহ— নারীর যৌনতার কঠোর নিয়ন্ত্রণ দাবী করে। ফলে, সতীত্ব, বাল্যবিবাহ ও সর্বদা তার উপর নজরদারি ছিল নারীর 'পাপ' পথে যাওয়া আটকানোর নানা ব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি। প্রথম পিতা, পরে স্বামী এবং শেষ পর্যায়ে পুত্রের অধীনস্থ হওয়াই ছিল নারীর নিয়তি। সামাজিকভাবে পুরুষ ও নারীর কাজের বিভাজন খুব স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট থাকে। বাইরের জগতটা প্রধানত, পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্র এবং গৃহের অভ্যন্তর নারীর। সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষমতা বা শক্তির প্রকাশ যেমন পুরুষের এক্তিয়ার, গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজ, সন্তান ধারণ ও প্রতিপালন, পরিবারের সদস্যদের সেবা করা নারীর দায়িত্ব। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীই

হিন্দু বর্তমানের হিসাবে প্রায় ৮০ শতাংশ— ফলে এই মূল্যবোধের প্রভাব তাদের উপর ব্যাপক। অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যেও পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার প্রাধান্য বর্তমান, ফলে তাদের মধ্যেও নারী ও পুরুষের কর্ম বিভাজন সম্পর্কে ধারণাটা অনেকটাই এক রকমের। তাদের মধ্যেও নারীকে হেয় করে দেখানো ও অবদমন করাটাই প্রচলিত রেওয়াজ।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই ভারতে নারীরা প্রথম শিক্ষার সুযোগ পায়। মহিলাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত সামাজিক বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধেও আন্দোলনকারীরা উদ্যোগী হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই আন্দোলনে পুরুষ ও এলিট মহিলাদের ভূমিকা ছিল। তবে, ঐ পর্যায়ে আন্দোলন ঐতিহ্যবাহী পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ নেয় না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মহিলাদের স্বাধীন পরিচয়ের জন্য বাংলায় সরলাদেবী চৌধুরী এবং সরোজ নলিনী দত্ত প্রথম মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন। এছাড়াও, মহিলা অন্য আরো সংগঠন যেমন, Women's Indian Association (১৯১৭) ও All India Women's Conference (AIWC, ১৯২৭) মাদ্রাজে গড়ে ওঠে। ১৯১৭-তে নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থায় ভোটাধিকারের দাবীতে সরোজিনী নাইডু-র নেতৃত্বে কয়কটি মহিলা সংগঠনের তরফ থেকে মন্টেগু চেম্‌স্‌ফর্ড কমিটির কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নারীদের দিক থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের সম-মর্যাদা দাবীর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ। নারীদের ভোটদানের অধিকারের সপক্ষে ক্রমেই মতামত জোরদার হতে থাকে। তবে বিপক্ষের মতামতও ছিল খুব স্পষ্ট। তাদের মূল বক্তব্য ছিল যে নারীরা অধিকাংশই অ-শিক্ষিত, পর্দানসীন ফলে তাদের এ অধিকার দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। তবে নারী সংগঠনগুলির দিক থেকে জোরালো আন্দোলন চালানো হয়। ১৯২১-এ বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রভিন্স-এ মহিলারা প্রথম ভোটের অধিকার পায়। বাংলায় সে অধিকার প্রাপ্ত হয় ১৯২৬-এ।

ক্রমে মহিলাদের আইন সভায় নির্বাচিত হওয়ার দাবীও ওঠে। সেখানেও পক্ষে বিপক্ষে মোটামুটিভাব একই ধরনের যুক্তি তুলে ধরা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সেই অধিকারও প্রাপ্ত হয়। আইন সভার প্রথম সদস্য হল ১৯২৭-এ মাদ্রাজ লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল-এ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি।

মহিলাদের কণ্ঠস্বর যত জোরালো হতে থাকে, ১৯৩০-এর দশক থেকে দেখা যায় মহিলাদের অধিকারের নানা দিক সুরক্ষিত করতে নানা ধরনের আইনী পদক্ষেপ গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, নারীদের পৌর অধিকার অর্জনের লড়াই ছিল কঠিন। পুরুষদের বিরোধিতা অনেক সময়ে ধর্মের নামে ও সনাতন রীতিনীতির নামে ব্যক্ত করা হত। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের অবস্থানও ছিল অনেকটা দ্বিধা বিভক্ত।

৩.৩ ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও নারী :

স্বাধীন ভারতের সংবিধান মেয়েদের পুরুষদের সাথে সমানাধিকার দিয়েছে। এটি তাদের মৌলিক অধিকার। সমান আইনী সুরক্ষা, সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি জনপরিসরে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার সাংবিধানিকভাবে গৃহীত হওয়ায় নারীরা রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে নারীর অগ্রগতি, উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য নানা সময়ে সংসদ ও রাজ্য বিধান সভাগুলি নানা আইন প্রণয়ন করেছে। বিভিন্ন মামলায় বিচারালয় নারী অধিকার ও সুরক্ষার জন্য বহু ইতিবাচক রায়দান করেছে। নারীদের জন্য বিশেষ সব প্রকল্পের জন্য সরকারি অনুদান নির্দিষ্ট হয়েছে।

১৯৫০-এর দশকে পরস্পর বেশ কিছু আইন পাস করে হিন্দু পার্সোনেল আইনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু

পরিবর্তন আনা হয় যার ফল সম্পত্তি, উত্তরাধিকার ও বিবাহ সংক্রান্ত অধিকারের প্রশ্নে মেয়েদের অধিকার বাড়ে। সময়ের সাথে সাথে আরো বহু আইন কানুন গৃহীত হয়েছে যার মোট উদ্দেশ্য পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে ও বৃহত্তর সমাজে নারীর সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

এত সব সত্ত্বেও মেয়েরা অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। ১৯৭১ সালে ভারতের শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রক ডঃ ফুলরেণু গুহ-র তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি-র উদ্দেশ্য ছিল নারীদের সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, কর্ম সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে সাংবিধানিক, আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলি পরীক্ষা করে দেখা ও তার ফলাফল পর্যালোচনা করা। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ হিসাবে উদ্‌যাপন করার উদ্দেশ্যে সমস্ত দেশগুলিকে নিজেদের দেশে নারীদের অবস্থা নিয়ে রিপোর্ট বানাতে অনুরোধ করে। তারই প্রেক্ষিতে ভারত সরকারের এই কমিটি গঠন করা। ১৯৭৪-এ এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে যা ছিল তা চমকে দেওয়ার মত। টুওয়ার্ডস্ ইক্যুয়ালিটি (Towards Equality) নামক রিপোর্টটিতে ভারত সরকারের লিঙ্গগত সমতা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিরাট প্রশ্ন তোলা হয়। এই রিপোর্টই প্রথম বলে যে মেয়েদের জন্য সংবিধান প্রদত্ত সাম্য ও ন্যায় বিচারের অধিকার অর্জন করা যায়নি। রিপোর্ট রচয়িতারা অভিযোগ করেন যে, স্বাধীনতার পর নারীদের অবস্থার উন্নতি ঘটা তো দূরের কথা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা খারাপ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দশকে (১৯৭৫-৮৫) নানা ধরণের কর্মসূচি গৃহীত হয়। নারীদের প্রতি 'কল্যাণমূলক' ব্যবস্থার তুলনায় 'উন্নয়নমূলক' ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়। বিভিন্ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও উপার্জনের ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নানা প্রকল্প গৃহীত হয়। নারী উন্নয়নের কর্মসূচির উপর চোখ রাখতে বিভিন্ন মন্ত্রকে পৃথক নারী সেল। ১৯৯৩-তে জাতীয় মহিলা কমিশন বিষয়ক আইন পাস হয়। একে এক পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যেও মহিলা কমিশন গঠিত হয়। ভারত সরকার তার নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে (১৯৯৭-২০০২) নারীর ক্ষমতায়নর বিষয়টিকে প্রধান লক্ষ্যগুলির অন্যতম হিসাবে গ্রহণ করে। ২০০১ সালকে জাতীয় নারীর ক্ষমতায়ন বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। উচ্চ পদে নারীদের আসীন হতে দেখা যায়। বিদেশে রাষ্ট্রদূত হয়ে যেতে, এমনকি প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী হতেও দেখা যায়।

এই চিত্রের পাশাপাশি উঠে আসে এক বিপরীত চিত্র। যেটি সাধারণ রমনীর জীবন কাহিনীর চিত্র। সেখানে অধিকার, সাম্য, ন্যায় বিচারের বদলে আছে বঞ্চনা, হিংসা, অত্যাচারের নানা রূপ যা লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রকটভাবে ফুটিয়ে তোলে। ভ্রূণ হত্যা, কন্যা সন্তান হত্যা, ধর্ষণ, বধু হত্যা দৈনিক সংবাদ হয়ে ওঠে। সামাজিক পারিবারিক চাপ নানা দিক থেকে নারীর জগৎকে সংকুচিত করে। তার প্রকাশ ঘটে স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভাবে। নিরক্ষরতা বা পুরুষের তুলনায় স্বল্প শিক্ষার হারে এবং কর্ম সংস্থানের অভাবের মত নানা দিকে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে বলা যায়, একটি পিছিয়ে থাকা বিরাট জনগোষ্ঠী হিসাবে নারীরা থেকে যায়।

৩.৪ ভারতীয় রাজনীতিতে নারী :

রাজনীতি পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্র; নারী তার জন্য অনুপযুক্ত— এমনটাই সনাতন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রচলিত চিন্তাধারা। রাজনীতি নারীদের জন্য নয় এমনটা মনে করা হয়। কারণ রাজনীতি যে সব বিষয়ে লিপ্ত থাকে যথা, যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সেগুলি নারীদের এক্তিয়ারের বাইরে বলা হয়। তাদের নারীত্বকে ক্ষুণ্ণ করে এবং তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই, কি ভারতে, কি বিদেশে

নারীদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ বিষয়টিকে অনেকটাই নিরুৎসাহিত করা হয়। ফলে, প্রাচীনকাল থেকেই উল্লেখযোগ্য কিছু নারী চরিত্রকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেলেও, সামগ্রিকভাবে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত থেকেছে। অবশ্যই উঠে এসেছে রাণি লক্ষ্মীবাই, ঝলকারিবাই ও উদাদেবীর মত নারীদের নাম।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে বিপুল সংখ্যক মহিলা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯২০-র দশক থেকে বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে যথা অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩১) ও পরবর্তীকালে ভারত ছাড় আন্দোলনে ব্যাপকহারে সাধারণ মহিলাদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

ব্রিটিশ শাসনকালে বিভিন্ন বিপ্লবী দলে সাহসী কিছু নারীকে অগ্রণী ভূমিকায় দেখা যায়, যথা প্রিতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত প্রমুখ যাঁরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত ছিলেন।

বিভিন্ন সময়ে কৃষক আন্দোলনেও মহিলাদের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেছে। বাংলার তেভাগা আন্দোলনে (১৯৪৬-৫০), অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা আন্দোলনে (১৯৪৮-৫১) ও পরবর্তীকালে ৭০-এর দশকে নকশালবাড়ী আন্দোলনে মহিলাদের জঙ্গী আন্দোলনে দেখা যায়।

তবুও চিন্তার বিষয়, স্বাধীনতা উত্তর ভারতে, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ একান্তভাব সীমিত থেকে যায়। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অ-প্রচলিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়, যথা পরিবেশ আন্দোলনে, মাদক বর্জন আন্দোলনে, শান্তি আন্দোলনে, এমনকি বৈপ্লবিক আন্দোলনেও। কিন্তু প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রটা পুরুষ-প্রধান থেকে যায়। ভোটদাতা হিসাবে নারীদের দেখা গেলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদগুলিতে তাদের দেখা পাওয়া যায় খুবই কম। সংখ্যার দিক থেকে দেখলে দেখা যায় প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বের স্তরে নারীদের উপস্থিতি কম। দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ মূলত পুরুষদের হাতেই থেকে যায়।

সংসদের দিকে তাকালে ছবিটা কতটা উদ্বেগজনক তা বোঝা যায়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, জয়ী হলে সাংসদ হিসাবে মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার আইনত থাকলেও, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সংখ্যাই কম; নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধি হিসাবে সংসদে যাওয়া নারীদের সংখ্যা আরো কম। যেখানে মেয়েদের জনসংখ্যার হার পুরুষদের প্রায় কাছাকাছি (অল্প কিছু কম) সেখানে দেখা যায় লোক সভায় তাদের হার গোড়া থেকে ত্রয়োদশ লোকসভা পর্যন্ত কোন বারই দশ শতাংশের উপর উঠতে পারেনি। বর্তমানে শুধু তা সামান্য অতিক্রম করেছে মাত্র। রাজ্যসভায় মহিলা প্রতিনিধিত্বের চিত্রটা অনেকটাই একরকম। রাজ্য স্তরের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানকার ছবিটাও খুব একটা আলাদা নয়। রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা অত্যন্ত কম। বলা বাহুল্য, আইন সভাগুলিতে এত কম প্রতিনিধি সংখ্যার ফলে সেখানে আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

আইনসভার পাশাপাশি মন্ত্রীসভাতেও দেখলে দেখা যায় নারী প্রতিনিধিত্ব ধারাবাহিকভাবেই কম থেকেছে। কেন্দ্রীয় স্তরেই হোক, বা রাজ্যস্তরেই হোক তাদের সংখ্যা থেকেছে উদ্বেগজনক। সমস্যাটা শুধু সংখ্যার নয়। যদি বা কেউ মন্ত্রী হতে পারেন, ক্যাবিনেটে অর্থাৎ সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পাওয়া আরো কঠিন। এ ছাড়াও দেখা যায়, যে দপ্তরের দায়িত্ব মহিলা মন্ত্রীদের দেওয়া হয় সেগুলি সাধারণত সরাসরিভাবে মহিলা সংক্রান্ত বা অন্তত মহিলা সম্পর্কিত বিষয়ে দেখাশোনা করার দপ্তর। যথা, নারী ও শিশু বিষয়ক দপ্তর, জনকল্যাণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি। স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা বা বিদেশ মন্ত্রকের মতন গুরুত্বপূর্ণ

মন্ত্রকের দায়িত্বভার তাদের উপর সচরাচর দেওয়া হয় না। অর্থাৎ যেখানে বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র, শক্তি ও ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ স্থল সেখানে নারীদের অনুপযুক্ত মনে করা হয়।

১৯৭৪-এর টুয়ার্ডস্ ইকুয়ালিটি রিপোর্ট— যেটির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, তাতে বলা হয় যে ভারতের রাজনীতি মহিলাদের ক্ষমতার স্বার্থক রূপায়নে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। যদিও সংখ্যায় তারা সমাজের প্রায় অর্ধেক অংশ রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাদের নিম্নমুখী অবস্থা ক্রমশই তাদের সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণিতে রূপান্তরিত করছে। পরিস্থিতির মোকাবিলা করায় কমিটি কতকগুলা গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে। সেগুলি হলো— (ক) রাজনৈতিক দলগুলোকে মহিলা প্রার্থীদের জন্য কোটা নির্ধারণ করতে হবে। (খ) পুরসভাগুলোতে মহিলাদের জন্য বেশ কিছু আসন নির্ধারণ করতে হবে। (গ) সাময়িক পদক্ষেপ হিসাবে মহিলা পঞ্চায়েত গঠন করতে হবে। তবে, এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই রিপোর্ট-এ সংসদ বা রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়নি। মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ সুপারিশ না করার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, তার ফলে মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে সংকীর্ণতা আসবে, তাদের স্বার্থকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর বা শ্রেণীর স্বার্থ থেকে আলাদা করা যায় না। এই ধরনের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব চালু করলে অন্যান্য গোষ্ঠীর দিক থেকে অনুরূপ দাবী উঠবে যা জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপদজনক হতে পারে। এবং একবার সংরক্ষণ চালু করলে তা প্রত্যাহার করা কঠিন হবে।

ভারতের ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও পুর স্তরে মহিলাদের জন্য এক -তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয়। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে পঞ্চায়েত ও পুর সংস্থাগুলিতে মহিলাদের প্রবেশের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য ঐ স্তরে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ বাড়লেও তাদের সদর্থক ভূমিকা পালনে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। স্বাধীন মত প্রকাশ ও রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণে অনেক সময়ই পারিবারিক ও সামাজিক বাধার মুখে পড়তে হয়। তবে গোড়ার দিকে মহিলা প্রতিনিধিরা যতটা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মতামত মেনে কাজ করতেন, ক্রমে দেখা যায় যে প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। অনেক সময়েই মহিলা প্রতিনিধিরা জোরের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে পারছেন।

তৃণমূল স্তরে পঞ্চায়েত ও পুরসংস্থাগুলিতে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়লেও, সংসদ বা বিধান সভাগুলিতে কিন্তু তা বাড়েনি। সংসদ ও বিধান সভাগুলিতে নারীদের উপস্থিতির হার অত্যন্ত কম হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে নারী সংগঠনগুলি সেখানে আসন সংরক্ষণের দাবী তুলে এসেছেন। ১৯৯৬-এ লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৮১তম সংবিধান সংশোধন বিল লোকসভায় উত্থাপিত হয়। তবে আজ পর্যন্ত মহিলা সংরক্ষণ বিল সংসদে পাস করে আইনে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যথাযথভাবে নারীরা যুক্ত না হতে পারার বহুবিধ কারণ লক্ষ্য করা যায়।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় সমাজে ও রাজনীতিতে পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার আধিপত্য নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। যেখানে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়তা দেখা যায় সেখানে অনেক সময়েই তা পরিবারের পুরুষ সদস্যর সক্রিয় হতে না পারায় তার প্রতিনিধি হিসাবে বা তার হয়ে কাজ করার লক্ষ্যে। ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বক্রিয় পুরুষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে তার স্ত্রী বা কন্যাকে সক্রিয়ভাব রাজনীতিতে অংশ নিতে দেখা যায়, যেমন ইন্দিরা গান্ধী, সনিয়া গান্ধী, জয়ললিতা প্রমুখ নেত্রীরা। পিতা জওহরলাল নেহরুর হাত ধরে ইন্দিরা গান্ধীর প্রবেশ তাঁর পিতার অনুপস্থিতিতে অনেকটাই তাঁর

প্রতিচ্ছায়া হিসাবে সমর্থন অর্জন করতে ইন্দিরাকে সাহায্য করে। সনিয়া গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের নেত্রী হিসাবে উঠে আসেন রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিনীর ইমেজ্ নিয়ে। রাজ্য রাজনীতিতে তেমনই জয়ললিতার উত্থান এম. জি. রামচন্দ্রণের সঙ্গিনীর পরিচিতিতে ঘটে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের পরিচিতির আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হয়। এ ছাড়া যে মহিলারা রাজনীতিতে প্রবেশ করে তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই পরিবারের পুরুষদের সক্রিয় উৎসাহ দান বা অন্তত সমর্থন থাকায় তা সম্ভব হয়। বাড়ির পুরুষরা সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে সে বাড়ির মেয়ে, বোন বা স্ত্রীর সেই দলের রাজনীতি করার উৎসাহ দান করা হয় বা অনুমতি দেওয়া হয়। অন্য রাজনীতি নয়। অর্থাৎ নারীর রাজনীতিতে অংশ নেওয়া না নেওয়াটা অনেকটাই পুরুষের চাহিদা বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনুমোদন সাপেক্ষ।

সামাজিকভাবে অবদমিত হওয়ার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নারীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক হয়ে পরে। রাজনৈতিক দলগুলিতে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসাবে নিজেদের স্থান করে নিতে পারে না। বড় জোর নিচুতলার কর্মী হিসাবে থেকে যায়। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরের পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরনের প্রাবল্য মহিলা কর্মীদের দলের মধ্যে প্রান্তিক করে রাখে। ফলে জাতীয় রাজনীতিতে তারা সক্রিয় অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়।

নির্বাচনে প্রায়শই যে ব্যাপক হিংসা ও পেশি শক্তির ব্যবহার হয় তাতে অনেক সময়ই নারীরা অসহায় বোধ করে। পুরুষের তুলনায় শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ায় নারীরা সাধারণত এই হিংসা ও পেশি শক্তির রাজনীতি থেকে দুরত্ব বজায় রাখতে চায়। দুঃখজনকভাব রাজনীতি ও পেশি শক্তির রাজনীতি সমার্থক হয়ে যায়, যার ফলে মহিলারা অনেকেই রাজনীতিতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে ভীত হয়ে পড়ে।

উপরিউক্ত নানা কারণে এবং সংরক্ষিত আসন তৃণমূল স্তর ব্যতীত অন্য স্তরে না থাকায়, পুরুষদের সঙ্গে অ-সম প্রতিযোগিতায় নামার ব্যাপারে মেয়েদের আগ্রহ কমই দেখা যায়। আবার যে যে কারণে সংসদীয় রাজনীতিতে তাদের অনুপস্থিতি বা স্বল্প উপস্থিতি ঘটে তাদের সেই অনুপস্থিতি বা স্বল্প উপস্থিতি আবার সেই প্রতিকূলতার কারণগুলিকে জোরদার করে তোলে।

এর ফলের এক দিকে নারীদের সার্বিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাদের পক্ষে যথাযথভাবে সরকারের নীতি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয় না। নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও প্রভাব ঘটাতে অসুবিধা হয়। অন্যদিকে, ভারতের সার্বিক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ণ হয়। উন্নয়নের সঠিক পথ নির্ধারণ করতে হলে পদে পদে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত জানা ও বিবেচনা করা আবশ্যক। অথচ এক্ষেত্রে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। হয় পুরুষ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অথবা সরাসরি রাজনৈতিক পরিকাঠামোর বাইরে থেকে প্রভাব খাটাতে হয় বা চাপ সৃষ্টি করতে হয়। এ ছাড়াও মনে রাখা প্রয়োজন যে গণতন্ত্রের যথার্থ বিকাশের জন্য সর্বস্তরের মানুষের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাগ্রহে অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট অভাব লক্ষ করা যায়। গণতন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়।

তবে আশার আলো আছে। মহিলাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আরো বেশি জোরালো ও সংগঠিত হচ্ছে। বিশেষত ৭০-এর দশকের পর থেকে। ১৯৭০ ও ৮০-র দশক থেকে নানা অপ্রচলিত ক্ষেত্রে ও ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখা যায়। এক দিকে জয়প্রকাশ নারায়ণের সম্পূর্ণ বিপ্লবের ধারণা ভিত্তিক আন্দোলন, বামপন্থী দলগুলির সাম্যের দাবী, পরিবেশ রক্ষার জন্য চিপকোর মত আন্দোলন এবং অপর

দিকে উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করে চলা নারী আন্দোলন। এই সার্বিক পরিমণ্ডলে নারীদের সমস্যা ও দাবী-দাওয়া অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

৩.৫ সারসংক্ষেপ :

ভারতে নারীর অবস্থান সার্বিকভাবেই অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আজও নারীরা নানা দিক থেকে নিপীড়িত; নানা মাপকাঠিতে দেখলে দেখা যায় পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে থাকতে বাধ্য হওয়া দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী। রাজনীতির আঙিনাতে তারা প্রান্তিক। সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক হাজারো প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বাস্তব হল যে তারা রাজনীতির মূল স্রোত থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক ক্ষমতাশালী মহিলা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেও বাস্তব হল যে খুব কম সংখ্যক নারীই নির্বাচনে লড়বার সুযোগ পায় এবং অতি নগণ্য সংখ্যায় আইন সভাগুলিতে প্রবেশের অধিকার পায়। ফলে, আইনপ্রণয়নকারী হিসাবে নারীরা না পায় তাদের নিজেদের কথা বলার সুযোগ, না পায় গণতান্ত্রিক দেশের নীতিকে প্রভাবিত করার সুযোগ। এটি নারী জাতি এবং দেশ উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

তবে আশার বিষয় মহিলাদের সমস্যা সম্পর্কে তাদের নিজেদের সচেতনতা আজ অনেক বেড়েছে। গতানুগতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা শ্রেণি বিশ্লেষণের নিরিখে না দেখে মহিলাদের সমস্যাগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনার দাবী উঠছে। মহিলারা বিভিন্ন রাজ্যে তাদের সংগঠন গড়ে তুলছে। পত্র পত্রিকা প্রকাশ করে তার মাধ্যমে নিজেদের কথা বলছে। অনেক অপ্রচলিত ক্ষেত্রের আন্দোলনে তারা সাগ্রহে অংশগ্রহণও করছে। পঞ্চায়েত ও পৌর সংস্থাগুলিতে সংরক্ষিত আসনের সুযোগ পাওয়ায় তারা বড় সংখ্যায় সেই স্তরের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণও করতে পারছে। সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে সংরক্ষণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যায় প্রবেশের সুযোগের দাবীতে আজ তারা সরব। শুধুমাত্র প্রচারের জন্যই নয়, মহিলারা আজ সরকারের ক্ষমতার অলিন্দে এবং রাজনৈতিক দলগুলির নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছে।

৩.৬ নমুনা প্রশ্ন :

(ক) বড়ো প্রশ্ন :

(১) ভারতে নারীর সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(২) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের প্রান্তিকীকরণের কারণ বিশ্লেষণ করুন।

(৩) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না থাকার ফলাফল কী?

(খ) মাঝারি প্রশ্ন :

(১) ভারতীয় সাংবিধানিক আইনে নারীদের অবস্থা কেমন?

(২) টুওয়ার্ড্‌স্ ইকুয়ালিটি রিপোর্ট মহিলাদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষণের সুপারিশ কেন করেনি?

(৩) পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ কতটা সদর্থক হয়েছে?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) টুওয়ার্ড্‌স্ ইকুয়লিটি রিপোর্ট কবে প্রকাশিত হয়?

(২) আন্তর্জাতিক নারী দশক কবে উদ্‌যাপিত হয়?

(৩) পঞ্চায়েত ও পুরস্তরে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ কোন্ কোন্ সংবিধান সংশোধনী আইন দ্বারা চালু হয়।

৩.৬ গ্রন্থসূচি :

- Geraldine Forbes, *Women in Modern India.*
- Maitreyee Chaudhuri ed., *Feminism in India.*
- Nivedita Menon ed., *Gender and Politics in India.*
- Uma Chakravarti, *Gendering Caste : Through a Feminist Lens.*
- Promila Kapur ed., *Empowering the Indian Woman.*

একক ৪ ☐ আঞ্চলিকতাবাদ ও নৃ-কুল পরিচিতি

গঠন :

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা : ভারতের আঞ্চলিক চিন্তা-ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

৪.৩ আঞ্চলিক দাবী ও নতুন রাজ্য গঠন

৪.৪ জাতীয় রাজনীতি ও আঞ্চলিক দলের গুরুত্ব

৪.৫ আঞ্চলিক চিন্তা ও রাজনীতির নানা দিক

৪.৬ সারসংক্ষেপ

৪.৭ নমুনা প্রশ্ন

৪.৮ গ্রন্থসূচি

৪.১ উদ্দেশ্য :

এই এককটি পড়ে আমরা বুঝতে পারবো —

- ভারতে আঞ্চলিকতার উদ্ভবের কারণ
- নানা গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক আন্দোলনের কথা
- আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা
- আঞ্চলিকতার রাজনীতির নানা দিক।

৪.২ ভূমিকা : ভারতে আঞ্চলিক চিন্তা-ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত :

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা জাতি, জনজাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের বাস। ব্যাপক বৈচিত্র্য ভারতবর্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য আজকের নয়। তা সুদীর্ঘ অতীতের; এই অঞ্চলের সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। বিস্তীর্ণ এই স্থানে নানা সময়ে নানা দেশের মানুষ তাদের বসতি করেছে। তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে নানা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সংঘাত হয়েছে, কখনওবা মেলবন্ধন হয়েছে। আবার কখনওবা পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও স্থানীয়ভাবে মানুষ নিজস্ব পরিচয়কে পৃথক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কোথাও কোথাও তা জাতিসত্তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কোথও ভাষা, কোথাওবা স্থান বা নিজ ভূমির অনুভূতি প্রাধান্য পায়।

আঞ্চলিকতা একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রতি শুধু ভালবাসা বোঝায় না। এ ভালোবাসা অনেক সময়েই রাজ্যের সঙ্গে বা রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন না কোন প্রকারের সংঘাতের রূপ নেয়। আঞ্চলিক মানসিকতার

ফলে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক মানসিকতার মানুষরা মনে করেন তাঁদের ও তাঁদের অঞ্চলের স্বার্থ রাজ্য (যে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সেই অঞ্চল) ও কেন্দ্র অবহেলা করছে বা সরাসরিভাবে ক্ষুণ্ণ করছে। এই চিন্তা-ভাবনা থেকে আঞ্চলিক দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন গড়ে ওঠে। কখনও অহিংস কখনওবা স-হিংস। কখনওবা দুই ধরনের আন্দোলনই পাশাপাশি চলে। চিহ্নিত আঞ্চলিক এলাকার বাইরের মানুষ অথবা বাইরে থেকে আসা ঐ এলাকার মানুষের প্রতি বিদ্বেষের রূপ নেয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার সময়ে সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল nation-building বা জাতি গঠন ও ভারতের জাতি চেতনাকে সুসংহত করা। সবার মধ্যে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে সচেতনতা সৃষ্টি করা, ও সে বিষয়ে গর্ববোধ জাগিয়ে তোলা। নানা স্তরের খণ্ডিত আনুগত্যকে অতিক্রম করে জাতীয় আনুগত্যকে স্থান দেওয়াই ছিল প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে চোখ রেখে স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারাকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলে। একদিকে যেমন জাতীয় পরিচিতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গঠনের প্রয়াস চালানো হয়, অপরদিকে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠিকে যুক্ত রাখার প্রয়াস চলে। এ সবের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে 'Unity in diversity'-র ধারণা, অর্থাৎ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যর ধারণা।

সংবিধান রচনাকালে সংবিধান প্রনেতারা বিষয়টির দিকে দৃষ্টি রাখেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় নানা জনগোষ্ঠি ও অঞ্চলের স্বার্থের মেলবন্ধন ঘটানোর প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সংসদে দুটি কক্ষ গঠিত হয়। দ্বিতীয় কক্ষটিতে, তথা রাজ্য সভাতে, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব থাকে। তবে সে প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যাভিত্তিক হয়, রাজ্যগুলির সম প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নয়। ফলে, রাজ্য সভাতে বড় রাজ্য থেকে প্রতিনিধি সংখ্যা বেশি, ছোট রাজ্য থেকে কম দাঁড়ায়। এ ছাড়াও, মনে রাখা দরকার যে, যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয় তা ছিল স্পষ্টতই কেন্দ্র-প্রবণ। এখানে রাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্রের ক্ষমতা বেশি।

৪.৩ আঞ্চলিক দাবী ও নতুন রাজ্য গঠন :

স্বাধীনতার সময় থেকেই আঞ্চলিক অসন্তোষ ভারতের নানা স্থানে লক্ষ করা যায়।

স্বাধীনতার পর প্রথম দুই দশকে ভাষার সমস্যা, সব থেকে বড় আঞ্চলিক দাবীর কারণ দাঁড়ায়। সমস্যাটির প্রধানত দুটি দিক ছিল। প্রথমত, কেন্দ্রের সরকারি ভাষা নীতি নিয়ে বিরোধ। দ্বিতীয়ত, রাজ্যগুলির ভাষার ভিত্তিতে পূনর্গঠনের দাবী।

প্রথম সমস্যাটিকেই দেখা যাক। যদিও ভারতীয় সংবিধানে অনেকগুলি ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়, কেবলমাত্র হিন্দিই কেন্দ্রের সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ইংরাজির ব্যবহারকে চলতে দেওয়া হলেও তারপরে হিন্দি তার স্থান নেবে এমনটাই নির্ধারিত হয়। হিন্দির পক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল যে, ভারতে হিন্দি ভাষা-ভাষী মানুষের সংখ্যা সব থেকে বেশি, যদিও তাঁরা জন সংখ্যার হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নন।

তবে, হিন্দিকে এই প্রাধান্য দেওয়াটা অ-হিন্দি ভাষী অঞ্চলের মানুষের অসন্তোষের কারণ হয়ে ওঠে। বিশেষত, দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে এই অসন্তোষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও হিন্দি তথা কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

হিন্দিবিরোধী আন্দোলনের নেতারা প্রথমে হিন্দিকে কেন্দ্রীয় সরকারি ভাষা হিসাবে চালু করার সময় সীমা পিছিয়ে দেওয়ার দাবী রাখেন, পরে তাঁরা তাঁদের অবস্থান পরিবর্তন করেন ও হিন্দিকে কোন দিনই মানবেন না এমনটাই জানান। তাঁদের স্লোগান ছিল 'Hindi never, English ever'। অর্থাৎ হিন্দি কখনই

নয়, ইংরাজি চিরকাল। তামিল নাড়ুতে ডি. এম. কে ও তামিলনাড়ু স্টুডেন্টস্ এন্টি হিন্দি এজিটেশন কাউনসিল তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করে। ভাষা দাঙ্গা, আত্মাহুতি, হাজার হাজার মানুষের গ্রেপ্তার বরণ, জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস হওয়া ও পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এ আন্দোলন দ্রুত অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, পণ্ডিচেরী এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তবে সব জায়গায় তা অত তীব্র আকার ধারণ করে না। শেষপর্যন্ত, কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি লাগু করার বিষয়ে নমনীয় হওয়ায় আন্দোলনকারীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (প্রধান মন্ত্রী) ১৯৬৫-ত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ভাষা বিষয়ে জওহরলাল নেহরুর আশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করে বলেন, যতদিন মানুষের চাহিদা থাকবে ততদিন ইংরেজি বিকল্প ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে। সিদ্ধান্ত নেবেন অ-হিন্দি ভাষী মানুষরা। হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। পরে, ডিসেম্বর ১৯৬৭-এ Official Language Act (১৯৬৩) নেহরু ও শাস্ত্রীর আশ্বাস অন্তভুক্ত করে সংশোধন করা হয়। জাতীয় ভাষা সংক্রান্ত সমস্যার পুরোপুরি সমাধান না হলেও অন্তত কিছুটা উত্তেজনার প্রশমন হল।

জাতীয় ভাষার প্রশ্নটি কিন্তু একমাত্র সমস্যা ছিল না। ভাষাকে কেন্দ্র করেই ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের সীমানা নির্ধারণের দাবী ছিল অন্যতম গুরত্বপূর্ণ আঞ্চলিক দাবী। এই দাবীকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার পর থেকেই নানা জায়গায় আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখা যায়।

সংবিধান রচনার সময়েই ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করার বিষয়টি গণপরিষদে উঠে এসেছিল। ১৯৪৮-এ এস কে ধরের নেতৃত্বে Linguistic Provinces Commission গঠিত হয়। তবে এই কমিশন ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের সীমারেখা নির্ধারণ করার পক্ষে মত প্রকাশ কর না; মনে করে, তা জাতীয় সংহতির পরিপন্থী হবে ও প্রশাসনিক সমস্যারও সৃষ্টি করবে। ফলে, গণপরিষদ ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের নীতি গ্রহণ করে না। কিন্তু তার পক্ষে জোরালো দাবী থেকে যায়। বিশেষত দক্ষিণ ভারতে।

১৯৫৩-তে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সীমারেখার বিষয়টি তলিয়ে দেখার জন্য States Reorganization Commission (এস্-আর্-সি) গঠন করে। এই কমিশন দু-বছর পর, তথা ১৯৫৫-তে তার সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেয়। কমিশন তার রিপোর্ট-এ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবেচনা সাপেক্ষে, যতদূর সম্ভব ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন করার সুপারিশ করে। তবে বোম্বাই ও পাঞ্জাবের বিভাজনে আপত্তি জানায়।

এস. আর. সি.-র সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৬-এ সংসদ State Reorganization Act বা রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাস করে। এর ফলে চৌদ্দটি রাজ্য ও ছ'টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল গঠিত হয়। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না।

রাজ্য পুনর্গঠন আইনের বিরোধিতায় মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে ব্যাপক আন্দোলন হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬০-এ কেন্দ্রীয় সরকার বোম্বাই-কে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। মহারাষ্ট্র বোম্বাই শহরকে পায়। আর আহমেদাবাদ হয় গুজরাটের রাজধানী। আরো কিছু বছর পর পাঞ্জাবের বিভাজন হয় হিন্দি-ভাষী হরিয়াণা ও পাঞ্জাবী-ভাষী পাঞ্জাবের মধ্যে। এর সাথে সাথে বলা যায় যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের কাজ মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ হয়।

শুধু ভাষাকে কেন্দ্র করেই আঞ্চলিকতা সীমাবদ্ধ থাকেনি। জনজাতিগুলির আঞ্চলিক পরিচয়, পৃথক সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠির আঞ্চলিক দাবী— এ সব কিছুকে কেন্দ্রে রেখেও নানা স্থানে রাজনৈতিক অ-রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া, আন্দোলন ও সেগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগঠন গড়ে উঠতে দেখা যায়। একদিকে যেমন নিজেদের বঞ্চিত হওয়ার ধারণায় খেদ থাকে; অন্যদিকে অপরের অতিরিক্ত

সুযোগ সুবিধা পাওয়ায়, অন্তত তেমনটাই মনে হওয়ায়, ক্ষোভ থাকে। নানা ভাবে 'Sons of the Soil' বা 'ভূমিপুত্র'-র ধারণাটাও উঠে আসে।

ঝাড়খণ্ড ও ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলগুলিতে মূলত, জনজাতি-মানুষের অর্থনৈতিক ও পরিচিতিগত দাবী দাওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র আঞ্চলিক চেতনার উদ্ভব ঘটে। উন্নয়ন ও কন্যাণমূলক পরিসেবার অভাব স্বাধীনতার পর থেকেই এই সব মানুষের দীর্ঘদিনের অসন্তোষের কারণ। তারই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে স্ব-শাসনের দাবী। এই দাবী কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র-গঠনের দাবীর রূপ নেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবী ওঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার আন্দোলনকারীদের সময়ের সাথে সাথে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতেও দেখা যায়।

১৯৬০-এর দশকে অসমের মিজো পাহাড়ের জেলাগুলিতে স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবীতে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট তীব্র জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলে। শুধু অসম থেকে আলাদা হওয়া নয়। ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হওয়ার লক্ষ্যে তারা আন্দোলন চালায়। যদিও ভারত-চীন যুদ্ধের সময়ে (১৯৬২) ভারত সরকার এই সংগঠনকে বে-আইনি ঘোষণা করে, তবুও তাদের কার্যকলাপ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়। বরং মিজোদের আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ ধারণ করতে থাকে। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ভারত সরকার প্রথমে মিজোরামকে ইউনিয়ন টেরিটরি ও পরে রাজ্যের স্বীকৃতি দেয়। তবে, আন্দোলন স্তিমিত হলেও অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলত থাকে।

জনজাতি গোষ্ঠীর স্বাধিকারের আন্দোলন অসমের নাগা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকেও আলোড়িত করে। ১৯৫০-এর দশকে জাপো ফিজো-র নেতৃত্বে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল এই আন্দোলন সংগঠিত করে। ভারত থেকে পৃথক হওয়ার এই আন্দোলন স-হিংস রূপ নেয়। সরকার তরফে সেনা নামানো হয় এবং বহু নাগার মৃত্যু হয়। একাংশের নাগা নেতারা কিন্তু এই উগ্র আন্দোলনের বিরোধিতা করে সরকারের সঙ্গে রফা সূত্রের সন্ধানে আলোচনায় বসেন। এ সবের পর শেষ পর্যন্ত ১৯৬২-তে নাগাল্যান্ড পৃথক রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, ভারতের মধ্যেই থাকে।

পৃথক রাজ্য গঠিত হলেও নাগাদের মধ্যে ক্ষোভ থেকে যায়। নাগা বিপ্লবীরা গেরিলা আন্দোলনের পথ নেয়। ১৯৭০-র দশকের মাঝামাঝি এই আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। সেনা অভিযান এই আন্দোলন মোকাবিলায় যথাযথ সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে সরকারের সমঝোতায় আসার প্রচেষ্টাও খুব একটা সফল হয় না, ফলে নাগাদের অসন্তোষ, চোরা-গোপ্তা আক্রমণ, বিদেশী সহায়তা সংগঠিত করার প্রচেষ্টা— এসবের মধ্যেই অশান্তির আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলতে থাকে।

শিখ সম্প্রদায়ের স্বাধীন খালিস্থান রাজ্যের দাবী ভারতের স্বাধীনতার আগেই মাষ্টার তারা সিং-এর নেতৃত্বে উঠে এসেছিল। যদিও স্বাধীনতা উত্তর ভারতের অকালি দল শিখদের জন্য অধিক ক্ষমতার দাবী রাখে এবং রাজ্যগুলির অধিক ক্ষমতায়নের পক্ষে আন্দোলন চালায়, শিখদের ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রচেষ্টাকে সরাসরি সমর্থন জানায় না। তারা ভারতের মধ্যে শিখদের বাসভূমির দাবী করে। তবে শিখদের এক উগ্র অংশ স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের দাবীকে ধরে রাখেন। ভিন্ড্রেনওয়াল্-এর নেতৃত্বে ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় খালিস্থান আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সহিংস জঙ্গী আন্দোলনে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির জঙ্গীদের আস্তানা হয়ে ওঠে। কেন্দ্রের রণকৌশল Operation Bluestar (১৯৮৪) স্বর্ণমন্দিরের অভ্যন্তরে সামরিক অভিযান ও ভিন্ড্রেনওয়াল-এর মৃত্যু খালিস্থান আন্দোলনকে অনেকাংশে দমন করতে সক্ষম হলেও এর ফলে শিখ দেহরক্ষীদের হাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু হয়।

ভারতের মধ্যে থেকেও পৃথক রাজ্যের দাবী বিভিন্ন অঞ্চলকে উত্তাল করছে। দীর্ঘ আন্দোলনের

পরে, কিছু ক্ষেত্রে পৃথক রাজ্যের দাবী পূরণ হয়েছে। নতুন রাজ্য গড়ে উঠেছে। যথা, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়। ২০০০ সালে সৃষ্ট এই তিনটি রাজ্য যথাক্রমে বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ ভাগ করে বানানো হয়। এই প্রতিটি অঞ্চলই পিছিয়ে পড়া, জনজাতি অধ্যুসিত অঞ্চল ছিল, স্থানীয় মানুষের দীর্ঘ দিনের উন্নয়নের অপূর্ণ দাবী ছিল। এখানে ভাষাগত দাবী প্রাধান্য পায়নি, তবে সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও স্থানীয় ঐতিহ্য বর্তমান ছিল।

আঞ্চলিক চাপে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবী জোরালো হওয়ার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের দাবী। ১৯৬০-এর দশক থেকেই এই অঞ্চলে আন্দোলন সংগঠিত হয়। সরকারী আশ্বাসে কিছু দিনের জন্য স্তিমিত হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না। তেলেঙ্গানা অঞ্চলে অস্থিরতা থেকে যায়। ২০১০ থেকে আন্দোলন এতটাই তীব্র আকার ধারণ করে যে কেন্দ্রীয় সরকার তেলেঙ্গানাকে পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। এবং অবশেষে তেলেঙ্গানা পৃথক রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

তেলেঙ্গানার ক্ষেত্রে এটা লক্ষণীয় যে তেলেঙ্গানার মানুষ তেলেগু ভাষায় কথা বলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের অ-তেলেঙ্গানা অঞ্চলের সঙ্গে তার কোন ভাষা-গত বিরোধ নেই। পার্থক্য রয়েছে ইতিহাসের। তেলেঙ্গানা ছিল নিজাম-শাসিত হায়দ্রাবাদের অধীনে এবং রয়ালসীমা উপকূলীয় অন্ধ্র ছিল মাদ্রাস প্রেসিডেন্সির মধ্যে। আঞ্চলিক বিকাশ ও ইতিহাসের পার্থক্য অন্ধ্রকে বিভাজনের পথে ঠেলে দিয়েছে।

পৃথক রাজ্য গঠনের দাবীকে বাদ দিলেও দেখা যায় আঞ্চলিকতার প্রকাশ ঘটে আন্তঃরাজ্য বিবাদের মধ্য দিয়ে। নদীর জল বণ্টন, জলাধার নির্মাণ ও সীমানা সংক্রান্ত বিবাদ অ-শান্তির কারণ হয়ে ওঠে। তামিলনাড়ু-কর্ণাটক, কর্ণাটক-অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব-হরিয়ানা ও রাজস্থানের মধ্যে এই ধরনের সংঘাত দেখা গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা চালায় তবে তার ফলে আবার কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ক্ষোভের মুখে পড়ে।

কোন কোন অঞ্চলে বসবাসকারী ভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মানুষকে নানাভাবে উগ্র আঞ্চলিকতার শিকার হতে দেখা যায়। কখনও তাদের থাকার জায়গা পেতে অসুবিধা হয়। কখনও কাজ পেতে সমস্যা দেখা দেয়, কখনও-বা ব্যক্তি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক আবেগকে ইন্ধন দেয় নানা ধরনের রাজনৈতিক চাপান-উতোর। মহারাষ্ট্র, বিহার, অসম, তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের উগ্র অঞ্চলিকতার প্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে।

৪.৪ জাতীয় রাজনীতি ও আঞ্চলিক দলের গুরুত্ব :

১৯৬৭-র জাতীয় নির্বাচনের আগে অধিকাংশ রাজ্যে একই দল, তথা জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতায় থেকেছে ততদিন আঞ্চলিকতা কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদের রূপ নেয়নি। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব কম ছিল।

১৯৬৭-এর পর থেকে ছবিটা অনেকটাই পাল্টে যায়। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রে একক দল, কংগ্রেসের প্রাধান্য হ্রাস পাওয়া, জোট সরকার গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া, বিভিন্ন রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠিত হওয়ায় কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নতুন মাত্রা পায়। একক দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় অনেক সময়ে জোট সরকার গঠিত হয়। এমত অবস্থায় স্থায়িত্বের জন্য সরকারের অস্তিত্ব ছোট আঞ্চলিক দলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ক্রমে, দেখা যায়, বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতিতে ও জাতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থনের ভিৎ একান্তভাবে আঞ্চলিক হওয়ায়

তারা আঞ্চলিক দাবী-দাওয়া তুলে ধরায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। অনেক সময় অন্য রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে বা তাদের সঙ্গে সংঘাতে এসে এটা করে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথেও আঞ্চলিক দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়।

প্রধানত দুই ধরনের আঞ্চলিক দলের অস্তিত্ব আজ লক্ষ করা যায়। প্রথমত, দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বিভাজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কিছু দল আছে। যথা তামিল অঞ্চলের দলগুলি যেগুলি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই গঠিত হয়। এ ছাড়াও, অকালি দলের উল্লেখ করা যায় যেটি গুরুদ্বার আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯২০-এর দশকে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিককালে গড়ে ওঠা কিছু আঞ্চলিক দল আছে যেগুলি ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে বা তার পরে আত্মপ্রকাশ করে। স্থানীয় জাতিসত্তাগত পরিচিতিগুলির প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেস ক্রমেই ব্যর্থ হওয়ায় এইসব দলের উদ্ভব ঘটে। যেমন, তেলেগু দেশম্, অসম গণপরিষদ ও বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস থেকে ভেঙে যাওয়া স্থানীয় দল।

এখন ভারতের উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষা, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড ও ত্রিপুরায় অ-কংগ্রেস ও অ-বি.জে.পি মুখ্যমন্ত্রীরা আছেন। এঁরা সবাই বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের নেতা। এই দেখে আজকের ভারতে আঞ্চলিক দলগুলোর গুরুত্ব বোঝা যায়।

৪.৫ আঞ্চলিক চিন্তা ও রাজনীতির নানা দিক :

কোন একটি অঞ্চলের প্রতি ভালোবাসা থাকা বা আনুগত্য থাকা কোন অপরাধ নয়। তা দেশের সাংবিধানিক কাঠামোকে দুর্বল করে না। সমস্যা দাঁড়ায় যখন স্থানীয় আনুগত্য জাতীয় চেতনাকে অতিক্রম করে প্রাধান্য পায়, ভারতীয় নাগরিকত্বর দাবীকে পিছনে ফেলে আঞ্চলিক স্বার্থ গুরুত্ব পায়। সেখানেই আঞ্চলিক চেতনা ও রাজনীতি জাতীয় উন্নয়নের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় ও সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করে; এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের মানুষকে ঘৃণা করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক দলগুলির অস্তিত্ব আঞ্চলিক দাবী-দাওয়ার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়ক হতে পারে। রাজ্য, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু আঞ্চলিক দল তার ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য-পূরণে সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাকে ইন্ধন দিলে তা নিঃসন্দেহে বিপদজনক হয়ে ওঠে।

আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ আঞ্চলিক দল ভাষা, জনগোষ্ঠীগত দাবী, অর্থনৈতিক অবহেলার অভিযোগ প্রভৃতিকে সামনে রেখে তাদের আন্দোলন গড়ে তোলে। তবে সে আন্দোলনের মধ্যেও অস্থিরতা ও অস্থায়ীত্ব প্রায়শই দেখা যায়। কখনও একাধিক আঞ্চলিক দল মিশে গিয়ে একটি দলে পরিণত হতে দেখা যায়। কখনও-বা একটি আঞ্চলিক দলের মধ্যে এক, একাধিক বা ধারাবাহিক ভাঙন দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট আঞ্চলিক দলগুলি এক বা অপর বড় জাতীয় রাজনৈতিক দলের সাহচর্য খোঁজে। বলা বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হল, জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বাড়ানো ও আঞ্চলিক অবস্থান সুদৃঢ় করা।

৪.৬ সারসংক্ষেপ :

ভারতে অনেকাংশেই জাতি সত্তাকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে উঠেছে। তবে তা আঞ্চলিকতাবাদের

বিকাশের একমাত্র কারণ নয়। ভাষা, স্থানীয় উন্নয়নের প্রশ্ন জাতি পরিচিতি থেকে পৃথকভাবেই ক্রিয়াশীল থেকেছে। ভারতের জনগোষ্ঠীর ব্যাপক বৈচিত্র্যের মধ্যেই আঞ্চলিকতার শিকড় নিহিত আছে।

আঞ্চলিক চেতনাকে ভিত্তি করে আঞ্চলিক দল গড়ে ওঠে। আঞ্চলিক দাবী-দাওয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতির মধ্যে দিয়ে তারা স্থানীয় মানুষের সমর্থন অর্জনে সচেষ্ট থাকে। জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভিৎ সংকীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এই দলগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুধু স্থানীয় রাজনীতিতেই নয়। জাতীয় রাজনীতিতেও তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। জোট রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষত আঞ্চলিক দলের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অঞ্চল বা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় আঞ্চলিক দল ও আঞ্চলিক চেতনা সহায়ক হতে পারে। তবে, সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা গণতন্ত্র বিরোধী ও সংবিধান বিরোধী হয়ে উঠতে পারে যা ভারতবর্ষের জাতীয় শক্তির পরিপন্থী।

৪.৭ নমুনা প্রশ্ন :

(ক) বড়ো প্রশ্ন :

(১) ভারতে আঞ্চলিকতার উৎস ব্যাখ্যা করুন।

(২) ভারতে আঞ্চলিকতা থেকে উদ্ভূত সমস্যাদি বিশ্লেষণ করুন।

(৩) ভারতে জাতিসত্তা ভিত্তিক যে কোন দুটি আঞ্চলিক সমস্যা আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্ন :

(১) ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যপুনর্গঠনের দাবীর উপর একটি টীকা লিখুন।

(২) ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আঞ্চলিকতার প্রকাশের কোন একটি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(৩) আঞ্চলিক দলের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে লিখুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) এস. কে. ধরের নেতৃত্বে লিঙ্গুইস্টিক্ প্রভিন্সেস্ কমিশন কবে গঠিত হয়?

(২) স্টেট্স্ রি-অর্গানাইজেসন্ কমিশন কবে তার সুপারিশ জমা দেয়?

(৩) ঝাড়খণ্ড কবে পৃথক রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে?

৪.৮ গ্রন্থসূচি :

1. Myron Weiner, *Sons of the Soil : Migrations and Ethnic Conflict in India.*
2. Sajal Basu, *Regional Movements : Politics of Language, Ethnicity, Identity.*
3. Rob Jenkins (ed.), *Regional Reflections : Comparing Politics Across India's States.*

একক ১ ☐ শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন

১ (ক) শ্রমিক আন্দোলন :

গঠন :

১(ক).১ উদ্দেশ্য

১(ক).২ ভূমিকা

১(ক).৩ ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিক শ্রেণির সামগ্রিক চরিত্র

১(ক).৪ শ্রমিক সংগঠনের উদ্ভবের ইতিহাস

১(ক).৫ সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন ও স্বাধীনতা আন্দোলন

১(ক).৬ শ্রমিক সংগঠন ও বামপন্থী রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক

১(ক).৭ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক আন্দোলন

১(ক).৮ উপসংহার

১(ক).৯ নমুনা প্রশ্ন

১(ক).১০ গ্রন্থসূচি

১(ক).১ উদ্দেশ্য :

- ভারতে শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব কীভাবে ঘটেছে, তা জানা
- ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিক শ্রেণির চরিত্র বিশ্লেষণ করা
- শ্রমিক সংগঠনগুলির উদ্ভবের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা
- জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির ভূমিকা ব্যাখ্যা করা।
- শ্রমিক সংগঠন ও বামপন্থী আন্দোলনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা।
- স্বাধীনতা— উত্তর ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র ব্যাখ্যা করা

১(ক).২ ভূমিকা :

ভারতীয় রাজনীতির আলোচনায় শ্রমিক শ্রেণি, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এবং শিল্পে শ্রমিকদের সমস্যা কমবেশি গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও এই সমস্ত বেশির ভাগ আলোচনাতে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন বেশির

ভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত থেকেছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় যে যে শ্রমিক আন্দোলনগুলি সংগঠিতভাবে যে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস ঘটিয়েছিল তার মাধ্যমেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন তার চরম সাফল্যের মুহূর্তে পৌঁছাতে পেরেছিল। ১৮৫০-এর দশকে ভারতে রেল ব্যবস্থার গোড়াপত্তন এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প শ্রমিক শ্রেণির প্রাথমিক উন্মেষ ঘটায়। এর পরপরই চটকল, সুতাকল, চিনি ও সিমেন্ট কারখানার উদ্ভব এক বৃহৎ সংখ্যক শিল্প শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটায়। শ্রমিক শ্রেণির এই বিশেষ উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষি থেকে অনুমান করা যায় যে এক নবাগত শ্রেণি হিসেবে এরা প্রাগ্ ধনতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো থেকে আধুনিক শিল্পে প্রবেশ করেছিল এবং স্বভাবতই এদের প্রাথমিক যোগ ছিল সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার সাথে। দ্বিতীয়তঃ সাবেকী সমাজের জাত-পাত এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে এরা পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। জন্ম লগ্নের এই প্রাথমিক দুর্বলতা ঔপনিবেশিক আমলে এবং তার পরবর্তীকালেও ভারতের শ্রমিক শ্রেণির সংগঠন ও আন্দোলনে নানাবিধ দুর্বলতার উদ্রেক করেছে।

১(ক).৩ ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক চরিত্র :

প্রাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর ভারতের রাজনীতির আলোচনায় ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের আন্দোলনগুলি যথাযথ গুরুত্ব না পেলেও এটা স্বীকার করতেই হয় যে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে চলে আসা একটা দীর্ঘ যোগসূত্র রয়েছে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের আন্দোলনের। শ্রমিক শ্রেণী হল ভারতীয় রাজনৈতিক শক্তির সেই অচ্ছেদ্য অংশ যাকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে জোড়া হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে একটা নিষ্পত্তিমূলক চূড়ান্ত পরিণতি দেওয়ার লক্ষ্যে। কিন্তু ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম আন্দোলনের সূচনা কবে এবং কীভাবে হয়েছিল সেই প্রশ্নের গুরুত্ব ঐতিহাসিক। এ ক্ষেত্রে ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। পাশ্চাত্তে যেভাবে শিল্পবিপ্লব হয় ও ঐ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ অর্থনীতির ভিত্তি নির্মাণ হয় ও তার ক্রমবিকাশ ঘটে ভারতে সেই ধরনের কোন বিপ্লব ঘটেনি বা তা ঘটার সুযোগও ছিল না। ফলে ভারতে পাশ্চাত্যের ধারা অনুসরণ করে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন ঘটেনি। ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসার ও শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব এর দিক থেকে ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সময় ভীষণভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ব্রিটিশরা ভারতের সনাতনী অর্থনীতি ভেঙে চুরমার করে দেয় কিন্তু তার পরিবর্তে আধুনিক শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি প্রসারে এগিয়ে যায় নি। ভারতে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল ভিন্ন পথে। ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রক্রিয়ার সহযাত্রী ছিল এক বিশেষ ধরনের দৈন্য এবং তার পরিণামে ভারতীয়দের জীবনে দেখা দিয়েছিল অসীম দুঃখ দুর্দশা। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শোষনকে জোরদার ও স্থায়ী করার জন্য যা যা করেছিল তার পরিণতিতে বস্তুগতভাবে ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। এই প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ভারতে রেলপথ স্থাপন। ভারতে ১৮৫০-এর দশকে রেলওয়ে এবং তার সহযোগী কলকারখানা গড়ে ওঠে, আর তার পরে পরেই সূচনা হয় বস্ত্র শিল্প, ও তারপর পাট, চিনি, সিমেন্ট প্রভৃতি শিল্প। এই শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদন খরচ কমানো ও কম খরচে কাঁচামাল সংগ্রহ করা। বস্তুতঃ রেলপথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে ভারতে জন্ম হয় আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর এবং রেলপথ নির্মাণে যে শতশত ভারতীয় শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছিলেন তারাই ছিলেন ভারতে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রদূত।

১(ক).৪ শ্রমিক সংগঠনের উদ্ভবের ইতিহাস :

আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর জন্মের মধ্য দিয়ে ভারতের শিল্পাঞ্চলে একটা বৃহৎ কর্ম নির্বাহীশক্তির জন্ম হয়। ঐ শক্তির উৎস ছিল মূলত চরম দুর্দশা ও দারিদ্রগ্রস্থ গ্রামীন জনগণ। ঐ গ্রামীন জনগণরা ছিল কৃষি সত্ত্ব, ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি বিষয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশিক নীতির ফলে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্থ অংশ। ভারতের আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী হিসাবে ঐ দুর্দশাও দারিদ্র গ্রস্থ গ্রামীন জনগণের জন্ম থেকে এটা উপলব্ধি করা যায় যে অর্থনৈতিক বন্ধন, জমি ও কৃষিজাত বিষয়, জাত পরিচিতি এবং অন্যায্য বাঁধাদানকারী কাঠামোও মূল্যের দিক থেকে ঐ কর্ম নির্বাহীশক্তি কীভবে প্রাক্ পুঁজিবাদী সম্পর্কের সাথে বাঁধা ছিল। এক্ষেত্রে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই প্রাক্ ধনতান্ত্রিক ও উপনিবেশিক পরিবেশে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে নতুন সামাজিক শক্তি বা শ্রেণী হিসাবে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল তাতে ঐ শ্রেণী জন্মের সময় থেকেই দুর্বল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাজেই বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর যে উদ্ভব শুরু হয়েছিল এবং ক্রমান্বয়ে বিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আজ যে একটা পরিপূর্ণ শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে তার ইতিবৃত্ত ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক শাসকের স্বার্থ ভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে তার দায় অনুসরণের কর্মকাণ্ডের আলোকেই বুঝতে হবে।

১(ক).৫ সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন ও স্বাধীনতা আন্দোলন :

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম আধুনিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ১৯২০ সালে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের প্রথম জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে শ্রমিক শ্রেণী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের শোষণ লাঞ্ছনা বঞ্চনার প্রতিকারে একাধিক সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলে। মাদ্রাজ বোম্বাই আমেদাবাদের বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকরা, বাংলার পাট শিল্পের শ্রমিকরা এবং বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অংশের কয়লা খনির শ্রমিকরা জাত ও সম্প্রদায়গত বিভাজনকে অতিক্রম করে তাদের নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে ধর্মঘট সংগ্রাম গড়ে তোলে। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিবিদ যারা আবার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই ঐ ধর্মঘট সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতেন। ভারতে ১৮৮১ সালে প্রায় ৮১৩টি কারখানা ছিল যেখানে দৈনিক শ্রমিক হাজির ছিল ৩,৪৯,৮১০ জন। ১৯২১ সালে কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩৯৫৭টিতে ১৯৫০ সালে হয় ২২৭০৫টি এবং ১৯৯১ সালে হয় ১,১০,৭০৪টি। শ্রমিকের গড় দৈনিক হাজিরা ছিল ১৯২১ সালে ১২৬৩৬৫৮, তা ১৯৫০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২৫০৪৩৯৯ এবং ১৯৯১ সাল বেড়ে দাঁড়ায় ৫২১১৮২৯। এই বৃদ্ধি ২০০৪-০৫ সালে পৌঁছে যায় ৪৬০ মিলিয়নে। এই মোট শ্রমশক্তির মধ্যে ৭০ মিলিয়ান নিয়মিত হাজিরা আর বাকী ১৩০ মিলিয়ান শ্রমিক ছিল ক্যাজুয়াল বা অনিয়মিত ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক। মোট শ্রমশক্তির বাকী সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ অর্থাৎ ২৬০ মিলিয়ান শ্রমিক ছিল মূলত সামাজিক নিরাপত্তা হীন স্ব-নিযুক্ত শ্রমিক।

বোম্বাই মিলস-এর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী যার নাম এন. এম. লোখান্ডে তাঁর হাত ধরে ১৮৮০র দশকে ভারতের প্রথম শ্রমিক ইউনিয়ান হিসাবে বোম্বাই মিল হ্যান্ডস এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। লোখাণ্ডে বোম্বাই-এর ৯০৫০০ জন শ্রমিক স্বাক্ষরিত একটা স্মারক লিপি তৈরী করেন এবং 'দীনবন্ধু' নাম দিয়ে প্রথম শ্রমিকদের পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এজন্য লোখান্ডেকে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের 'চালক আত্মা' বা 'moving spirit' বলে গণ্য করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আনুষ্ঠানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত সংগঠন হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ান আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৫ সালে বোম্বাইয়ে বস্ত্রশিল্পে ধর্মঘটের সময় বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য বোম্বাই টেক্সটাইল লেবার ইউনিয়ান গড়ে তোলা হল। বস্ত্র শিল্পের বাইরের শ্রমিক, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজকর্মীরাও ঐ ইউনিয়ানে সামিল হয়েছিলেন এবং এন. এম যোশী ছিলেন ঐ সংগঠনের নেতা। ১৯২৪ সালে গিরনি কামগর মহামণ্ডল গড়ে ওঠে। শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলে গিরনি কামগর ইউনিয়ান গড়ে ওঠে।

১(ক).৬ শ্রমিক সংগঠন ও বামপন্থী রাজনীতির আন্তঃ সম্পর্ক :

উল্লেখ করা যায় যে, ১৯২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বোম্বাই-এর 'এম্পায়ার' থিয়েটার হলে সর্বপ্রথম সরা ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস বা All India Trade Union Congress (AITUC) নামে সর্ব ভারতীয় শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে। লালা লাজপৎ রাই ছিলেন এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি। শ্রমিক কর্মচারীদের এই সর্ব ভারতীয় সংগঠনের সাথে গিরনি কামগর ইউনিয়ানের যোগ ছিল। শ্রমিক সংগ্রাম আন্দোলনের সকল রাজনৈতিক মঞ্চ ও পথের সাধারণ মঞ্চ ছিল AITUC। কংগ্রেস নেতৃত্বের হাতে এই ট্রেড ইউনিয়ান সংগঠনটি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় সার্বিক দায়িত্ব ছিল। যাতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন বৈপ্লবিক আন্দোলনে রূপান্তরিত না হয় তা লক্ষ্য রাখতো কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই নেতৃত্ব শ্রমিকদের স্বাধীন বৈপ্লবিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সামিল করে ছিলেন কারণ তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিকে নিজেদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী স্বার্থানুযায়ী ব্যবহার করতে চান। তাই তারা ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনকে সংস্কার-এর পথে চালনা করতে উদ্যোগী ছিলেন। তারা শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী সমঝোতায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই নের্তৃত্বের উদ্দেশ্য ছিল বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনের পরিবর্তে পুঁজিপতি ও শ্রমিকে সহাবস্থান বজায় রেখে শ্রেণী সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা।

১(ক).৭ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক আন্দোলন :

কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা উভয়েই ক্রমশ AITUC তে সক্রিয় ও জোরাল হয়ে উঠছিল। তারা AITUC তে বৈপ্লবিকতা এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে এই সংগঠন ভারতীয় শ্রমিকদের শ্রেণী সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। সংগঠন ক্রমশই বাম মনোভাবাপন্ন বাম ঘেঁষা সংগঠনে রূপান্তরিত হচ্ছে উপলব্ধি করে কংগ্রেস নেতৃত্ব ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস (INTUC)

প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৭ সালে। স্বাধীনতা উত্তর কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহযোগী হিসাবে যে সকল ট্রেড ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠা হয় সেগুলি হল—

ট্রেড ইউনিয়ানের নাম	সহযোগী রাজনৈতিক	প্রতিষ্ঠাকাল
AITUC	সি. পি. আই	১৯২০
INTUC	জাতীয় কংগ্রেস	১৯৪৭
HMS	সমাজতন্ত্রী দল	১৯৪৮
UTUC	আর. এস. পি	১৯৫৯
BMS	জনসঙ্ঘ/ভারতীয় জনতা পার্টি	১৯৫৫
CITU	সিপিআই(এম)	১৯৭০

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত INTUC-র নামের মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে AITUC-র সর্বদলীয় প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি ঘটে। তারপর ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন রাজনৈতিক দল মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। শহরাঞ্চলের ভোটারদের নিজের রাজনৈতিক দলের অনুকূলে চালনা করা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার হাতিয়ার হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলি ট্রেড ইউনিয়ানকে ব্যবহার করা শুরু করে। অন্য দিকে ট্রেড ইউনিয়ানগুলি পথ দেখানোর পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাবের জোগানদার হিসাবে নেতৃত্ব ও কর্মীর ধারা বাহিক জোগানদার বলে রাজনৈতিক দল গুলির উপর নির্ভরশীল হয়। কোন একটি রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় স্তরের ট্রেড ইউনিয়ান হয়ে ওঠে রাজনৈতিক দলের ট্রেড ইউনিয়ান ফ্রন্ট। এর মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ানের সার্বিক রাজনীতিকরণের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে যায়। এই রাজনীতিকরণ একদিকে যেমন ভারতে ট্রেড ইউনিয়ান গুলিকে শক্তি জোগায় তেমনই দুর্বল বা পঙ্গু করে দেয়। এরফলে শ্রমিকদের নিজেদের মধ্য থেকে ধারাবাহিকভাবে নেতৃত্ব তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ-ও ট্রেড ইউনিয়ানে শ্রমিক স্বার্থকে আলাদা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আমরা রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়ানের সম্পর্কের দুটি দিক নির্দেশ করতে পারি। যথা— (১) নীতিগত সংযোগের ভিত্তিতে সম্পর্ক; (২) অনেক সময় দল ও ইউনিয়ানের একক সংবদ্ধতা ছিল সম্পর্কের ভিত্তি। এক্ষেত্রে CPI এবং AITUC-র সম্পর্ক স্পষ্টভাবে ঐ সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে যখন CPI একটি সংগ্রামী বৈপ্লবিক কৌশলের অনুসারী হয় তখন AITUC-ও ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনে বৈপ্লবিকতা দেখায়।

ভারতীয় রাজনীতিতে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কর্মসূচীর সক্রিয় হয়ে ওঠার সাপেক্ষ শ্রমিক আন্দোলন বা ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনেও অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিল্প কলকারখানায় ধর্মঘট পরিকল্পনা অথবা স্থানীয় শিল্পপতি ও উচ্চ পদস্থ কর্মীদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দলের সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া শুরু করেন। এই কাজে কমিউনিস্টদের কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়নি কারণ ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট দলের জন্মকাল থেকেই অনেক দলীয় সদস্য ট্রেড ইউনিয়ানের কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবেই যুক্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে মুজফ্‌ফর আহমেদ, জি হাসান প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। শ্রমিক ও কৃষক স্বার্থে কমিউনিস্টদের সক্রিয়তা ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। কলকাতা, বোম্বাই, লাহোরের মতো শিল্প প্রধান শহরে শ্রমিক

কৃষকদের গোষ্ঠী বা দল গড়ে ওঠে। এই রাজনৈতিক সক্রিয়তায় শ্রমিকদের সমস্যা, পুঁজিবাদী শোষণের স্বরূপ পুঁজি ও মজুরীর সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পায়। পরিণতি হিসাবে সাধারণ মানুষের মনে ঐ বিষয়গুলি রেখাপাত করে এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহ তৈরী হয়। এভাবে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক-কৃষক দলগুলি শ্রমিক-কৃষক ও শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর প্রভাব বিস্তারের কাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এই দলগুলির লক্ষ্য হয় শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষন। তারা জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপের জন্য এবং পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থনে দাবী জানায়। ১৯২৭ সাল নাগাদ ভারতে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের লক্ষ হিসাবে পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং পুঁজিবাদের সমাপ্তি ঘটিয়ে শ্রমিক কৃষকের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। আর এর পরবর্তী পর্যায়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা শুরু হয়।

ডাঙ্গে এবং বেন ব্রাডলির নেতৃত্বে বোম্বাই বস্ত্র শিল্প শ্রমিকরা গঠন করে গিরনি কামগর ইউনিয়ান, যাকে প্রথম ভারতীয় বৈপ্লবিক ট্রেড ইউনিয়ান বলা যায়। বোম্বাই-এ বস্ত্রশিল্পে একাধিক শ্রমিককে ছাঁটাই করা হলে গিরনি কামগর ইউনিয়ান প্রথম শ্রমিকদের নিয়ে একটা ব্যাপক ধর্মঘট সংগঠিত করে। ঐ ধর্মঘটের ফলে ছয়মাস ধরে প্রায় ২০ মিলিয়ন কর্ম দিবস নষ্ট হয়েছিল।

গিবনি কামগর ইউনিয়ানের ধর্মঘটের প্রভাব সমস্ত ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের উপর সার্বিকভাবে পরেছিল। কাজেই এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে শেষপর্যন্ত একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটি ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবীগুলি পর্যালোচনা করে এবং ঐ বঞ্চিত শ্রেণীর উপর আরোপ করা অসাম্যের অবসান ঘটায়। কাজেই এটা বলা যেতেই পারে যে এই আন্দোলন ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে গভীরভাবেই বৈপ্লবিক নানাধারায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিহারে ঝরিয়া AITUC সম্মেলনে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক ভারত গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী জমি ও শিল্পের জাতীয়করণের দাবী তোলা হয়। আর তার ফল হিসাবে দক্ষিণপন্থী শ্রমিক নেতৃত্ব ক্রমশই সংখ্যালঘু হয়ে পরে এবং শেষ পর্যন্ত তারা AITUC ত্যাগ করে। ঐ দক্ষিণ পন্থী নেতৃত্ব ও তাদের অল্পসংখ্যক সদস্য ভি। ভি। গিরি এবং এন. এম. যোশীর নের্তৃত্বে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ান ফেডারেশন গঠন করে। নাগপুর সম্মেলনে ১৯২৯ সালে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে AITUC ভাগ হয়ে যায়। কমিউনিস্ট রেলওয়ে শ্রমিক প্রতিনিধিরা AITUC-র পূর্ণ সদস্য হতে পারবে কিনা এই প্রশ্নের বিতর্কে কমিউনিস্টরা ইউনিয়ান ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। এমতাবস্থায় ১৯৩৯ সালে কলকাতা সম্মেলনে ইউনিয়ান আবার দ্বিতীয় বার ভাগ হয় এবং আরো দুর্বল হয়ে পরে। ১৯৩৫ সালে একটি লাল ট্রেড ইউনিয়ান কেন্দ্র গড়ে ওঠে। কিন্তু তা আবার কতকগুলি মৌলিক নীতির প্রশ্নে AITUC তে ফিরে আস। ঐ মৌলিক প্রশ্নগুলি হলো শ্রেণী সংগ্রামের নীতির স্বীকৃতি, প্রতি শিল্পে একটি করে ট্রেড ইউনিয়ান গঠন, আন্তর্জাতিক ফেডারেশনর সঙ্গে সংযুক্তিকরনের বিরোধিতা ইত্যাদি। আরো লক্ষ্যনীয় হল ভারতের শ্রমিক আন্দোলনগুলি বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে রক্ষণাত্মক ভূমিকা ধীরে ধীরে ত্যাগ করে বেতন বৃদ্ধির দাবী, কোম্পানীর দ্বারা ইউনিয়ানের স্বীকৃতির দাবী ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ইউনিয়ানগুলি সোচ্চার হয়। ফলে ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনই বাড়তে থাকে ধর্মঘটের সংখ্যা।

১৯৪২ সালে উপনিবেশিক শাসনে ব্রিটিশ শাসক দ্বারা স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একমাত্র রাজনৈতিক দল হল CPI। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে জয়ী হতে হলে কৌশলগতভাবে জাতীয় আন্দোলনে সামিল বিভিন্ন শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন বলে CPI মনে করতো।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো CPI আগস্ট প্রস্তাব বা August Resolution-এর বিরোধিতা করেছিল অথচ পাকিস্থান সৃষ্টির জন্য মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত 'লাহোর প্রস্তাব' Lahore Resolution সমর্থন করেছিল। CPI গান্ধীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী দমনমূলক ব্যবস্থার অবসান এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পুনর্বৈধকরণের দাবী জানায়। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সময় CPI দলের তত্ত্বাবধানে AITUC তার কার্যকলাপ আরো তীব্রতর করে। সার্বিক শ্রমিক অন্দোলন বৃদ্ধির সাথে সাথে তার রাজনৈতিক গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক লড়াই-এর সাথে শ্রমজীবীদের ছাত্র ও অন্যান্য সংগঠনের রাজনৈতিক বিক্ষোভের সংযুক্তিকরণ ঘটে। মাদ্রাজে এই সংগঠন ভারতের স্বাধীনতা তথা 'পূর্ণ' স্বরাজের দাবী জানায়। AITUC ১৯৪৫ সালের পর থেকে অনেক বেশী তীব্র ও সশস্ত্র আন্দোলনের পথ অবলম্বন করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে।

অর্থনৈতিক দাবী আদায়, বেতন বৃদ্ধির জন্য লড়াই ছাড়াও ১৯৪৮ সালের শ্রম আইন পালনের জন্য AITUC-র আন্দোলন ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের কার্যকলাপে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ঐ লড়াই অর্থাৎ শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক সংগ্রাম সাধারণ মানুষদের সমর্থন আদায় করতে সফল হয়েছিল। ফলে ১৯৫০ সালে বার্ষিক গড় ধর্মঘটের সংখ্যা পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। শ্রমজীবী জনগণ এমনকী উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার জন্য ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে CPI তীব্রভাবে গণ আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিল। তারা নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য মূল্য হ্রাস, নিম্নমুখী কর, বেতন বৃদ্ধি, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ইত্যাদির সমর্থনে জাতীয় স্তরে সার্বিক কর্মসূচী রূপায়নের দাবী জানায়। এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল CPI ভেঙে কিছু সদস্য ১৯৬৪ সালে CPI(M) নামে একটি নতুন দল তৈরী করে। ফলত পরবর্তী সময়ে ১৯৬৯ সালে AITUC ভেঙে যায় এবং Centre of Indian Trade Union (CITU) নামে একটি নতুন শ্রমিক সংগঠন সৃষ্টি হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৬৬ সালে একদিকে যখন সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক আন্দোলন তুঙ্গে তখন অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার পি. বি. গজেন্দ্রগাদকরের নেতৃত্বে একটি জাতীয় শ্রম কমিশন গঠন করার উদ্যোগ নেয়। ঐ কমিশন শ্রমিক সংগঠনের যৌথ দর কষাকষির অধিকার সুপারিশ করেছিল এবং ধর্মঘট ও লক আউটকে ঐ যৌথ দর কষাকষির অংশ বলে স্বীকার করেছিল। পাশাপাশি কমিশন ধর্মঘটের অধিকারের কিছু কাটছাট করার সুপারিশ জানায়, প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম পারিশ্রমিকের ধারণা ও কমিশন স্বীকার করে। শিল্প সংক্রান্ত সকল বিরোধ বিতর্ক মেটানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের শিল্প সম্পর্কীয় কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়। গত শতাব্দীর শেষ দিকে ন্যাশান্যাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট নেতৃত্বাধীন সরকার একটি নতুন শ্রমসংক্রান্ত জাতীয় কমিশন গঠন করেছিল।

স্বাধীনতাউত্তরকালে শ্রমিক আন্দোলনের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন বেশ কয়েক বার বিভাজনের সম্মুখীন হয়। কাজেই ঐ বিভাজনের কারণ যাই হোক না কেন তা শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠিত শক্তিকে যথেষ্ট দুর্বল করে দেয়। আবার দেশের অর্থনৈতিক সংকট বাড়তে থাকায় অন্যান্য পুঁজিবাদী সরকারের মতোই ভারত সরকারও সংকটের বোঝা শ্রমিকদের উপরই চাপাবার চেষ্টা করে। এই সময় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বেতন সংকোচন এবং ভারত রক্ষা আইন, সংবিধানের ৩১১(২) বি ও সি ধারা ইত্যাদির প্রয়োগ দ্বারা দমনমূলক ব্যবস্থাই শুধু নয়, জরুরী অবস্থা জারি করে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার স্থগিত করে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীকে ধর্মঘট সহ নানা কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। এই সময় অবস্থার চাপে দমননীতি ও আক্রমনের মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ানের

মধ্যে একটা প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে। INTUC কে বাদ দিয়ে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ানগুলি এক যৌথ মোর্চা গড়ার চেষ্টা চালায়। অবশ্য ঐ মোর্চা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের পর্যালোচনায় এটাও লক্ষ্যণীয় যে শ্রমিকরা মূলত অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া নিয়ে একাধিক ধর্মঘট করলেও কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়েও লড়াই করেছে। যেমন ১৯৪৮ ও ১৯৭৪ সালের রেল ধর্মঘট। বা ১৯৭০ ও আশির দশকে বোম্বাই ও আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক সংগ্রাম এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশকে পাট ও খনি শিল্পের শ্রমিকদের দীর্ঘ দিন ধরে চলা তীব্র সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের সংগঠিত শ্রমিকবাহিনী একদিকে মালিকপক্ষের মুনাফালোভী উচ্চাশাকে প্রতিরোধ করতে পেরেছে, অন্যদিকে রাষ্ট্র ও পুঁজি উভয়ক্ষেত্রেই দড় কষাকষির শক্তি বৃদ্ধি করতে পেয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর দাবী দাওয়া তুলে ধরার জন্যই ক্রমেই ট্রেড ইউনিয়ানগুলি স্বার্থগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু শ্রমিকদের শ্রেণী সচেতন করে তুলতে বা উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায় শ্রমিককের রাজনৈতিক ভূমিকা বিষয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ১৯৭৪ সালের রেল ধর্মঘট পর্যালোচনা করে স্টিফেন শেরলিওক বলেন, যে ঐ ধর্মঘটে রেলশ্রমিকদের রাজনৈতিক পার্থক্য ও আনুগত্য অতিক্রম করে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে। সংগঠিত শ্রমিক বাহিনীকে উপেক্ষা করা মালিক বা সরকার কারো পক্ষেই সম্ভব নয় বা শ্রম সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শ্রমিকদের মতামতকে মূল্য দেওয়া প্রয়োজন সে কথা ধর্মঘটী রেল শ্রমিকরা বোঝাতে পেরেছিল। কিন্তু এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে পুঁজিবাদী সমাজে ট্রেড ইউনিয়ানের আপাত বিরোধী চরিত্রও ঐ ধর্মঘটের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। শ্রমিক ও পুঁজির মধ্যে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে ইউনিয়ানগুলো সব সময়ই শ্রমিক আন্দোলকে পুঁজিবাদের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন একটা সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায় এবং কখনোই শ্রমিক আন্দোলনকে চরমে পৌঁছতে দেয়না। ট্রেড ইউনিয়ানের অধিকাংশ পদাধিকারীই বহিরাগত রাজনীতিবিদ। ফলে অনেক সময়ই শ্রমিক আন্দোলনের নামে তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ পুরণের দিকে নজর দেয়। এমনকী শ্রমিক বিরোধী এমন বিষয়কেও তুলে ধরে, এরফলে ইউনিয়ানগুলোর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। ইউনিয়ানের উপর শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই আস্থা হ্রাস পায়। ১৯৯০-এর দশকের পরবর্তী পর্বে বিশ্বায়নের সূচনা পর্বে ভারতে ট্রেড ইউনিয়ানের এটা প্রকৃত চিত্র।

১(ক).৮ উপসংহার :

গত শতাব্দীর শেষ দিকে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ান এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক সরকার সমূহের পতন এবং সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্য এবং এককেন্দ্রিকতার ফলে যে বিপর্যয়কারী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে প্রগতিশীল ও বামপন্থী শক্তিসমূহ এবং শ্রমিক আন্দোলনের উপর অনিবার্যভাবেই তার প্রভাব পড়েছে। এই পর্বের শ্রমিক আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র, এবং নানা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তার অগ্রগতি, গভীর অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে। এই ট্রেড ইউনিয়ানগুলিকে যেমন শ্রমিক স্বার্থে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে হয় তেমনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য, জাতপাত বিভাজনের, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদের বিরোধীতায় শিক্ষার অভিযানও চালাতে হয়। সমগ্র পৃথিবী আজ একটা অত্যন্ত কঠোর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ধনতন্ত্রের অক্ষমতা স্পষ্ট হয়েগিয়েছে। ধনতন্ত্র শ্রমিক শ্রেণীর উপর শোষণকে তীব্র করেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। তাই ভারতের ট্রেড ইউনিয়ান

আন্দোলনে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন। যাতে বিশ্বায়নের প্রভাবে শ্রমিক আন্দোলনে যে দিশাহারা অবস্থা তৈরী হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠা যায়। ট্রেড ইউনিয়ানকে অক্ষত রাখা এবং অবক্ষয়ও দিশেহারা ভাব থেকে আত্মরক্ষার সংগ্রামে জয়ী হওয়া বর্তমান অবস্থায় শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য।

১(ক).৯ নমুনা প্রশ্ন :

১। বড়ো প্রশ্ন :

(ক) ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

(খ) ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করুন।

২। মাঝারি প্রশ্ন :

(ক) প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের স্বরূপ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

(খ) বিশ্বায়ন পর্বে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) স্বাধীনতাত্তোর ভারতে শ্রমিক আন্দোলন কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়?

(খ) ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব নির্দেশ করুন।

১(ক).১০ গ্রন্থসূচি :

1. Jaffrelot (সম্পা:) : *India since 1950*, Yatra Books, New Delhi, 2012, Chap-XX.
2. Ghan Shyam Shah (সম্পা:) : *Social Movements and the State*, Sage, New Delhi, 2002, Chap-8.
3. Rakhahari Chatterji (সম্পা:) : *Politics India*, South Asian Publishers, New Delhi, 2001, Chap-9.
4. Rakhahari Chatterji : *Unions, Politics and the State*, South Asian Publishers, New Delhi, 1980.
5. E.A. Rama Swamy and Uma Rama Swamy : *Industry and Labour*, OUP, New Delhi, 1981.
6. সুকোমল সেন : *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস* (১৮৩০-১৯৯০), এন.বি.এ, কলকাতা, ১৯৯৫।

একক ১ ☐ শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন

১ (খ) : কৃষক আন্দোলন :

গঠন :

১(খ).১ উদ্দেশ্য
১(খ).২ ভূমিকা
১(খ).৩ ভারতের কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্ব
১(খ).৪ কৃষকের শ্রেণি বা বর্গ বিভাজন
১(খ).৫ ভূমিব্যবস্থা ও প্রজাস্বত্ব
১(খ).৬ ভারতের কৃষক আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য
১(খ).৭ তেলেঙ্গানা ও তেভাগা আন্দোলনের স্বরূপ
১(খ).৮ ১৯৬০-৭০ দশকের কৃষক আন্দোলন
১(খ).৯ নব্যকৃষক আন্দোলন
১(খ).১০ উপসংহার
১(খ).১১ নমুনা প্রশ্ন
১(খ).১২ গ্রন্থসূচি

১(খ).১ উদ্দেশ্য :

- সাধারণভাবে কৃষক আন্দোলনের চরিত্র ব্যাখ্যা করা
- ভারতে কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্ব বিশ্লেষণ করা
- স্বাধীনতাউত্তর ভারতে কৃষকসমাজের শ্রেণি বা বর্গ বিভাজন করা
- ভূমিব্যবস্থা ও প্রজাস্বত্বের বিশ্লেষণ করা
- ভারতে কৃষক আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা
- তেলেঙ্গানা ও তেভাগা আন্দোলনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা
- ভূমিসংস্কার, খেতমজুরদের মজুরী বৃদ্ধি ও কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূলের দাবীতে কৃষক আন্দোলন পর্যালোচনা করা

- নক্সাল বাড়ির কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারাগুলি অনুধাবন করা।
- নয়া-কৃষক আন্দোলনের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করা।

১(খ).২ ভূমিকা :

দুই শতকেরও বেশি সময় ব্যাপী কৃষক আন্দোলন ভারতবর্ষের চলমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিরাজমান। এমনকি স্বাধীনতার ৬০ বছর পরেও এবং শিল্প বিকাশের সরকারী ও বেসরকারী নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও, দেশের মোট জনসংখ্যার ৭০ ভাগ এখনও ভারতের গ্রামাঞ্চলেই বসবাস করেন মুখ্যত কৃষিজীবী হিসেবে। কৃষি কার্যেই ভারতের সংখ্যাধিক্য মানুষ আজও নিয়োজিত আছেন কিংবা থাকতে বাধ্য হচ্ছেন যদিও মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অংশ বিগত কয়েক দশকে ক্রমহ্রাসমান।

১(খ).৩ ভারতের কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্ব :

ভারতের কৃষক আন্দোলনকে ঐতিহাসিকভাবে তিনটি পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) প্রাক্ উপনিবেশিক পর্বের কৃষক আন্দোলন, (খ) ঔপনিবেশিক পর্বের কৃষক আন্দোলন, এবং (গ) স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বের কৃষক আন্দোলন।

প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বের কৃষক আন্দোলন : এই পর্বের কৃষক আন্দোলনগুলির প্রকৃতি ছিল স্থানীয়, জাত ও সম্প্রদায় ভিত্তিক। স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাধারণতঃ ধর্মীয় আবেদনের সাথে মিশ্রিত। আবার আদিবাসীদের মধ্যে সনাতনী হাতিয়ারের সাহায্যে বিদেশী লুঠেরাদের হাত থেকে বন ও বনজ সম্পদ রক্ষা করার বহু পুরাতন ঐতিহ্য রয়েছে। বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তিপ্রিয় আদিবাসীরা নিজের সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মহিলাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদার বিষয়ে অতন্ত সজাগ। প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বে ওয়াহাবি ও ফারিজি আন্দোলনের উল্লেখ করা প্রয়োজন যা কৃষকের পেশাগত ও সম্প্রদায়গত অধিকারকে আন্দোলনের বিষয় নির্ধারণ করেছিল। ভারতের ধ্রুপদী কৃষক আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী ও ঐতিহাসিকদের উদ্ঘাটনের অনেক আগেই তিতুমীর-সিধো-কানহো, বিরসা মুণ্ডা নিজের সম্প্রদায়ের কাছে বীরের সম্মানে পুজিত হয়েছে। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন ও শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর্যায়ে ঔপনিবেশিক ইতিহাসকার ও নৃতাত্ত্বিকরা প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বের ও ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুর দিকের বিদ্রোহগুলিকে কৃষকের মর্মপীড়া বর্জিত কিছু যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের স্থানীয় দ্বন্দ্বের প্রকাশ বলে গণ্য করেছিলেন। মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ স্থানীয় উচ্ছেদ সমস্যা বা ধর্মীয় বিদ্রোহের কারণ গণ্য করা হয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপে তার প্রতিকার বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহ কৃষকদের ক্ষোভের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশের নমুনা বলা যায়। প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বের কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে ভূস্বামী বা শোষক বিরোধী মনোভাব যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। ঐ আন্দোলনগুলি ছিল শোষিত কৃষকদের ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ যার কোন বিধিবদ্ধ সংগঠন বা কোন সুগঠিত নীতি এবং নেতৃত্ব কোনটাই ছিল না। এই বিদ্রোহগুলি ক্ষণস্থায়ী হলেও সেগুলিতে কৃষকদের অংশগ্রহণ ছিল যথেষ্ট ব্যাপক। অর্থনৈতিক শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঐ বিদ্রোহে রাজনৈতিক

প্রতিরোধ গড়ে উঠতে লক্ষ্য করা গিয়েছে। ঐ বিদ্রোহগুলি অত্যন্ত অমানবিকভাবে এবং নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। তবে কৃষকদের দাবী প্রশাসকরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেনি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার মূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে।

ঔপনিবেশিক পর্বের কৃষক আন্দোলন : ঔপনিবেশিক ভূমিনীতির মাধ্যমে ১৭৯৩ সালে পূর্ব ভারতে 'জমিদারী ব্যবস্থা' এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে 'রায়তওয়ারী ব্যবস্থা'-র পত্তন হয়। ঔপনিবেশিক ভূমিনীতির মাধ্যমে ভারতে ভূ-স্বামী ও ভূমিহীন-এর মেরুকরণ-এর সূত্রপাত ঘটে। কৃষকদের একটা বড় অংশ মালিকানাহীন অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়। আর জমিদাররা পরজীবী শ্রেণী হিসাবে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার পায়। বিনিময়ে ঔপনিবেশিক শাসকের উপর অগাধ অপাড় আনুগত্য ও প্রকৃত চাষীর থেকে আদায় করা খাজনার বেশীর ভাগটাই তুলে দিত। এই অবস্থায় প্রকৃত চাষীর জীবনে অর্থনৈতিক এবং অর্থ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। আর তারই চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে জমির উপর দখল অধিকার থাকা বা না থাকা দু-ধরনের প্রকৃত চাষী-ই ভূস্বামী ও ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি পেতে তাদের যমজ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করে।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও জমিদারদের প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার সাপেক্ষে কৃষক বিদ্রোহ ও আন্দোলনগুলি শান্তিপূর্ণ ও হিংসাত্মক উভয় প্রকারেই ছিল। প্রথম দিকে রাজনৈতিক সফলতা বা সক্রিয়তার কৌশল হিসাবে 'সকল কৃষকের ঐক্য' শ্লোগানের সাহায্যে সব স্তরের কৃষককে আন্দোলনে সামিল করার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। ঐ আন্দোলনে আক্রমণের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দেশীয় সহযোগী সুবিধাভোগী জমিদারকুল। ঐ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য দাবীগুলি ছিল— প্রকৃত চাষীর জমির উপর অধিকার, উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য অংশীদারিত্ব।

ভারতের ঔপনিবেশিক পর্বের কৃষক আন্দোলনের আলোচনায় লক্ষ্যণীয় বিষয় হল অহিংসার শাশ্বত পূজারী মহাত্মাগান্ধী এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষক কমিউনিস্টরা উভয়েই ১৯২০ দশকের সময় থেকে ভারতীয় কৃষকদের অভাব অসন্তোষ সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে ওঠে। কৃষকদের দাবী সম্পর্কে উভয়ে সহমত পোষণ করলেও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ বা সংগ্রামের পথ নির্বাচনে উভয়ে একমত ছিলেন না। গান্ধীজী জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলি শক্তিশালী করতে আন্দোলন কর্মসূচীতে কৃষকদের সামিল করার উপর জোর দিতেন। অন্যদিকে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহিত ভারতীয় মার্কসবাদীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সীমানা অতিক্রম করে কৃষকদের বৈপ্লবিক সামর্থ বৃদ্ধির উপর জোর দিতেন। এক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের উল্লেখযোগ্য দাবীগুলি ছিল, প্রকৃত চাষীদের মধ্যে চাষযোগ্য জমির মালিকানা বণ্টন, জমিদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটানো, ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদীও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ নিপীড়ন থেকে কৃষকদের মুক্ত করা, ইত্যাদি। মার্কসবাদীরা জানান জমির মালিকানায় উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য অংশ জমিদাররা স্বেচ্ছায় হস্তান্তর করার বিরোধী বলেই জমিদার-জোতদার-ভূস্বামীদের সাথে মালিকানাহীন কৃষকের বিরোধ বা জমি ও উৎপন্ন শস্যের জবর দখল অনিবার্য।

গান্ধীজী গ্রামভিত্তিক অর্থনীতির সমর্থক ছিলেন তাই স্বাভাবিকভাবেই শোষনমূলক ঔপনিবেশিক ভূমি নীতির ফলে কৃষকদের দুর্দশাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মোকাবিলা করার উদ্যোগ নেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস অনেকগুলি কৃষক কমিটি গঠন করে এবং কৃষকের স্বার্থে স্থানীয় স্তরে কিছু আন্দোলন সংগঠিত করে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, চম্পারণ

সত্যাগ্রহ (১৯১৭), খেদা আন্দোলন (১৯১৮), বরদৌলি কৃষক বিদ্রোহ (১৯২৮) ইত্যাদি। কৃষকদের যুক্ত করার মাধ্যমে গান্ধীজী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে সফল হয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কৃষকদের সামিল করলেও তিনি ছিলেন নিয়ন্ত্রিত গণ অংশ গ্রহণের পক্ষপাতী। তিনি সজাগ ও সক্রিয় ছিলেন যাতে ঐ আন্দোলনগুলি শ্রেণী সংগ্রামের আকার ধারণ না করে। গান্ধীজী কৃষকদের অবস্থার উন্নতি এবং জমিদারদের সাথে কৃষকের সু-সম্পর্কের পক্ষপাতি ছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মূল কারণ জমির মালিকানার পরিবর্তন বা ভূমিসম্পর্কের পরিবর্তন তিনি দাবী করেন নি। তবে একটা বিষয় স্বীকার করতেই হয় যে গান্ধীজী কৃষকদের স্থানীয় বা আঞ্চলিক বিষয়সমূহ এবং দাবীদাওয়াগুলিকে সর্ব ভারতীয় রাজনীতির স্তরে উন্নীত করেছিলেন।

১(খ).৪ কৃষকের শ্রেণি বা বর্গ বিভাজন :

গ্রামীন মানুষদের প্রত্যক্ষভাবে কৃষি উৎপাদনে যুক্ত না থাকা মালিক এবং মালিকানাহীন ভাবে সরাসরি কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত চাষী— এই দুই শ্রেণীতে বিভাজনের কথা বলা হলেও বাস্তবে ভারতে গ্রামে শ্রেণী বিভাজনের প্রকৃতি যথেষ্টই জটিল। বিভিন্ন ধরনের প্রজাসত্ত্ব অধিকার ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জমি মালিকানার কারণে গ্রামীণ কৃষকরা নানা স্তরে বিভক্ত। ড্যানিয়েল থোরনারকে অনুসরণ করে 'মালিক', 'কিষান' ও 'মজদুর'—এই তিন শ্রেণীতে গ্রামীন কৃষকদের ভাগ করা যায়। তবে ঐ শ্রেণীবিভাজনের প্রকৃতি বিচার করলে, ভারতের কৃষকদের শ্রেণীবিভাজনের কোন নির্দিষ্ট আকার পেশ করা যায় না। জমির সাথে কৃষকদের সম্পর্কের বৈচিত্র্য শ্রেণীবিভাজনের প্রধান কারণ। জমির সাথে সম্পর্কের সাপেক্ষে কৃষকরা কখনো ক্ষুদ্র চাষী, কখনো অপরের জমিতে চাষ করা ভাগচাষী, কখনো ক্ষেতমজুর। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন ঔপনিবেশিক শাসকরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্রজাস্বত্ত্ব অধিকার আইন প্রণয়ন করা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে স্বাধীতা পর্যন্ত প্রায় ষাট বছরের বেশি সময় ধরে ভাগ চাষীরা জমির উপর তাদের অধিকার-এর দাবীর লড়াই জারি রেখেছে। আবার লাঙল স্পর্শ না করা জমিদার ভুস্বামীর ইচ্ছায় অনেক সময় ভাগচাষীর চাষে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

১(খ).৫ ভূমি ব্যবস্থা ও প্রজাস্বত্ব :

সমাজ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের অনেকের অভিমত ঔপনিবেশিক শাসকদের থেকে জমির সামাজিক বণ্টন বা ভূমি ব্যবস্থার যে ধরন উত্তরাধিকাররূপে স্বাধীন ভারতের গ্রামের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা ভারতের কৃষি ক্ষেত্রের অনগ্রসরতার একটা বড় কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের পূর্ব ভারত ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর অঞ্চলে জমির মালিকানায় জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। সময়ের সাথে সাথে মূল জমিদারী তালুক ছোট ছোট অংশে ভেঙে না গিয়ে মুষ্টিমেয় অনুপস্থিত বৃহৎ ভূস্বামীদের কুক্ষিগত হয়। যারা স্বল্প খাজনার বিনিময়ে মালিকানা ভোগ করতো আর মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সাহায্যে চাষ-আবাদের কার্য সমাধা করতো। অন্য দিকে প্রকৃত চাষীরা ছিল ক্ষুদ্র চাষী, তারা মধ্যস্বত্ব ভোগীদের রাজস্ব দিত ও তাদের অন্যায় দাবীর ভারে ভারাক্রান্ত থাকতো। কিন্তু এক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের কবল থেকে প্রকৃত চাষীদের নিরাপত্তা দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে প্রকৃত চাষী ও রায়তদের সাথে সরাসরি ভূমি রাজস্বের বন্দোবস্ত করে তবে তাদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর উচ্চ হারে রাজস্ব দিতে হতো। আপাতভাবে ঐ রায়তওয়ারী ব্যবস্থা সমতাবাদী বলে মনে হলেও গ্রামের মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী ও প্রত্যক্ষভাবে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত নয় এমন মালিকদের হাতে জমির কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়ে ঐ ব্যবস্থার অবসান ঘটে। এক্ষেত্রে ঐ প্রভাবশালী মালিকরাই রাজস্বের বিনিময়ে চাষের অধিকার প্রদান করতো।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'মাহালওয়ারী' নামে একটি 'সংকর' প্রকৃতির ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় সমগ্রভাবে গ্রাম সম্প্রদায় ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করতো আর প্রতিটি চাষী তার ব্যক্তিগত দখলের অংশভাগ অনুযায়ী রাজস্ব প্রদান করতো। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে রায়তওয়ারী ব্যবস্থার মতোই মাহালওয়ারী ব্যবস্থাতেও জমির বণ্টন হয়ে পড়ে ভীষণভাবে বৈষম্যমূলক।

ঐ বিশ্লেষণের থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তন করা বিভিন্ন প্রজাসত্ত্ব ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কৃষক ধারাবাহিকভাবে শোষণ ও পীড়নের শিকার হয়েছে। তার উপর জাতপাতের ভেদাভেদজনিত কারণে অস্পৃশ্য ও নিম্নজাত ভুক্ত ক্ষুদ্র চাষীদের অবস্থা আরো দুর্বিসহ করে তুলেছিল। দেশীয় জমিদার ভূস্বামী ও ঔপনিবেশিক শাসক উভয়ের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ সংগ্রামী কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঐ ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকের প্রতিরোধী মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছিল। বিপুল সংখ্যক কৃষককে আন্দোলনে সামিল করা ছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী কৃষক আন্দোলনগুলির বড় রাজনৈতিক সাফল্য। কিন্তু গান্ধী কখনোই ঐ সংগ্রামকে শ্রেণী সংগ্রামের স্তরে নিয়ে যেতে চাননি। তিনি গ্রামের ধনী ও উচ্চজাতভুক্ত ভূস্বামীদের চূড়ান্ত বিরোধিতার পর্যায়ে কৃষক আন্দোলনকে নিয়ে যেতে চাননি। অন্যদিকে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন কৃষক সংগ্রামগুলিতে গ্রামের দরিদ্র চাষী, দলিত ও ভূমিহীন চাষীর দাবী-দাওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। কমিউনিস্টদের নের্তৃত্বাধীন কৃষক আন্দোলনগুলিতে যে দাবীগুলি আন্দোলন সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিল সেগুলি হল— পরজীবীয় জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপ, প্রকৃত চাষীর জমির উপর অধিকার, মালিকানাহীন চাষীদের উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য অংশের অধিকার, ভাগচাষীর অধিকার, কৃষি মজুরের ন্যায্য মজুরীর অধিকার ইত্যাদি।

১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে সারা ভারত কৃষক সভা সংগঠিত দুটি বৃহৎ কৃষক আন্দোলন দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতকে আন্দোলিত করেছিল। একটি ছিল উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশের উপর ভাগচাষীর অধিকারের দাবীতে অবিভক্ত বাংলার ভাগচাষীদের তেভাগা আন্দোলন এবং দ্বিতীয়টি সামন্ততন্ত্র, দেশমুখ জায়গীরদারদের নিষ্ঠুর শোষণ এবং ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজাম শাসনাধীন হায়দ্রাবাদের তিনটি জেলায় ভারতের সর্ববৃহৎ সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন-তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন। স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার মতো রাজ্যগুলিতে কমিউনিস্টদের নের্তৃত্বে বর্গাদার, ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন চাষী অধিকারের দাবীতে ও ক্ষেতমজুরের মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ঐ ধরনের কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হতে লক্ষ করা গিয়েছে।

১(খ).৬ ভারতের কৃষক আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

ভারতের কৃষক আন্দোলনগুলির কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—

প্রথমতঃ কৃষক আন্দোলনগুলি মূলত শোষিত কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের পরিণতি। আন্দোলনগুলিতে শোষিত কৃষকদের অংশ গ্রহণ লক্ষ্য করার মতো।

দ্বিতীয়তঃ আন্দোলগুলির সারমর্মের মধ্যে ব্রিটিশ ও জমিদারদের বিরোধিতা ছিল সুস্পষ্ট।

তৃতীয়তঃ আন্দোলনগুলির প্রাথমিক অনুঘটক ছিল অর্থনৈতিক শোষণ, তবে অনেক সময় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আন্দোলনের অন্যতম কারণ বলে প্রতিভাত হয়েছে। বস্তুত আন্দোলনে জমি ও স্বাধীনতা উভয়ই দাবী করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ আঞ্চলিক বিশেষত্ব ভারতের কৃষক আন্দোলনগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমরা এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই না যেখানে কোন একটি কৃষক আন্দোলনে সারা ভারতের মানুষ সামিল হয়েছে।

পঞ্চমতঃ ভারতের কৃষক অন্দোলনগুলি মূলত রাজনৈতিক। কৃষক আন্দোলনে কৃষকদের স্বাতন্ত্র্য ছিল বলা যায়।

এছাড়াও বলা যায় চূড়ান্ত দমন পীড়নের শিকার হয়ে অধিকাংশ কৃষক আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটেছে। তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল পরবর্তী পর্যায়ে প্রশাসনের পক্ষে কৃষকদের দাবীগুলি সার্বিকভাবে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি এবং অনেক সময় প্রশাসন সংস্কারমূলক রাস্তা অবলম্বন করেছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে ভারতের কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্ট শ্রেণী চরিত্র ও শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা গেলেও আন্দোলনগুলি সার্বিকভাবে বৈপ্লবিক চরিত্রের ছিল না; বরং তা ছিল অনেকাংশেই সংস্কার ধর্মী।

১(খ).৭ তেলেঙ্গানা ও তেভাগা আন্দোলনের স্বরূপ :

ভারতের বৈপ্লবিক কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে পাঁচ বৎসর ব্যাপী চলা তেলেঙ্গানা সংগ্রাম ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেছিল কৃষক সভা, আর কমিউনিস্টরা ঐ আন্দোলনে অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করেছিল। নিজাম পোষিত রাজাকারদের অত্যাচার ও জায়গীরদার দেশমুখদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে ভূমিহীন মজুর ও কৃষকদের প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর ঐ আন্দোলন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ রূপান্তরিত হয়।

অন্ধ্র মহাসভা ও অন্ধ্র কনফারেন্স নামে দুটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে কমিউনিস্টরা তেলেঙ্গানা আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের শেষার্ধে নালগোন্ডা জেলার বিভিন্ন অংশে এবং ওয়ারাঙ্গল ও খাম্মাম জেলার কিছু কিছু অংশে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সামন্ত-শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রায় ৩০ লাক্ষ কৃষক ৩০০০ গ্রামে সশস্ত্র লড়াই শুরু করেছিল। বে-আইনী জমি দখল, অন্যায়ভাবে কৃষকদের থেকে দাবী আদায়, ভেট্টি ভিক্ষার ফল জোর করে কৃষকের শস্য ক্রয় করা ইত্যাদি ক্ষোভ ছিল আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তি। কৃষকের চাষের অধিকার রক্ষা করা ও ক্ষেত মজুরের মজুরী বৃদ্ধি ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম দাবী।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে নালগোন্ডা জেলায় অত্যাচারী দেশমুখ-এর এক অনুগতের হাতে দোদি কোমারাইয়া নামে এক বিদ্রোহী কৃষকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের আগুন জ্বলে ওঠে। এবং তার মধ্য দিয়েই তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। প্রথম দিকে নিজামের বিরোধীতাকালীন পর্বে আন্দোলন প্রচুর জন সমর্থন পেয়েছিল। বিদ্রোহী কৃষকরা রাজাকারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে সক্ষম হয়। অত্যাচারী জমিদারকে গ্রাম থেকে বিতারণ করতে সফল হয় এবং জমি ও উৎপন্ন শস্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সাফল্য পায়। নালগোন্ডা, ওয়ারাঙ্গখ ও খাম্মাম জেলার প্রায় ১০০০০ গ্রামে কমিউনিস্টরা সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তোলে। গ্রামে ভেট্টিরাজ বন্ধ হয়, কৃষি মজুরী বৃদ্ধি পায়, সিলিং বর্হিভূত জমি দখল ও বণ্টন করা

হয়। এর পাশাপাশি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটানো, সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন, মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সাফল্য লক্ষ্য করা যায়।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ভারতীয় সেনার প্রবেশ আন্দোলনের গতিরোধ করে। সামরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আন্দোলনের তেজ প্রশমিত ও তা দমন করা হয় এবং ১৯৫১ সালে ঐ আন্দোলন সম্পূর্ণই স্তব্ধ হয়ে যায়। আন্দোলন কালীন পর্বে দরিদ্র কৃষক ও ক্ষেত মজুররা ঘৃণিত ভূস্বামী ও নির্যাতনকারী অন্যান্য মালিকদের জমি থেকে উৎখাত করে ও ঐ আন্দোলনকে তারা জমি দখলের লড়াই-এ পরিণত করে। ফলে, আন্দোলনের শুরুর সময় রাজাকার, জায়গীরদার, দেশমুখদের সামন্ত শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধনী, মাঝারি ও গরীব চাষীর যে সমর্থন পেয়েছিল, জমিদখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে এই সব জমির মালিকরা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর যখন থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু হয় তখন থেকেই জনসমর্থনের ঘাটতি স্পষ্ট হতে শুরু করে। এছাড়াও আন্দোলনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে CPI দল যথেষ্টই দ্বিধা বিভক্ত ছিল। রবি নারায়ণ রেড্ডি ও বি. ইয়েলা রেড্ডির মতো নেতারা আন্দোলন সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবী জানান। কিন্তু পি সুন্দরাইয়া ও এম. বাসবপুন্নাইয়ার মতো নেতারা অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সুপারিশ জানান।

১৯৪৬ সালের শেষের দিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার নেতৃত্বে বাংলার কয়েকটি জেলায় তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। জোতদারদের জমিতে কর্মরত ভাগচাষী ও বর্গাদারকে উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়ার দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল ১৯৪০ সালে তৎকালীন ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন বাংলার সরকার নিয়োজিত ফ্লাউড কমিশন ঐ দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিল। ১৯৪৬ সালে ফসল কাটার সময় উত্তর বঙ্গসহ আরো পনেরোটি জেলায় আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল দিনাজপুর। আন্দোলনের চরম সময়ে ৬০ লক্ষ ভাগচাষী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। জোতদারের তীব্র প্রতিরোধ ও মারাত্মক পুলিসী অত্যাচার সহ্য করে আন্দোলনে প্রায় ৭০ জন ভাগচাষীর মৃত্যু হয়। যার মধ্যে কেবলমাত্র দিনাজপুর জেলায় ৪০ জন কৃষকের মৃত্যু হয়। প্রায় ১২০০ কৃষকের জেল হয় এবং প্রায় ১০০০০ জন চাষী আহত হয়। সব থেকে মারাত্মক ঘটনাটি ঘটে খানপুরে। পুলিসের সাথে সরাসরি লড়াই-এ ২২ জন চাষীর মৃত্যু হয়। সীমাহীন দমন পীড়নের মাধ্যমে তেভাগা আন্দোলন বন্ধ করা হয়।

বৈপ্লবিক সামর্থ্যের দিক থেকে তেভাগা ও তেলেঙ্গানা উভয় কৃষক আন্দোলন যথেষ্ট সমৃদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও কমিউনিস্ট নেতাদের মতাদর্শগত দ্বিধা আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা উত্তর ভারত ভাগের ঘটনা ভারতের মার্কসবাদী নেতৃত্বকে বিচিত্র ঐতিহাসিক সম্ভাবনা সমৃদ্ধ এক সম্পূর্ণ নতুন রাজনৈতিক অবস্থার সামনে দাঁড় করিয়েছিল। হায়দ্রাবাদে নিজামের শাসন ও জায়গীরদার দেশমুখদের সামন্ত শোষণের অবসান এবং আন্দোলন রত কৃষকদের দমন করার কাজে ভারতীয় সেনার হস্তক্ষেপ তেলেঙ্গানা আন্দোলনকে বড় রকমের ধাক্কা দিয়েছিল। এই অবস্থায় CPI-এর নেতারা ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর রাষ্ট্রের কাজ সম্পর্কে, নেহেরুর সাথে তাদের সম্পর্কের কৌশল সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যদিকে বাংলা ভাগের ঘটনা তেভাগা আন্দোলনকে ভীষণভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নেহেরুর মন বুঝতে ভারতের মার্কসবাদীরা ব্যস্ত হয়ে পরেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর ভারতে কেন্দ্রে নেহরু ও রাজ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস পরিচালিত গণতান্ত্রিক সরকার উভয়েই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মতাদর্শের অনুগামী হওয়ায় তারা সংগ্রামী কৃষকদের দীর্ঘ দিনের

দাবীর প্রতি সুবিচার করবেন বলে ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশার জন্ম হয়েছিল। এই সময়ে CPI-এর কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বে ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের আধিপত্য থাকায় CPI-এর বৈপ্লবিক চরিত্র নেহেরু অনুসৃত আপাত উদারনৈতিক কৃষিনীতির সাপেক্ষে স্বল্পজীবী ও প্রশমিত হয়েছিল। আর এটাই ছিল তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ প্রত্যাহারে কমিউনিস্টদের ঘোষিত যুক্তি। যদিও বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল দলের সর্বস্তরে যুক্তির গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করতে। ফলে ১৯৫০ সালের শেষ পর্যন্ত কৃষকের আত্মত্যাগ চালু ছিল। অন্যদিকে তেভাগা আন্দোলন দুর্বল হয়ে পরে দেশ ভাগের জন্য ভৌগলিক ও সাংগঠনিক বিভাজনের শিকার হয়ে। তেভাগা আন্দোলনে মার্কসবাদীরা সীমাহীন দমন পীড়ন বা কদর্য ক্ষমতা রাজনীতির পরিবর্তে নেহেরুর রাজনৈতিক চমকে আচ্ছন্ন হয়ে ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে পরেছিল।

তবে রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে বিচার করা হলে তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলন আগের সব কৃষক আন্দোলনকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। তেভাগা ও তেলেঙ্গানা উভয় কৃষক আন্দোলনে গ্রামের ভূস্বামী, সুদের কারবারী, খাদ্য শস্যের মজুতদার এবং ধনী শ্রেণীর অন্যান্য অংশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সংগ্রামের সফল সংগঠন প্রকাশ পেয়েছিল। সংগ্রামী কৃষকরা জাত-সম্প্রদায় ও ধর্মের বাঁধা সাফল্যের সাথে পার হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক আদিবাসী মানুষের অংশ গ্রহণে উভয় আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই দুটি কৃষক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য দিক হল লেখাপড়া না জানা, দুবেলা খেতে না পাওয়া এবং খাদ্যাভাবে মৃত প্রায় গ্রামের মহিলাদের আন্দোলনে সামিল হওয়া। ঔপনিবেশিক বা ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর রাষ্ট্রের জমিদারী লেঠেলবাহিনী, সশস্ত্র পুলিশ বা সৈন্যদের হাতে ধর্ষণ ও অঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদি নানা অত্যাচার সহ্য করেও তারা আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। উভয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী মহিলাদের ভয়ডরহীন সাহসিকতা নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী।

১(খ).৮ ১৯৬০-৭০ দশকের কৃষক আন্দোলন :

ঔপনিবেশিকতা উত্তর ভারতে নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলনসহ ভারতের প্রায় অর্ধেক রাজ্যের নানা কৃষক আন্দোলনে তেভাগা ও তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলনের প্রেরণার অনুরণন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও প্রজাস্বত্ব সংস্কার বা জমির পুনর্বন্টনের জন্য ১৯৬০-১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে সংসদীয় রাজনীতিতে আস্থাহীন বিভিন্ন বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর সহযোগী হিসাবে কৃষক সংগঠনগুলির বিক্ষিপ্তভাবে সংগঠিত আন্দোলনে ঐ দুই কৃষক আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তেভাগা ও তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন দমন করার প্রায় সাথে সাথেই নেহেরু কৃষি সংস্কারের কৌশল প্রস্তুত করেন যা ভারতের গ্রামের ধনী কৃষক ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগী সামাজিক স্তরকে খুশি করেছিল। নেহেরু ভূমিসংস্কারের পদ্ধতি সুপারিশ করার জন্য কুমারাপ্পার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন যা শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত কৃষকদের প্রতীকী সুবিধার সুপারিশ জানায়। পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভূমি সংস্কারের বিষয়টি রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয় হিসাবে নিশ্চিত করতে নেহরু তৎপর হয়েছিলেন। রাজ্যগুলিকে ভূমিসংস্কারের বিষয়ে আইন তৈরী ও কার্যকরী করার দায়িত্ব অর্পন করে নেহরু স্থানীয়ভাবে গ্রামীন কায়েমী স্বার্থের মোকাবিলা করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। নেহরুর ঐ পদক্ষেপের একমাত্র ইতিবাচক বিষয়টি ছিল সমগ্র ভারতে জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটানো। নির্ধারিত উর্দ্ধসীমার বেশি জমি যাতে রাখা না যায় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং সীমা উর্ধ্বজমি বাজেয়াপ্ত করা ও অগ্রাধিকারের বিভিন্ন ঐ জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার বন্দোবস্ত করতে রাজ্য আইনসভা গুলিকে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাপনা বাস্তবে প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

ছিল না। কারণ ব্যক্তিগতভাবে জমির মালিকানা নির্ধারণের ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় জমিদার ও বৃহৎ রায়ত পরিবারগুলি জমির মালিকানা নামে-বেনামে নথিভুক্ত করানোর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ জমির উপর ভোগ-দখল বজায় রাখতে সফল হয়। কাজেই এক্ষেত্রে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা ও দরিদ্র চাষীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন স্থানীয় আমলাদের সাহায্য ছাড়া রাজ্যের পক্ষে সীমা উর্দ্ধ জমির দখল নেওয়া সম্ভব ছিল না। আবার দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধিকাংশ রাজ্যের আইনসভার সদস্যরা ছিলেন মূলত ধনী কৃষক ও সাবেক জমিদারদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি। তাছাড়া গরীব চাষী ও ক্ষেত মজুরের দুঃখে কাতর আইনসভা ও আমলাদের শ্রেণী চরিত্রও ছিল ভিন্ন। পাশাপাশি ভাগচাষীদের জমি চাষের অধিকার থেকে উৎখাত করার বিষয়টি ছিল আর একটি অতিরিক্ত সমস্যা। সুতরাং এটা বলা যায় যে ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর গণতান্ত্রিক ভারতে তেভাগা আন্দোলনের মূল দাবীগুলি যথাযথ গুরুত্ব ও সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করার অভাব ছিল সুস্পষ্ট। আর ভূমিসংস্কারে ক্রমপুঞ্জিত ব্যর্থতার অনিবার্য পরিণাম হিসাবে কৃষির উৎপাদনশীলতায় ঘাটতি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নিরাপত্তার অভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নানান আইনী ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৫০-এর দশকে ভারতে কৃষকদের জন্য নানা সুব্যবস্থার কথা জানানো হয়। কিন্তু গ্রামের নিচু তলার কৃষকদের মধ্যে ১৯৬০-এর দশক থেকেই ঐ ঘোষণার কার্যকারীতা সম্পর্কে হতাশা বাড়তে শুরু করে। ফলস্বরূপ প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে ঐ হতাশা ও ক্ষোভের প্রকাশ শুরু হয়। কৃষি উৎপাদনে ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতি; সেচ, সার এবং কৃষি যন্ত্রপাতির মতো উপকরণের অপর্যাপ্ততা এবং কৃষি উৎপাদনে জমির ব্যবহার কমতে থাকার কারণে ঐ পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে সারা দেশে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। অনেক জায়গায় অনাবৃষ্টি ও বন্যার মতো কারণে কৃষি উৎপাদন আরো কমে যায়। এই অবস্থায় একদিকে নতুন প্রযুক্তি আমদানির জন্য ক্রমবর্দ্ধমান বাহ্যিক অর্থনৈতিক চাপ, অন্যদিকে গ্রামের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্থ মানুষদের রাজনৈতিক চাপে ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর ভারত রাষ্ট্র উন্নয়নের সাথে ন্যায় বিচার সংযুক্ত রাখার সাবেক নীতির উপর আস্থা হারিয়ে ভারতের গ্রামাঞ্চলের ধনী কৃষকদের সুবিধা করে দিতে বিপুল পরিমাণ বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি নীতি গ্রহণ করে। ১৯৬০-এর দশকে এভাবেই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে 'সবুজ বিপ্লব'-এর সূচনা হয়। এই নতুন কৃষি কৌশলের মাধ্যমে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল যে পুঁজি ও প্রযুক্তির বিপুল সম্ভার গ্রামের ভূস্বামীদের একটা অংশ— যাদের রুডলফ ও রুডলফ 'বুলক ক্যাপিট্যালিস্ট' বলে উল্লেখ করেছিলেন— তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু এই কৌশল উন্নয়নের সুবিধা গ্রামের গরীবদের মধ্যে সমানভাবে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে গ্রামে বৈষম্যের মাত্রা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। বিস্ময়ের বিষয় হল এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, "সবুজ বিপ্লব লালে পরিণত হতে পারে।" পরিবর্তিত অবস্থায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি গ্রামের মানুষের মেজাজ বুঝে দীর্ঘ নিরবিচ্ছিন্ন কংগ্রেস শাসনের ছেদ টানতে উদ্যোগী হয়। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যগুলিতে ও লোকসভায় জাতীয় কংগ্রেসের গরিষ্ঠতা লক্ষণীয়ভাবে কমে যায়। মনে করা হয় ঐ পরিস্থিতি ভারতে জোট রাজনীতির সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। রাজ্যস্তরের রাজনীতিতে বিভিন্ন শক্তিগুলির আন্তঃসম্পর্কের পরিবর্তন কৃষক সফলতার দিক থেকে আরোবেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের বহু-শ্রেণী রাজনৈতিক ভিত্তি রক্ষাকারী 'রক্ষক-পোষ্য' সম্পর্কের সংযোগ পরিবর্তনের মাধ্যমে কংগ্রেসের শক্তিক্ষয় ঘটিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের দলের শক্তি বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে বামপন্থীরা কৃষকদের সক্রিয় করার কৌশলের মধ্যে জাতীয় রাজনীতিতে পরিব্যপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা লক্ষ্য করে, যদিও বামপন্থীরা ১৯৬০ দশকে ভাঙনের সম্মুখীন হয় এবং তা আজও বজায় রয়েছে। CPI এবং CPI(M) উভয়েই কয়েকটি রাজ্য সরকারে সামিল হয়ে

বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়। ঐ কর্মসূচীগুলির প্রধানত তিনটি দফা লক্ষ্য করা যায়। যথা—

প্রথম দফা—কৃষক সংগঠন ও স্থানীয় আমলার যৌথ সহযোগিতায় অবৈধভাবে বৃহৎ ভূস্বামীদের দখলে থাকা উর্দ্ধসীমা অতিরিক্ত জমি পুনরুদ্ধার করা।

দ্বিতীয় দফা— ভূমিহীন এবং গরীবচাষী ও ক্ষেত মজুরের মধ্যে রাজ্য সরকারের দখলে থাকা জমি অযথা ইতঃস্তত না করে বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

তৃতীয় দফা— আনুষ্ঠানিক সত্ত্বাধিকার চাষের কাজে উচ্চজাতভুক্ত ভূস্বামীদের দ্বারা নিযুক্ত বিপুল সংখ্যক ভাগচাষীদের প্রকৃত বর্গাদার রূপে নাম নথিভুক্ত করা এবং তাদের চাষ-আবাদের স্থায়ী অধিকারের পাশাপাশি ঐ জমির উৎপন্ন শস্যের একটা অংশের উপর আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

কমিউনিস্টদের পরিচালিত কৃষক সংগঠনগুলি কৃষি মজুরদের বিষয়েও তৎপর হয় এবং তাদের মজুরি বৃদ্ধির লড়াই-এ সামিল হয়। জোট সরকারে যোগ দেওয়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি ঐ তিন দফা দাবী আপাতভাবে মেনে নিলেও অ-কমিউনিস্ট দলগুলি বামপন্থীদের ঐ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে খুব আগ্রহী ছিল না। ফল হিসাবে ভারতের গ্রামাঞ্চলে নতুন মন্থন লক্ষ করা যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে নানাভাবে ভূমি সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়।

১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে আর একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনায় ভারতের গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন শুরু হয়। স্বাধীনোত্তর পর্বে CPI ও CPI(M) উভয়ের গ্রহণ করা সংসদীয় কমিউনিজমের অনুশীলনের সাথে একমত হতে না পেরে কমিউনিস্টদের একটা অংশ ১৯৬৪ সালের সময় থেকে 'জমি দখল ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল'-এর ডাক দিয়ে সশস্ত্র আক্রমনের পথে অগ্রসর হয়। আন্দোলনের এই নতুন ধরণটি নকশাল আন্দোলনের নামে পরিচিত হয়। এই আন্দোলনের অভ্যুত্থান হয় ১৯৬৭ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বকারী আধা সামরিক বাহিনী ও পুলিসের সাথে সরাসরি লড়াই-এর মাধ্যমে বেনামী জমি দখলের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে। নকশালরা সংসদীয় কমিউনিজমে বিশ্বাসীদের দায়বদ্ধতার প্রশ্ন তুলে কঠোর সমালোচনায় বিদ্ধ করে। কারণ ভারতের শ্রেণী রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে সামগ্রিকভাবে সরকারী ভূমি সংস্কার কর্মসূচীতে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকরা সেভাবে লাভবান হয়নি। ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের সহযোগী ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের পথ অনুসরণ করার জন্য নকশালরা অন্যান্য বাম ও বিপ্লবী কৃষক সংগঠনগুলিরও সমালোচনা করে। কারণ ঐ পথ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের থেকে আলাদা কিছু ছিল না বলে তারা মনে করতো।

পাহাড় ও বনাঞ্চলগুলিতে কৃষির অনগ্রসরতা ও গভীর দারিদ্র্য কবলিত গ্রামগুলিতে নকশাল আন্দোলন জনপ্রিয় হয়। এছাড়াও ঔপনিবেশিক শাসনের সময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত অধিকার সচেতন আদিবাসী ও তপসিলী জাতি প্রধান অঞ্চল গুলিতে এই আন্দোলন বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। ১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে অত্যন্ত কঠোরভাবে নকশাল আন্দোলন দমন করা হয়। কিন্তু তার পরেও নানা সময়ে নতুন এলাকা দখলের মধ্যে এই ধরনের আন্দোলনের প্রতি ঝোঁক আজও

লক্ষ্য করা যায়। মাওবাদকে ঐ আন্দোলনেরই একটি ভীতিপ্রদ অংশ বলে মনে করা হয়। মাওবাদকে ভারতের রাষ্ট্র পরিচালকগণ জাতির পক্ষে বিপদজনক বলে ঘোষণা করেছেন।

কমিউনিস্টরা কৌশলগতভাবে কৃষক সফলতার স্বার্থে কান্তিহীনভাবে কৃষকের ঐক্যের দাবী জানিয়ে এসেছে। ঔপনিবেশিক শাসনকালে ও স্বাধীনতার পর দু-দশক ধরে কৃষক উৎখাতের যে প্রক্রিয়া চলেছিল তাকে থামানোর উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে জমির সত্ত্বনীতির সংস্কার এবং ভূমিসংস্কারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু ঐ কর্মসূচী সফল করতে গিয়ে কমিউনিস্টদের একদিকে ধনী ও স্ব-নিযুক্ত মধ্যবিত্ত কৃষক এবং অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষি মজুর ও দারিদ্র্য কৃষক উভয়ের স্বার্থের সমন্বয় করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত কৃষকের বৈপ্লবিক সামর্থ্য সম্পর্কে গবেষক ও রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ কারীদের মতপার্থক্য রয়েছে। ব্যারিংটন মুর জানান মধ্যবিত্ত কৃষকের ধনী কৃষকের সাথে জোট গঠন করে প্রান্তিক চাষী ও ক্ষেতমজুরের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী শক্তি সংগঠিত করার একটা সহজাত প্রবণতা আছে। অন্যদিকে ক্যাথলিন গফ্ ও অন্যান্যরা ভারতের গ্রামাঞ্চলের বিশেষ প্রেক্ষাপটে যেখানে মধ্যবিত্ত চাষীর জমির মালিকানা ২.৫ এবং ১০ একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে সেখানে তাদের বৈপ্লবিক সামর্থ সম্পর্কে তাঁরা বিশেষভাবে আশাবাদী। জাতভিত্তিক ভারতীয় গ্রাম সমাজের আর একটি অতিরিক্ত বিশেষত্ব হল অল্প জমির মালিকানা সত্ত্বেও উচ্চ জাতভূক্ত হিন্দু পরিবারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের জমি আবাদ করতে মজুরীর বিনিময়ে শ্রম ভাড়া করে। সুতরাং পর্যাপ্ত মজুরীর বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মালিকানাহীন চাষীদের ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের এক বিচিত্র ঘৃণা-ভালোবাসার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে কমিউনিস্টরা উপলব্ধি করতে শুরু করে দীর্ঘদিনের সকল কৃষকের ঐক্যের কৌশলের পাশাপাশি ক্ষেত মজুরদের পৃথক সংগঠন গড়া প্রয়োজন। 'সবুজ বিপ্লব'-এর ফলস্বরূপ ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কৃষক ও ক্ষেত মজুরের মেরুকরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তার ফলে অধিকাংশ কৃষক সংগঠন দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর ভারতে নতুন কৃষিনীতির সুবিধা সাপেক্ষে জন্ম নেওয়া অধিকাংশ কৃষি মালিক ছিল মধ্যসত্বভোগী কৃষক এবং সংখ্যা বিচারে নিজের এলাকায় আধিপত্যশীল। তারা অতীতের জমিদার-ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা অ-ব্রাহ্মণ জাতের পুরানো সাথী। বর্তমানে নতুন কৃষি নীতি ও বণ্টন ব্যবস্থার সাপেক্ষে জন্ম নেওয়া অধিকাংশ মালিক নিজেদের দলিত অস্পৃশ্য আদিবাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছে। অথচ ঐ দলিত অস্পৃশ্য আদিবাসীরাই হল সব থেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত। কারণ ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর রাষ্ট্রের পৃষ্টপোষকতায় যে নতুন কৃষি কৌশলের প্রবর্তন করা হয় তাতে প্রাতিষ্ঠানিক অংশ গ্রহণ ছাড়াই প্রযুক্তির নতুনত্বের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রবল উৎসাহ দেখানো হলেও প্রকৃত উৎপাদকের প্রতি যত্ন নেওয়া হয় না। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের নতুন কৃষি পুঁজিপতিরা বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে অধিক সরকারী ভর্তুকি ও তাদের উৎপাদিত শস্যের উচ্চমূল্য দাবী করে এবং নতুন সংগঠন ও কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে কৃষক সচলতার নতুন গতিপথ চালু করছে। এক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রে শারদ যোশীর নের্তৃত্বাধীন 'শ্বেতকারী সংগঠন' এবং উত্তরপ্রদেশের মহেন্দ্র সিং টিকায়েতের নেতৃত্বাধীন 'ভারতীয় কৃষান ইউনিয়ানের মতো সংগঠনের নাম উল্লেখ্য।

১(খ).৯ নব্য কৃষক আন্দোলন :

১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে এই সংগঠনগুলি বিপুল সংখ্যক ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষককে সামিল করে আন্দোলনের সূচনা করে। কিন্তু এই আন্দোলনকারীদের স্বার্থ কম মজুরীর ক্রয়ক্ষমতাহীন এবং তীব্র খাদ্যাভাবে জর্জরিত ক্ষেতমজুরের স্বার্থের সমজাতীয় ছিল না। এই কৃষক আন্দোলন ছিল বহু সমন্বিত এবং কৃষকের কাছে জনপ্রিয় হওয়াই ছিল এর মতাদর্শগত ভিত্তি। ফলে এই আন্দোলনে গ্রামীণ বনাম 'ভারত' শহুরে ইলেয়ার তত্ত্ব-হাজির করা হয় এবং শিল্প ও কৃষির বানিজ্য বৈষম্য-এর উপর আলোকপাত করা হয় এবং গ্রাম ও শহরের বৈষম্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই আন্দোলনে কিছু নেতা আবার 'লাইসেন্স-পারমিট রাজ'কে বিদায় জানিয়ে 'খোলা বাজার অর্থনীতি'কে স্বাগত জানায়। প্রথাগত কৃষক আন্দোলনে শ্রেণী-জাত সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বাক্‌ধারার সাপেক্ষে 'রুরাল পপুলিজম'-এর এই নতুন ধারা বোঝা নিঃসন্দেহে কঠিন। এক্ষেত্রে ভারতের কমিউনিস্ট বা অন্য বাম গোষ্ঠী পরিচালিত ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ দরিদ্র কৃষক ও ক্ষেতমজুররা ক্রমশই প্রান্তিক হয়ে পড়ে। আর এভাবেই ১৯৭০ ও ১৯৮০ এই দুই দশক ধরে চলা কৃষক আন্দোলনগুলি দুটি পরস্পর বিরোধী পথে অগ্রসর হয়েছে। একদিকে জমির পুর্নবন্টন, কৃষিমজুরী বৃদ্ধি এবং উচ্ছেদ থেকে ছোট চাষীকে রক্ষা করার জন্য বা জোর করে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র উৎপাদকের দুর্দশার কথা উপেক্ষা করে সম্পন্ন চাষীদের স্বার্থে কৃষিকে লাভজনক করার জন্য সরকারের থেকে বিশেষ সুবিধা আদায়ের দাবীতে আন্দোলন হয়েছে। বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে দেশের কৃষি নির্ভর প্রতিটি অংশই আজ আক্রান্ত।

১(খ).১০ উপসংহার :

অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি উপকরণের উপর থেকে সরকারী ভর্তুকি তুলে নেওয়ার ফলে কৃষি উৎপাদনগুলি প্রতিযোগীতামূলক বিশ্ব বাজারে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। ফলে ব্যাপক সংখ্যক কৃষক ঋণের জালে জড়িয়ে পরছে। অথচ কৃষক তার উৎপাদনের পারিশ্রমিক পাচ্ছে না। কৃষিতে অগ্রসর বা অনগ্রসর উভয় রাজ্যেই কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফল হিসাবে গ্রামের মানুষদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরী হচ্ছে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মধ্যে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিয়মিতভাবে ভারতের নানা প্রান্তে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতীকগুলির উপর সহিংস আক্রমণ ঘটছে। সরকারী তরফে ঐ আক্রমণগুলিকে মাওবাদী সন্ত্রাসের প্রকাশ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। অন্যদিকে নিয়মতান্ত্রিক পথের অনুসারীরা প্রতিবাদ স্বরূপ বিভিন্ন সংসদীয় রাজনৈতিক দলের সহযোগী হিসাবে কৃষক সংগঠনের ধর্ণা বা র‍্যালীর আয়োজন করছে। কখনো কখনো দেশে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে বানিজ্যিক স্বার্থে জোর করে সরকারী বা বেসরকারী তরফে জমি অধিগ্রহণের চেষ্টাকে প্রতিহত করার উপায় হিসাবে কৃষকের সক্রিয়তার আবশ্যিকতা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় আমলা বা রাজনীতিকদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে বা বিশ্বায়নের আপত্তিকর উদ্দেশ্যে বেসরকারী সংস্থা দ্বারা বনবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তবে এই ঘটনার অন্যতম কারণ হল বর্তমানে জমির মালিক বা প্রকৃত উৎপাদক উভয়েই সাবেকী চাষ-আবাদকে

অনুৎপাদক বলে গণ্য করছেন। কৃষির অংশীদারীত্ব জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ক্রমশই কমে যাচ্ছে। ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর রাষ্ট্রকেও ক্রমশ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে না যা কৃষির আধুনিকীকরণ ঘটায় বা কৃষকের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করে। 'কম্যান্ড ইক্‌নমি'-র আকস্মিক প্রত্যাহার এবং 'কোর ইক্‌নমি' ক্ষেত্রের উদারীকরণ, সব ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার প্রত্যাহার কৃষি ও কৃষিজীবী উভয়ের অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছে। এমনকী নতুন শতাব্দীও ভারতীয় কৃষকদের জন্য আশাব্যঞ্জক কোন বার্তা দিতে পারেনি।

১(খ).১১ নমুনা প্রশ্ন :

১। বড়ো প্রশ্ন :

(ক) ভারতের কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে একটি রূপরেখা প্রস্তুত করুন।

(খ) ভারতের কৃষক আন্দোলনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। মাঝারি প্রশ্ন :

(ক) ঔপনিবেশিক পর্বে কৃষক আন্দোলনের উপর একটি টীকা লিখুন।

(খ) স্বাধীনতা পরবর্তী কৃষক আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলনের প্রধান দাবীগুলি কী ছিল?

(খ) কৃষক আন্দোলনের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব নির্দেশ করুন।

১(খ).১২ গ্রন্থসূচি :

1. Dhanagare, D.N. — *Peasant Movements in India* (1920-50), OUP, New Delhi.
2. Dipankar Gupta— "Farmers' Movements in Contemporary India" in Shah Ghanshyam (Ed), *Social Movements and the State*, Sage, New Delhi.
3. Sudha Pai — "Farmers Movements" in *The Oxford Companion to Politics in India*, OUP, New Delhi, 2010.
4. Desai, A.R. (ed.) — *Peasant Struggles in India*, OUP, New Delhi, 1979.
5. Guha, R. — *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, OUP, New Delhi, 1983.

একক ২ ❑ মানবাধিকার আন্দোলন

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ ভূমিকা
২.৩ মানবাধিকারের অর্থ
২.৪ ভারতে মানবাধিকার আন্দোলন
২.৫ উপসংহার
২.৬ নমুনা প্রশ্ন
২.৭ গ্রন্থসূচি

২.১ উদ্দেশ্য :

- মানবাধিকার আন্দোলনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা
- মানবধিকার আন্দোলন কাকে বলে বোঝা
- রাষ্ট্র ও মানবাধিকারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা
- ভারতে মানবাধিকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা
- ভারতবর্ষে মানবাধিকার আন্দোলনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা

২.২ ভূমিকা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোওর পর্বে মানবাধিকারের প্রশ্নটি সারা পৃথিবীর মানুষকে বিপুলভাবে আলোড়িত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আনবিক বোমার আঘাত, মানুষের জীবনহানি, দৈহিক ও মানসিক আঘাত সারা পৃথিবীর মানবতা বোধকে আঘাত করেছে। এই যুদ্ধের বীভৎসরূপ মানুষের মধ্যে এই ধারণার জন্মদেয় যে এই পৃথিবীতে সকলের জন্য স্বাধীনতা, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হল মানবতার অধিকার বা মনুষ্যত্বের মূল্যবোধও মর্যাদার প্রতিষ্ঠা। যার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাওয়া যায় ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার সংক্রান্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষনায়। যা সকলের কাছে 'মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণা, বা ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস নামে পরিচিত। লক্ষনীয় বিষয় হল অধিকার এর ধারণাটি মানুষের সমাজবদ্ধতার সূচনার সাথে জুড়ে থাকলেও, বলা হয় মানবাধিকারের ধারনাটি যেদিন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্রটি গ্রহন করে সেই দিন থেকে আলোচনার বিষয় হয়। তবে আধুনিক দিনে যে কোনও গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও

মানবাধিকারে উৎসাহ দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করা হয়। মানবাধিকার দাবী জানায় সবার সমান মর্যাদা ও অধিকার। তবে ওই দাবীর আইনানুগ ভিত্তির থেকে নৈতিকতার দিকটি বড়। মানবাধিকার যেহেতু মনুষ্যত্বের অধিকার তাই নৈতিক ভাবে দাবী জানান হয় কোনও মানুষ, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় মানবাধিকার হরণ করতে পারে না। আসলে সাম্প্রতিক কালে সমাজে নানা ধরনের বৈষম্য যত প্রকট আকার গ্রহন করছে ততই মানবাধিকারের দাবী বলিষ্ট আকার ধারণ করছে। সমাজে বৈষম্যকে বহু মাত্রিক, তার নানা রূপ, নানা প্রকরণ এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখার কৌশলেরও অভাব নাই। একথা সত্য যে ইতিহাসে নানা সময়ে নানান মনীষী, মহাজন, মহাপুরুষ মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠায়, মানুষের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। কাজেই মানবাধিকার চর্চার মধ্যে সকল মানুষের মর্যাদা ও সাম্যের মূল্যবোধের বিকাশ ও সংরক্ষন-এর বিষয়টি যেমন জানা যায় তেমনই সমাজে অপ্রতিহত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসও নির্বিচার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাস ও তার বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রাম সম্পর্কেও জানা সম্ভব হয়।

মানবাধিকার চর্চায় এটা সহজেই লক্ষ করা যায় যে 'অধিকার' অর্জনও সংরক্ষনের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন হলেও মানবাধিকার নাম নিয়ে চর্চা বিগত শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে। গ্রীক দার্শনিক বা রোমান আইন প্রনেতা গণ মানুষের অধিকারের কথা বলে ছিলেন। এক্ষেত্রে প্লেটোর 'ন্যায' ধারণার কথা বলা যায় বা রোমানদের সর্বজনীন আইনের ধারণা বা নাগরিকের ধারণার কথা উল্লেখ করা যায়। তবে ধারণাটি প্রতিষ্ঠা পাওয়া শুরু হয় ম্যাগনাকার্টা (১২১৫) অধিকারের আবেদন পত্র (১৬২৮) বা বিল অবরাইটস্ (১৬৮৯) ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে। অষ্টাদশ শতকে শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধও ধ্যান ধারনাকে অস্তাচলে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। যার থেকে মানুষের যোগ্যতা দক্ষতা ইত্যাদির পাশাপাশি স্বাধীনতা সাম্যও সৌভ্রাতৃত্ব-এর ধারণা প্রতিষ্ঠা পায়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ঐ গতিকে আরো তীব্র করে তোলে। পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার সংক্রান্ত ধারণা মানবাধিকার-এর ধারণা সংগঠিত করতে সাহায্য করে এবং এটি ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার, ন্যায় বিচার, সাম্য স্বাধীনতা ইত্যাদির দাবীতে সোচ্চার হয়। যার অনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায় ১৯৪৮ সালের ১০-ই ডিসেম্বর। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হল আধুনিক যুগে মানবাধিকারের রাষ্ট্রীয় এবং তদনুযায়ী বিধিবদ্ধ আইনের প্রয়োগ যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনারও শেষ নেই। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষার অধিকার, নারী-পুরুষ সমানাধিকার, বাসস্থানের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার ইত্যাদি নানা মানবাধিকারের মৌলিক উপাদান গুলিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তেমনই এটাও সত্য যে অগ্রসর বা অনগ্রসর সব দেশেই আজ মানবাধিকার সংকটাপন্ন পদদলিত। কাজেই মানবাধিকারের চর্চায় এক দিকে যেমন মানুষের অধিকার অর্জনের ইতিহাস লক্ষ্য করা যায় তেমনই আবার অন্য ধরনের অব্যবস্থার বা অসম্পূর্ণতার বা অসংগতির ইতিহাসও লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাধারমন চক্রবর্তী খুব সুন্দর ভাবেই মন্তব্য করেছিলেন যে তত্ত্বগত ভাবে, অধিকার প্রতিষ্ঠাকে ন্যায় বিধানও অন্যায়ের প্রতিবিধান হিসাবে যদি দেখা হয়, তাহলে সবক্ষেত্রে সব অধিকার ন্যায় পরায়ণতার বাহক হয়ে থেকেছে আধুনিক যুগে কোনও বিতর্ক থাকা উচিত নয় যে শুধুমাত্র মানুষ হয়ে জন্মানোর সুবাদে কতকগুলি অধিকার তার অবশ্য প্রাপ্য। আপাতভাবে বিশ্বের নানা সংগঠন ও সংস্থা সেগুলিকে সার্বজনীন মর্যাদা দেওয়ার কথা অনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ঘোষণা করেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তব ঠিক উলটো কথা বলছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে মানবাধিকারের প্রত্যয়গুলির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নিছক ঘোষণার স্তরেই থেকে যাচ্ছে। কার্যকর করার উপায় ও পন্থা অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ

প্রকৃতির। অর্থাৎ মানবাধিকার চর্চায় একদিকে যেমন তার বিকাশ ও বিস্তার লক্ষ্য করা যায় তেমনই নানা কায়েমী স্বার্থও ক্ষমতা লোভীর যোগসাজসে সচেতনভাবে তার সংকোচনের উদ্দ্যোগও লক্ষ করা যাচ্ছে।

২.৩ মানবাধিকারের অর্থ :

'মানবাধিকার' কথাটি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। কিন্তু মানবাধিকার বলতে ঠিক কী বোঝায় সেই প্রশ্নে দেখা যায় নানা মুনি নানা মত। মানবাধিকার বলতে সাধারনত সেই সব সাধারণ অধিকারকে বোঝানো হয় যেগুলি ছাড়া মনুষ্য জীবন সম্ভব নয়। জন্মসূত্রে সব মানুষ সমান এবং তারা মর্যাদা ও অধিকারে সমান অংশীদার এই ভাবনাই মানবাধিকার এর মূল ভাবনা। মানবাধিকার মূলত নৈতিক প্রকৃতির এবং মনুষ্যত্বের দাবীকে মানুষ অর্জন করে ও তাকে কেড়ে নেওয়া যায় না। এ অধিকার মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি বা প্রকৃতির অবাধ বা স্বাধীন অনুশীলনের অধিকার। মানবাধিকারকে কোনও বিমূর্ত অধিকার এর ধারণা বলা যায় না। কারণ এই অধিকারের অস্তিত্ব, স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি মূলত নির্ভর করে দেশের সুনির্দিষ্ট সামাজিক বিকাশের স্তরের উপর। একারণেই বলা হল যে বিশুদ্ধ মানবাধিকার বলে কিছু থাকতে পারে না। মানবাধিকার কখনোই সমাজ নিরপেক্ষ নয়। দেশ ও কালের বিচারে মানবাধিকার একটি পরিবর্তনশীল ধারণা। সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস অনুসরণ করে বলা যায় অতীতে যেমন ধারণাটির অস্তিত্ব ছিল তেমনই ছিল তাকে বাস্তবায়িত করার সংগ্রাম বা মানবাধিকারকে বাস্তবায়িত করার উপযোগী সামাজিক ভিত্তি নির্মাণের লড়াই। ইউরোপের ইতিহাস থেকে লক্ষ করা যায় মধ্যযুগের চার্চ বা যাজকীয় আধিপত্য বা সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ যে দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে ছিল তা এক সময় শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটিয়ে সমাজে সমতার আদর্শ বা গণতান্ত্রিক চেতনার জন্ম দিয়েছিল। আসলে উৎপাদনের উপকরনের অলঙ্ঘনীয় বিকাশের সূত্র ধরে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আসে তা অনিবার্য ভাবে মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত করে। আর চেতনা সমৃদ্ধ মানুষ স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের সহজাত অধিকার, গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী বলা যায় মানবাধিকার হল 'সংবিধানগত ভাবে সকলের আত্মমর্যাদাগত ভাবে জীবন ধারণের অধিকার, স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার এবং সকলের সমানাধিকার'। এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার পতি নগেন্দ্র সিং মন্তব্য করেন বিশ্বের যে কোনও অংশে বসবাসকারী প্রত্যেক নারী পুরুষ একজন মানুষ হিসাবে যে অধিকার ভোগ করতে পারে তাকেই মানবাধিকার বলা হয়। কাজেই মানবাধিকারের মধ্যে জীবনের অধিকার, ইচ্ছামতো কথা বলার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, কাজ করার অধিকার, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারণের অধিকার, অন্য ব্যক্তির দাসত্ব ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার, ধর্ম পালনের অধিকার, বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার বিশ্বাস বা অবসরের অধিকার ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য। কাজেই বলা যায় মানুষের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য যে অধিকারগুলি অপরিহার্য তাই মানবাধিকার। বস্তুত মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সব ধরনের অধিকারকে মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ভারতে মানবাধিকার বলতে ১৯৯৩ সালে প্রণীত মানবাধিকার রক্ষা আইনে বলা হয়েছে মানবাধিকার হল ব্যক্তির জীবন স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত সেই সব অধিকার যেগুলি ভারতীয় সংবিধান ধারা স্বীকৃত বা আন্তর্জাতিক চুক্তি পত্রে অঙ্গীভূত এবং ভারতের আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য।

মানবাধিকারের দুটি দিক লক্ষ করা যায় যথা ১নং, নেতিবাচক অধিকারের দিক। এই ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি অধিকারের স্বীকৃতি লক্ষ্যকরা যায় যার উপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না। পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার নেতিবাচক মানবাধিকার-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয় হল ইতিবাচক মানবাধিকারের

দিক—ইতিবাচক বা সদর্থক মানবাধিকারের মধ্যে এমন কতকগুলি অধিকারের স্বীকৃতি লক্ষ করা যায় যার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকার দাবী জানানো হয়। নেতিবাচক মানবাধিকার রাষ্ট্রের কখনোই লঙ্ঘণ করা উচিত নয় বলা হয় পাশাপাশি দাবী জানানো হয় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এগুলি সংরক্ষিত হওয় প্রয়োজন এই প্রসঙ্গে ঘনশ্যাম শাহ মন্তব্য করেছেন, এমনটা আশা করা হয় যে সরকার মানবাধিকার রক্ষা ও প্রসারিত করবে। সামগ্রিক ভাবে মানবাধিকারের প্রকৃতি হল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে প্রত্যেক মানুষ তার আত্ম বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ সুবিধা ও বস্তুগত প্রয়োজনীয়তা পাওয়ার অধিকারী। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে মাবাধিকার আপাত ভাবে অবাধ প্রকৃতির মনে হলেও এটা অবশ্যই আশা করা হয় যে মানুষ তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে নিজের বস্তুগত উন্নতির সীমারেখাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সম্পর্কিত নীতিগুলির পিছনে একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এক্ষেত্রে প্রথমেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে দাসপ্রথা বিলোপের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফনেশনস্ এক্ষেত্রে প্রথম ব্যাপক উদ্দ্যোগ গ্রহণ করে। নারী শিশু ও শরণার্থীদের মানবাধিকার রক্ষায় লীগ অব নেশনস্ বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করে। তবে সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে লীগ অব নেশনস্ এর ঔ উদ্যোগ সার্বিক ভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। ন্যাৎসীবাদ ফ্যাসিবাদ এক্ষেত্রে বড় বাঁধা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। যাদের আক্রমনে মানবাধিকার বিশেষভাবেই লঙ্ঘিত হয়। এর ফলে সম্মিলিত জাপুঞ্জে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। ১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনে মানবাধিকার কমিশন গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অমানবিক অভিজ্ঞতা মানবাধিকার স্বীকার ও সংরক্ষনে প্রেরণা জুগিয়ে ছিল। জাতিপুঞ্জের ঘোষিত মানবাধিকার অর্থনৈতিক সামাজিক পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং সাধারণ সভায় ঐ অধিকারগুলিকে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে ঐ ঘোষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ ঘোষণায় স্পষ্ট ভাবেই প্রতিটি মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার কথা জানানো হয়েছে। সনদের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ মৌলিক মানবাধিকার, মানুষের মর্যাদা, মূল্য এবং নারী-পুরুষ ও ছোট বড় রাষ্ট্র নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকারের উপর আস্থা স্থাপন করছে। সনদের ঘোষণা বিশ্বজুড়ে প্রয়োগ করার সুপারিশ জানানো হয়েছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক ভাবে কোনও রাষ্ট্রের উপর প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘ আইনগত বা রাজনৈতিক ভাবে সীমাবদ্ধ। মানবাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রের উপর কোনও আইনজাত দায়িত্ব অর্পণ করা হয় নি। তা ছাড়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে কোথাও স্পষ্টভাবে মানবাধিকার বা মৌলিক স্বাধীনতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তবে ঐ সীমাবদ্ধতা ঘোষণাপত্রটির গুরুত্ব কম করেনি। কারণ আজও পৃথিবীব্যাপী যেকোনও ধরনের অসাম্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঘোষণা পত্রটি প্রধান হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

মানবাধিকারের আলোচনায় রাষ্ট্রও মানবাধিকার সংক্রান্ত যে সকল রাজনৈতিক তত্ত্ব ও দর্শন লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে একটি প্রধান তত্ত্ব বা দর্শন হল প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা যা মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা দেয় যথা জীবন স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার। দাবী করে ঐ অধিকার রাষ্ট্র তৈরী করে নি তাই ঐ অধিকার রাষ্ট্রের স্বীকৃতির উপর নির্ভর শীল নয়। কাজেই ঐ অধিকারগুলি প্রকৃতি গত ভাবে স্বতঃসিদ্ধ, সর্বজনীন, অলঙ্ঘনীয় ও চূড়ান্ত। কিছু ভাববাদী তাত্বিক যেমন হেগেল প্রমুখ মনে করেন অধিকার কখনোই রাষ্ট্র নিরপেক্ষ হতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্রের কাছে নিঃশর্ত আনুগত্যের মাধ্যমে অধিকার বা স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব হয় এবং ব্যক্তি সত্তার পূর্ণ বিকাশ হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বাদীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। জে এস মিল উত্তর উদারনৈতিক চিন্তায় ব্যক্তির অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারনে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক ভূমিকার দাবী জানানো হয়। আর অন্যদিকে মার্কসীয়

চিন্তা ধারায় পরিবর্তে শ্রেণী ধারণাই মুখ্য। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র উৎপাদনের উপকরনের মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার। একমাত্র রাষ্ট্রের শোষণ হীন সমাজে সকলের অধিকার বা প্রকৃত বিচারে মানবাধিকারের ধারণা অর্থবহ হয়। কাজেই রাষ্ট্র ও মানবাধিকার সম্পর্কে প্রাকৃতিক অধিকার থেকে শুরু করে প্রত্যক্ষবাদ, রবার্ট নোজিক ও ডোয়ার্কিনের, হিতবাদ বিরোধী তত্ত্ব, ইয়েল স্কুলের তত্ত্ব, জন রলসের তত্ত্ব, মার্কসীয় তত্ত্ব ইত্যাদি নানা মতামত লক্ষ্য করা যায়। ঐ তত্ত্বগুলির বক্তব্যে যত বিরোধিতাই থাকুক না কেন, সকলেই এক মত যে রাষ্ট্র ও মানবাধিকারের মধ্যে একটা মত বিরোধিতা আছে। এবং মানবাধিকার হরণ বা লঙ্ঘণের সবথেকে বড় প্রতিষ্ঠান বা মাধ্যম হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের পাশাপাশি সামাজিক স্তরে সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলিও ব্যাপক ভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘণ করে। বাস্তবিক অর্থে মানবাধিকার লঙ্ঘণে রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় হাত ধরা ধরি করে চলে। শাসক বর্গ যেমন মানবাধিকার লঙ্ঘণ করে তেমনই সামাজিক মোড়ল সম্প্রদায়গুলি মানবাধিকারের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে। কাজেই বলা যায় যে সামাজিক স্থিতিশীলতার নাম করে সমাজের সর্বস্তরে চলে আপাত দৃষ্টিতে অনুপস্থিত অথচ গভীর ভাবে প্রোথিত ক্ষমতার দম্ভ। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল যুক্তির তোয়াক্কা না করে প্রতিবাদকে চিরদিনের মতো থামিয়ে দেওয়া এবং সামাজিক স্তরে প্রভুত্বকে অটুট রাখা। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা সহজেই লক্ষ করতে পারবো বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের নিজের দেশের মানুষদের মানবাধিকার কীভাবে হরণ করেছে। লক্ষ করতে পারবো দেশে সশস্ত্র লড়াই-এ যত মানুষ মারা গিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি মানুষ মারা গিয়েছে নিজের দেশের সরকারের অত্যাচারে। নির্যাতন ও নিপীড়নের ফলে। আসলে রাষ্ট্র যতদিন নাগরিকের উপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রনের অধিকার বলবৎ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে ততদিন মনবাবাধিকার অধরা থেকে যাবে। তাছাড়াও বলা যায় যে মানবাধিকার মানুষের অধিকার হয়েও সব মানুষের কাছে সমান ভাবে লভ্য নয়। কারণ সামাজিক ভেদা ভেদ। আর তার কারণেই জাতিগত অধিকারের ধারণা প্রতিষ্ঠা পায়। মানবাধিকার পর্যবসিত হয় জাতি অধিকারে। তখন অধিকারের সাথে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে এক করে দেওয়া হয়।

কাজেই রাষ্ট্র ও মানবাধিকার-এর সম্পর্ক বিচারে আমরা আশা করতে পারি একমাত্র পূর্ণ গণতন্ত্রই যথার্থ বিচারে মানবাধিকার নিশ্চিত করতে পারবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত এবং বাজারী গণতন্ত্রের সাপেক্ষে প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ধারণা যেমন আকাশ কুসুম হয়ে উঠেছে তেমনই মানবাধিকার হয়ে পরেছে অসম্ভব, সুদূর পরাহত।

২.৪ ভারতে মানবাধিকার আন্দোলন :

স্বাধীন ভারতের সংবিধান ও রাষ্ট্রপরিচালনায় মানবাধিকারকে একটি গুরুত্ব পূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন অংশে মানবাধিকারের আদর্শ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতে মানবাধিকারের আইন ও প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা নির্ধারণে পন্ডিতেরা মানবাধিকারের বিকাশে তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমস্তরে মূলত স্বাধীনতা কেন্দ্রিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের কী করা উচিত নয় এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় স্তরে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকের কিছু সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নিশ্চয়তার আশ্বাস খোঁজা এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কী করা উচিত সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। সংবিধান প্রণেতারা ২১ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রথম স্তরের অধিকার অর্থাৎ 'জীবনের অধিকার সুনিশ্চিত করেছেন। দ্বিতীয় স্তরের ধারণার সঙ্গে জীবনের অধিকার সংযোজিত করার কথা বলা হয়। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি পি. এন. ভগবতীর কথা উল্লেখ করে বলা যায়, 'বেঁচে থাকার অর্থ হল সম্মানের সাথে বেঁচে থাকা এবং তার জন্যই প্রয়োজন হল উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান। মানুষের গণতান্ত্রিক

অধিকার বিষয়ে চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে পৌর স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক অধিকারের যে ভেদরেখা সেটা ক্রমশই দূর হতে থাকে। তুলনামুলক ভাবে তৃতীয় স্তরের মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বিগত কয়েক দশক ধরে। এই মানবাধিকার নতুন কিছু বিষয় যেমন পরিবেশ উন্নয়ন এবং সংস্কৃতি নিয়ে আলোকপাত করেছে। ব্যক্তির পরিবর্তে দল বা সম্প্রদায়ের উপর এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

স্বাধীনতার পর ভারতের সংবিধানে যে একগুচ্ছ মানবাধিকার সংযোজিত হয় তার মধ্যে সংবিধানের প্রস্তাবনা মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশ মূলক নীতির অধ্যায় গুলির মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে সংবিধানের ৩৮, ৩৯, ৩৯ক, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, নং অনুচ্ছেদ এবং অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের হস্তক্ষেপ এবং সাম্প্রতিক বিচার বিভাগের সক্রিয়তায় নাগরিকের অধিকার সংরক্ষনের জন্য আইন অনুমোদিত হয়েছে। এবং সংবিধানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্যের মানবাধিকার কমিশন গঠনের অনুমোদন হয়। এই কমিশন গুলির ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৯৩ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর একটি অর্ডিন্যান্স দ্বারা ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বা National Human Rights Commission (NHRC) গঠন করা হয়। পরবর্তীসময়ে খুবদ্রুত ঐ একই বছরে মানবাধিকার সংরক্ষণ আইন দ্বারা সেটা অনুমোদিত হয়। ঐ কমিশন হল একটি পূর্ণস্বশাসিত সংস্থা। কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ পদ্ধতি ও তাদের মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষমতা শাসনের নিশ্চয়তাদেয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বা NHRC একজন চেয়ারপার্সন বা সভাপতি এবং চার জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। সুপ্রীম কোর্টের একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হবেন চেয়ারপার্সন। বাকী চারজন সদস্যের মধ্যে একজন বর্তমান অথবা প্রাক্তন সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি এবং আর একজন হাইকোর্টের বর্তমান বা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হবেন। তাছাড়া মানবাধিকার সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন দুই জন সদস্য থাকবেন। তাছাড়া সংখ্যালঘু জাতীয় কমিশনের সভাপতি তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য কমিশনের সভাপতি এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের সভাপতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য পদলাভ করেন। সভাপতি সহ কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হল ৫ বছর। দ্বিতীয়বার সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাঁধা না থাকলেও ৭০ বছর বয়স পার হলে সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। কমিশনের সদস্যপদ থেকে অবসর নেওয়ার পর কোনও সদস্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি কোন পদে নিযুক্ত হতে পারেন না। কমিশনের সকল সদস্য নিযুক্ত হন রাষ্ট্রপতিরদ্বারা। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি একটি উচ্চতর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ঐ নিয়োগ করে থাকেন। ঐ কমিটির চেয়ারপার্সন হলেন প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়াও লোকসভার অধ্যক্ষ, রাজ্যসভার চেয়ারপার্সন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যসভা ও লোকসভার বিরোধী দলের নেতা ঐ কমিটির সদস্য। ভারত সরকারের সচিব মর্যাদা সম্পন্ন একজন সাধারণ সচিব কমিশনের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারীক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সুপ্রীম কোটের কর্মরত কোনও বিচার পতিকে বা কোনও হাইকোর্টে কর্মরত প্রধান বিচার পতিকে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ ছাড়া নিয়োগ করা যায় না। অসদাচরণ এবং অযোগ্যতার প্রমানে কেবলমাত্র সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শেই রাষ্ট্রপতির নির্দেশে কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সদস্যদের পদচ্যুত করা যেতে পারে।

১৯৯৩ সালে ভারত সরকার দ্বারা প্রণীত 'মানবাধিকার রক্ষা আইন'-এর ২নং পরিচ্ছদের (১) ঘ ধারায় মানবাধিকার বলতে বলা হয়েছে মানবাধিকার হল ব্যক্তির জীবন স্বাধীনতা সাম্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত সেইসব অধিকার যেগুলি (ভারতীয়) সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অথবা আনন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত এবং ভারতের আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য। এই আইন অনুযায়ী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান প্রধান কাজ নির্ধারিত হয়েছে।

যথা- (১) নিজের উদ্যোগে অথবা কোনও অভিযোগ কারীর অভিযোগের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে

তদন্ত পরিচালনা করা (ক) মানবাধিকার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের সহায়তা করা এবং (খ) লঙ্ঘনের প্রতিরোধে সরকারী কর্মচারীর কর্তব্যে অবহেলা।

(২) আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে সেই আদালতে অমীমাংসিত কোনও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারা।

(৩) রাজ্যসরকারকে জ্ঞাত করে কোনও সংশোধনাগার বা রাজ্যনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে যেখানে ব্যক্তিদের সংশোধন, সংস্কার এবং রক্ষার জন্য আটক রাখা হয়েছে সেখানে কমিশন পরিদর্শন করতে পারে এবং ঐ সংশোধনাগারের বা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আবাসিকদের কীভাবে রাখা হয়েছে সেটা অনুসন্ধান করতে পারে ও প্রয়োজনে সুপারিশ করতে পারে।

(৪) সংবিধানে বা আইনে কার্যকরী মানবাধিকার বলবৎ করতে পারে এবং সেগুলি সঠিক ভাবে কার্যকরী করার পরামর্শ দিতে পারে।

(৫) সন্ত্রাস বাদের মতো যে সকল বিষয় মানবাধিকার বিঘ্নিত করে তার প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ জানাতে পারে।

(৬) মানবাধিকার সম্বন্ধীয় বিভিন্ন চুক্তি ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করতে পারে এবং সেগুলি কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহনের পরামর্শ দিতে পারে।

(৭) মানবাধিকার বিষয়ে কোনও গবেষণার কাজ গ্রহণ করতে পারে কিম্বা ঐ সংক্রান্ত কাজে উৎসাহদান করতে পারে।

(৮) সমাজের বিভিন্নস্তরে মানবাধিকার বিষয়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো, বিভিন্ন প্রকাশনা, গণমাধ্যম আলোচনা চক্র ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ অধিকারের রক্ষাকবচ বিষয়ে গন চেতনা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান করতে পারে।

(৯) ইচ্ছুক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এই কাজে উৎসাহিত করতে পারে।

(১০) ঐ কাজ ছাড়াও কমিশন প্রয়োজন মনে করলে মানবাধিকারকে উৎসাহিত করার জন্য অন্য কাজও করতে পারে।

যদিও প্রাচীন ভারতে মানবাধিকারের পক্ষে অনেক প্রমান পাওয়া যায় কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে বাংলার নবজাগরন যখন শুরু হয় অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়, যখন শিক্ষার দাবী বিশেষ করে নারী শিক্ষা এবং তাদের বিরুদ্ধে অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে এবং জাতপাতের ভেদাভেদের বিরুদ্ধে দাবী উঠে বলা যেতে পারে ভারতে মানবাধিকার নিয়ে কিন্তু ভাবনাও তখন থেকেই শুরু হয়েছে। সাধারণ ভাবে ভারতের মানবাধিকার আন্দোলনকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় যথা (১) প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের মানবাধিকার আন্দোলন এবং (২) স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের মানবাধিকার আন্দোলন। সাধারণত ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় মানবাধিকার আন্দোলনগুলি সংগঠন হয়েছিল। এক্ষেত্রে ভারতের প্রথম, মানবাধিকার সংগঠন হিসাবে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান সিভিল লির্বাটিস্ ইউনিয়ান এর কথা উল্লেখ করতে হয়। যার সাম্মানিক সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাছাড়া পরাধীন ভারতের কমিউনিষ্টদের পরিচালিত আন্দোলনগুলিও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবী গুলির উপর প্রাধান্য দিত। প্রাক স্বাধীনতা যুগের মানবাধিকার আন্দোলনের দৃষ্টান্ত হিসাবে রাউলাট বিল বিরোধী আন্দোলন, জালিয়ান ওয়ালা বাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ, সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তবে নীল বিদ্রোহ, বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলন ইত্যাদি যেমন ব্রিটিশ ও সামন্ত্রতান্ত্রিক শোষণ ও অত্যাচারের বিরোধিতা সংগঠিত করেছিল তেমনই সেগুলি ছিল প্রতিবাদী

মানবাধিকার আন্দোলন। ভারতে কমিউনিষ্টরা কৃষক আন্দোলন বা শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে যেমন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সোচ্চার হয়েছিল তেমনই বন্দীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৩৮ সালে ও তার পরবর্তী সময়ে বন্দীমুক্তি নিয়ে ও আন্দামানে ভারতীয় বন্দীদের মুক্তির দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন গড়েতুলেছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের মানবাধিকার আন্দোলন গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ৭০-এর দশকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পূর্বকার মানবাধিকার আন্দোলন এবং জরুরী অবস্থার পরবর্তী সময়ের মানবাধিকার আন্দোলন। জরুরী অবস্থার সময় ভারতে মানবাধিকার আন্দোলন সংগঠনে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। যে আন্দোলন গুলির লক্ষ্যছিল সমাজের অবহেলিত নিপীড়িত মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন এবং তাদের জন্য ন্যায়ও সাম্য প্রতিষ্ঠা। তাছাড়া জরুরী অবস্থার জন্য সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যেভাবে হরন করা হয় সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার, সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানবাধিকার আন্দোলন দানা বাঁধে। ভারতের মানবাধিকার আন্দোলনের সংগঠন গুলির মধ্যে পিপুলস্ ইউনিয়ান ফর সিভিল লিবার্টিস্, 'পিপুলস্ ইউনিয়ান কর ডেমোক্রেটিক রাইটস', এ পিডি আর ইত্যাদি নানা সংগঠনের নামউল্লেখ করা যায়। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল প্রাক স্বাধীনতা যুগে মানবাধিকার আন্দোলন গুলি যে ব্যাপকতা অর্জন করেছিল স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে তার অভাব লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতা পূর্ব মানবাধিকার আন্দোলনগুলি ছিল বহুশ্রেণী সমন্বিত সংগঠন ও আন্দোলন। সাম্প্রতিক কালে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন নারীবাদী আন্দোলন ইত্যাদি মানবাধিকার আন্দোলনের দৃষ্টান্ত বলা যায়। স্বাধীনতা উত্তর মানবাধিকার আন্দোলনগুলি মূলত সমাজের প্রান্তিক অংশের মানুষদের দীর্ঘ শোষণ, নির্যাতন, বঞ্চনা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল এই আন্দোলনগুলি কেবল মানুষের একান্ত নিজস্ব অধিকারের দাবীতে সোচ্চার না হয়ে আন্দোলনকে এক বৃহৎ প্রেক্ষিতে সংগঠিত করেছে। যেমন পরিবেশ আন্দোলনে মানুষও পরিবেশের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নির্ধারণ করে আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। এক্ষেত্রে চিপ্‌কো আন্দোলন (১৯৭৩), সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন (১৯৭৬) ইত্যাদির উল্লেখ করাযায়। ভারতের মানবাধিকার আন্দোলনের স্বাধীনতা উত্তর কালের নারী আন্দোলনগুলি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের দাবী বলিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এ ছাড়াও মাদক বিরোধী আন্দোলন, শিশুশ্রম, শিশু নিগ্রহ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ফুটপাত ও বস্তীবাসী মানুষদের অধিকার রক্ষা করার আন্দোলন ইত্যাদি নানান মানবাধিকার আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। বস্তুত আন্দোলনের বৈচিত্র্য মানবাধিকার ধারণার ব্যাপ্তি ও জটিলতার সাথে তাল মিলিয়ে হয়েছে বহুমাত্রিক।

ভারতের মানবাধিকার আন্দোলনের চর্চায় একটা অন্যতম লক্ষনীয় বিষয় হল ভারতে মানবাধিকার রক্ষার জন্য নানান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যেমন নানা অধিকারের দাবীতে আন্দোলন সংগঠিত করে তেমনই নানাভাবে নানা মাধ্যমের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘণ করা হচ্ছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান দিনে মানবাধিকার ব্যাপারে জন সচেতনতা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। যার পরিনতিতে সরকারী কর্তৃত্বের পক্ষথেকে মানবাধিকার এর বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা ও সংরক্ষনে সক্রিয়তা দেখানো হচ্ছে। কিন্তু ঐ সতর্কতা বা সক্রিয়তা ভারতের মানবাধিকারের অন্ধকারাচ্ছন্ন ও হতাশা জনক চিত্রকে কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বলা যায় না। ভারতে মানবাধিকার বাস্তবায়নের পথে একাধিক প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যকারীতা এবং ক্ষমতা নিয়ে ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার (V. R. Krishna Iyer) এর মতো ব্যক্তিত্ব মন্তব্য করেছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হল "একটি নিস্ফল দেবদূত যা তার সোনার পাখনা শূন্যে বাজায়" (an ineffectual angel which beats its golden wings in the void in vain) সরকারী ভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণে আপাত উদ্যোগের কোনও অভাব লক্ষ্য করা

যাবে না। কিন্তু জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সীমানা ও পরিধি ভারতীয় সরকার কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত রেখেছে সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের দরুন সাম্প্রতিক কালে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া মানবাধিকার সম্পর্কে সমাজের সঠিক সতর্কতার অভাবও এর অন্যতম কারণ। ভারতের মানবাধিকার আন্দোলনের এটি একটি অন্যতম সীমাবদ্ধতার দিক। মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকারের বিষয়টিকে বিশেষ করে সমাজের সাধারণ মানুষ যারা সবথেকে বঞ্চিত ও নিপীড়িত তাদের কাছে সঠিক ভাবে জনপ্রিয় করতে অনেকটাই ব্যর্থ। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারতের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন ও বিশেষভাবে শক্তিশালী। বিচার বিভাগ অনেক ক্ষেত্রেই বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা বা জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় সদর্থক ভূমিকা পালন করছে।

২.৫ উপসংহার :

সাম্প্রতিক ভারতে মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন শহরের শিক্ষিত মানুষদের কাছে যথেষ্টই সমর্থন লাভ করেছে। কিন্তু গ্রামের দরিদ্র মানুষদের কাছে ঐ আন্দোলন এখনো সেভাবে দাগ কাটতে পারে নি. অথচ মানবাধিকার বিষয়টির ব্যাপ্তি থেকেই বলা যায় যে নিছক তত্ত্বগত বা আইনী পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে মানবাধিকার-এর-ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক স্বতস্ফূর্ততার প্রয়োজন আছে। সামাজিক স্বতস্ফূর্ততা আদতে গণতন্ত্রের লক্ষন। আর রাষ্ট্র যদি সঠিক অর্থে গনতান্ত্রিক না হয় বা সমাজে যদি গনতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা না পায় সেখানে মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকতে পারে না। কাজেই মানুষের সাধারণ স্বাভাবিক অধিকার, ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক অধিকার ইত্যাদির কেবল আইনানুগ স্বীকৃতি বা ঘোষণা পর্যাপ্ত নয়। তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের সচেতন আন্দোলন ও সংগ্রাম। যার শরিক হবেন প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি ও মানবিক সংগঠন। সামগ্রিক ভাবে সমাজে সমস্ত ধরনের অমানবিকতার বিরুদ্ধে ধর্মহীন, কুসংস্কারহীন এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাই ঐ অলব্ধ বস্তুকে অর্জনের আয়োজন করতে পারে।

২.৬ নমুনা প্রশ্ন :

১। বড়ো প্রশ্ন :

ক. ভারতের মানবাধিকার আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করুন।

খ. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

২। মাঝারি প্রশ্ন :

ক. মানবাধিকার রক্ষায় ভারতে কী ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়?

খ. মানবাধিকার ও অধিকারের মধ্যে পার্থক্য কী?

২.৭ গ্রন্থসূচি :

1. Khan Sabir, *Human Rights in India*; Devika Publications, Dellhi, 2004.
2. Shah Ghanshyam, *Social Movements in India*, SAGE, New Delhi, 2004.
3. C. Raj. Kumar and K. Chockalingam; *Human Rights, Justice and Constitutional Empowerment*, OUP, 2007.
4. Bhattacharyya Amit & Ghosh Bimal Kanti; *Human Rights in India*; Setu Prakasani; Kolkata, 2010.
5. Sumanta Banerjee; Human Rights in India in the Global Context; *Economic and Political Weekly*, 38(5), Feb, 1, 2003.
6. Baxi Upendra; *The Future of Human Rights*, OUP, Delhi, 2002.
7. Chiranjivi, Nirmal (ed); *Human Rights in India: Historical, Social and Political Perspective*, OUP, Delhi, 2000.

একক ৩ ☐ পরিবেশ আন্দোলন

গঠন :

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের উৎস
৩.৪ পরিবেশ আন্দোলনের স্বরূপ
৩.৫ পরিবেশ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ
৩.৬ পরিবেশ আন্দোলনের শ্রেণিবিন্যাস
৩.৭ পরিবেশ আন্দোলনের মূল ধারাগুলি
৩.৮ উপসংহার
৩.৯ নমুনা প্রশ্ন
৩.১০ গ্রন্থসূচি

৩.১ উদ্দেশ্য :

- মানুষের লোভের তাড়নায় প্রকৃতি ধারাবাহিকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেই পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা কীভাবে তৈরি হল, তার ব্যাখ্যা করা।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে পরিবেশ আন্দোলনের সম্পর্ক বিচার করা।
- ভারতীয় পরিবেশ আন্দোলনের চরিত্র ব্যাখ্যা করা।
- ভারতে পরিবেশ সংক্রান্ত আইনগুলি ব্যাখ্যা করা।
- ভারতীয় পরিবেশ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করা।

৩.২ ভূমিকা :

সাম্প্রতিক বিশ্বের কাছে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা হল সব থেকে বড়ো সমস্যা। আর পরিবেশ আন্দোলন এক নতুন ধরনের সামাজিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বা প্রধান বিষয় হল মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক। এদিক থেকে এই আন্দোলনের পর্যালোচনায় এক সংগঠিত ও সচেতন সামাজিক সক্রিয়তাকে বোঝা যায়। পরিবেশ আন্দোলনের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় সামাজিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের ভোগ কেমন হওয়া প্রয়োজন, পরিবেশ-এর অবক্ষয় রোধ কেন অপরিহার্য, পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় কী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি। পরিবেশের এই বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্যের

কারণেই পরিবেশ কেন্দ্রীক ভাবনা আজ আর কেবলমাত্র পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ভাবনার বিষয় নয়। পরিবেশ সমস্যা যে আজ সমগ্র পৃথিবীকে অস্তিত্বের সংকটের সামনে দাঁড় করিয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু কে বা কারা পরিবেশ সমস্যার হোতা বা ঐ সংকটের জন্য দায়ী কে? এই সংকট থেকে মুক্তির উপায় বা কারক কারা? এই প্রশ্নে পরিবেশ আন্দোলন রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করে। পরিবেশ আন্দোলন কর্তার প্রধান উদ্দেশ্য হল ঐ বিষয়গুলি স্পষ্টীকরণ।

৩.৩ ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের উৎস :

সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ সমস্যা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার সর্বস্তরের গবেষক, তাত্ত্বিক, পরিকল্পনাবিদ্ ও নীতি নির্ধারকদের কাছে চিন্তার ও উদ্বেগের বিষয়। আর ঐ চিন্তাভাবনার মূল ভিত্তি হল বাস্তুতন্ত্রের ধারণা। জল, আলো, বাতাস, মাটি সব কিছু মিলে গড়ে ওঠে বাস্তুতন্ত্র। যা মানুষের সমাজের সকল ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করে। আবার মানুষের কাজকর্মের দ্বারা পরিবেশও প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে মানুষের বেহিসাবী, ভোগবাদী লোভী জীবনচর্চার অনিবার্য ফলাফল হল পরিবেশের অবক্ষয়। একটা বিষয়ে সকলেই একমত হন যে আধুনিক বা অতি আধুনিক মানুষের উন্নয়নের প্রয়াস পরিবেশ সমস্যার প্রধান কারণ। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশ সুরক্ষা, যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা, পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করার বিষয়গুলি অনিবার্য হয়ে ওঠে। ঐ সচেতনতার প্রকাশ হিসাবে পরিবেশ অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত যৌথ প্রতিবাদ হিসাবে পরিবেশ আন্দোলনের উন্মেষ হয়, যার কোন একটি মাত্র মতাদর্শের প্রতিরোধ থাকে না, অনেক ক্ষেত্রে থাকে না নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানাও। তবে ভারতের পরিবেশ আন্দোলন কেবলমাত্র পরিবেশ অবক্ষয় প্রতিরোধের সংগঠিত প্রকাশ নয়। ভারতে উচ্ছেদের আশঙ্কা, জীবন-জীবিকার আশঙ্কা ইত্যাদি পরিবেশ আন্দোলন সংগঠনে শক্তিশালী ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পরিবেশবাদী তাত্ত্বিক বন্দনা শিবা ও জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতে বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণাধীন উন্নয়নের ধারাকে গতি দিতে নির্বিকারে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করার প্রতিবাদ হিসাবে পরিবেশ আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়েছে। পরিবেশবিদ্ রামচন্দ্র গুহের মতে স্বাধীনতার পর ভারতে শিল্পোন্নত দেশের সমকক্ষ হওয়ার ও দ্রুত শিল্পায়নের পরিণতিতে পরিবেশ-এর অবক্ষয় অনিবার্য হয়। এক্ষেত্রে ভারতের পরিবেশ আন্দোলনগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, বিকল্প ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণের দিকটির উপর আলোকপাত করে। এদিক থেকে ভারতের পরিবেশ আন্দোলন সমাজের ক্ষমতাহীন, প্রান্তিক ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষদের জীবন ধারণ ও জীবিকার উপর আঘাতের প্রতিবাদস্বরূপ অধিকার আন্দোলনে একটি নতুন সংযোজন হিসাবে সংগঠিত হয়েছে। পাশাপাশি এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে স্বার্থপরতা, ক্ষমতা সম্পদ-মহিমা প্রচারের লোভ এবং যুদ্ধের মতো ধ্বংসাত্মক নীতির কারণে আজ পৃথিবীতে এমন বিপদ ঘনিয়ে এসেছে যা অতীতে কল্পনা করা যায়নি। এই অবস্থায় পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মতো ভারতেও 'স্থায়ী উন্নতি', ও 'সবুজ বিকাশ'-এর ধারণা প্রাধান্য পাচ্ছে। কিন্তু এখানেও আধুনিক সভ্য দুনিয়ার বাসিন্দারা তাদের কৃতকার্যের কারণে আজ এক মারাত্মক উভয় সংকটের সামনে। এই অবস্থায় পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব স্বীকার করে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর আর্থিক বিকাশের ক্রোধোন্মত্ত গতিকে থামিয়ে দেওয়া হবে কিনা অথবা ধ্বংসকে অনিবার্য পরিণাম বলে ধরে নিয়ে ওই চূড়ান্ত সর্বনাশের অপেক্ষা করা হবে কিনা সেই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে সংগঠিত হচ্ছে পরিবেশ আন্দোলন।

৩.৪ পরিবেশ আন্দোলনের স্বরূপ :

ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের আলোচনায় একটা দিকের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যে 'পরিবেশ রক্ষার' প্রশ্নটি কেন্দ্র করে পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কারিগররা এবং উন্নত দুনিয়ার শাসককুল তাদের 'হেজিমনি' সুনিশ্চিত রাখতে চান। ভারতবর্ষসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পরিবেশ সচেতনতা গড়া ও বাড়িয়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি এই অঞ্চলের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে একটা মারাত্মক আপত্তি তোলা হচ্ছে। একদিকে পরিবেশবিদ্‌গণ সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়িয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব বিচার করে সরকারী নীতি নির্ধারণের ভিত্তি তৈরি করেছেন। অন্যদিকে পুঁজির মালিক ও শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এবং তাদের তাঁবে থাকা উন্নয়নশীল ও অনগ্রসর দেশগুলি পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়ে শিল্পোন্নত ইউরোপীয় ও মার্কিনী বিচার বিবেচনাকে একমাত্র অনুসরণযোগ্য পথ বলে গ্রহণ ও স্বীকার করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। এক্ষেত্রে প্রচার করা হচ্ছে যে ভারতের মতো তৃতীয় দুনিয়ার বিকাশকামী রাষ্ট্রগুলির কাছে 'উন্নয়ন' এতটাই অপরিহার্য যে তার কারণে পরিবেশ সংরক্ষণের ভাবনা বিলাসিতা মাত্র। এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য যে ধনতান্ত্রিক দুনিয়াই যে পরিবেশের প্রকৃত শত্রু সেই সত্য গোপন করার জন্যই ঐ অভিসন্ধিমূলক প্রচার।

ভারতের মতো দেশকে ধারাবাহিকভাবে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয়। যে লড়াইয়ের মধ্যে ঢুকে আছে পরিবেশ ও উন্নয়নের ঘাত-প্রতিঘাতের বিষয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পরিবেশ ধ্বংসের একটা বড়ো কারণ হল গতিশীল অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা। আর ভারতের মতো দেশে উন্নয়ন ও পরিবেশ-এর মধ্যবর্তী বিরোধের আপোস-মীমাংসার লড়াইজনিত সমস্যায়। তুলনামূলকভাবে দারিদ্রকে জয় করার তাগিদ থেকেই অনিবার্যভাবে বিকাশের উচ্চহার ধার্য করতে হয় এবং তার চূড়ান্ত পরিণাম হল পরিবেশের ভারসাম্যজনিত সমস্যা। এই সমস্যার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভারতের মতো দেশের দরিদ্র মানুষের পরিবেশগত সমস্যার কারণ বলে চিহ্নিত করার উন্নত ধনতান্ত্রিক শিবিরের অপচেষ্টাকে মানা যায় না। মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের মতো দেশগুলিতে বিকাশের ধারণা ও গতিপথ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক শিবির নিয়ন্ত্রিত। পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিই প্রথম প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে পণ্যে পরিণত করে এবং তা শেখার উপর চাপ সৃষ্টি করে। আর এক্ষেত্রে তারা প্রকৃতি নির্ভর দরিদ্র জনজাতি উপজাতি সাধারণ মানুষদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার হরণ করে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নাগরিকের মাথাপিছু প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগের ক্রমবর্দ্ধিত হার বজায় রাখা এবং জাতীয় সম্পদ বাড়িয়ে চলার সামগ্রিক ফলাফল হিসাবে বিশ্বের মাটি-জল-বায়ু বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

ফলত অনেক ক্ষেত্রেই ভারতের পরিবেশ আন্দোলনগুলি ইউরোপীয় ও মার্কিনী দৃষ্টিতে দরিদ্র মানুষদের পরিবেশবাদ প্রকাশের আন্দোলন বলে গণ্য করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তারা দাবী করেন প্রথম বিশ্বপরিবেশবাদের চালিকাশক্তি 'পোস্ট-মেটিরিয়ালিষ্ট' বিচার-বিবেচনার বিপরীতে পরিবেশের সদ্‌ব্যবহার বা অপব্যবহার-এর ধারণা বস্তুগত গঠনমূলক ন্যায় ধারণার সাথে দক্ষিণী সফলতার ধারণা অচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে আছে। প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য সংগ্রামের মধ্যে তাই 'গ্রীণ' ইকোলজিক্যাল বিচার বিবেচনা ও 'লাল' শ্রেণি রাজনীতি উভয়ই যৌথভাবে সক্রিয়। এক্ষেত্রে ভারতের পরিবেশ আন্দোলন চর্চার মাধ্যমে সমসাময়িক ভারতের সেই সব সামাজিক আন্দোলনগুলি পর্যালোচনা করা সম্ভব হয় যেখানে দেখা যায় পরিবেশ সংক্রান্ত বহু ধরনের সংগ্রামের বা স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার। তবে একটা বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন

যে কোন সামাজিক আন্দোলন কারো খেয়ালখুশি মতো পরিবেশ আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা যায় না। একটি আন্দোলনে যার জন্য লড়াই করা হয় সেই পুঁজিকে প্রকৃতির সাথে ও শহুরে উচ্চবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের হস্তক্ষেপের সাথে আন্দোলন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকে। একটি সামাজিক আন্দোলন তখনই পরিবেশ আন্দোলনে পর্যবসিত হয় যখন পরিবেশের উপর অধিকার বা অনধিকার এর প্রকাশটি মূল বিচার্য হয়ে ওঠে। কাজেই সামাজিক আন্দোলনের পরিবেশ সংক্রান্ত আবরণ গ্রহণের রাজনৈতিক প্রাসাঙ্গিকতা উদ্ঘাটনে ভারতের পরিবেশ আন্দোলনগুলি বিশ্বরাজনৈতিক অর্থনীতির অসম কাঠামোর সাপেক্ষে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে সেই সব সমষ্টিগত মানসিকতাকে যেখানে পরিবেশকে কীভাবে দেখা হয় বা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবনে পরিবেশ কীভাবে সম্পর্কিত সেই সব দিকের বিচার বিবেচনা প্রাধান্য পায়।

৩.৫ পরিবেশ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ :

ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় এটা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের পরিবেশ আন্দোলনকে নিছক দরিদ্রদের পরিবেশবাদ বলা যায় না। কার ঐ আন্দোলনগুলির সংগঠনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রখ্যাত পরিবেশবাদী তাত্ত্বিক রামচন্দ্র গুহের মতে ভারতের পরিবেশ আন্দোলন হল সেই বৃহৎ জনতা যা নানান স্থানীয় দ্বন্দ্ব, উদ্যোগ, ও সংগ্রামকে আশ্রয় দেয়। যেখানে দরিদ্রদের লড়াই করতে হয় ধনীর সাথে। নিজেদের জীবন-জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য ও হ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার তাগিদে। ১৯৭০-এর দশকে হিমালয়ের গারোয়াল অঞ্চলে চিপকো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু করে নর্মদা বাঁধ সংক্রান্ত নানা পরিবেশ আন্দোলন আজ বিশ্বের নজর কাড়ছে। প্রাকৃতি সম্পদের উপর সম্প্রদায়ের অধিকারের দাবীকে ভিত্তি করে একাধিক গণআন্দোলনের জন্ম হয়েছে পরিবেশ আন্দোলন হিসাবে। রামচন্দ্র গুহের মতে ওই আন্দোলনগুলির অধিকাংশই ধনীর প্রতিরোধী শক্তি হিসাবে দরিদ্রকে দাঁড় করায়। ব্যবসায়িক কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে পার্বত্য গ্রাম নদীর লড়াইকে প্রকাশ করে। বনবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ের সাথে বাঁধ নির্মাণকারীদের সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলে। এই লড়াইয়ে এক পক্ষ বাণিজ্যিক শিল্প অর্থনীতির বিস্তারে প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের বা আহরণের গতি বৃদ্ধি চায়, যা অনিবার্যভাবে ওই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা পরিবেশগত ভাবে কম ধ্বংসাত্মক সম্প্রদায়গত অধিকাংশ আংশিক বা পুরোপুরি অধিকারচ্যুত করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল প্রাকৃতিক সম্পদের ওই প্রখর শোষণ অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের সমর্থন বা মদত পাচ্ছে। ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির কাছে ওই অন্যায়ের সরাসরি বিরোধিতা ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা থাকছে না। রামচন্দ্র গুহ ওই আন্দোলনগুলিকে নতুন ধরনের শ্রেণি আন্দোলন বলে চিহ্নিত করতে চাইছেন, যার জন্ম স্বাধীন ভারতের অন্যায়, ভারসাম্যহীন ও পরিবেশ ধ্বংসকারী উন্নয়নের পরিণাম হিসাবে। ধনতান্ত্রিক শক্তি নিজেদের স্বার্থেই দরিদ্র মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ অধিগত করার অধিকার কেড়ে নিতে চায়। তারা স্থায়ী বিকাশের নামে সবুজ বিকাশের প্রয়োজনিয়তা জানান। কিন্তু কার্যত যে বিকাশ কৌশল ওই 'সবুজ ধনতন্ত্র' অনুসরণ করে তাতে সার্বিকভাবে সমৃদ্ধ করার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। ফলত স্বাভাবিকভাবেই অধিকারচ্যুত মানুষদের মনে প্রশ্ন জাগে কোন উন্নয়ন কর্মসূচী কী প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সমষ্টির অধিকার অস্বীকার করতে পারে। আর ওই উপলব্ধি সংগঠিত হয়ে যে পরিবেশ আন্দোলনের জন্ম দেয় তার লক্ষ্য হল ধনতান্ত্রিক শক্তির বাজারমুখী কর্মসূচি সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব কীভাবে ও কতখানি বিপদগ্রস্থ করে তুলেছে বা প্রকৃতির পুনঃ সৃষ্টির পথ বন্ধ করে দিয়েছে সেই সত্য প্রকাশ করা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর

পর্বে ও তার পরবর্ত্তী সময়ে উত্তরের দেশগুলি থেকে উন্নয়নের যে পরিকল্পনা দক্ষিণের দেশগুলিতে বিশেষত ভারতের মতো দেশগুলিতে আমদানি করা হয়েছে তাতে কখনোই প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধনকে চিন্তা করা হয়নি বরং সাধারণ স্বার্থকে জোর করে উপেক্ষা করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন স্বাধীনতা উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই সন্দেহের আওতায় আসে। অনেক সময়ই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন উন্নয়ন কর্মসূচী আদিবাসী ও কৃষক সম্প্রদায়কে নিজেদের এলাকা থেকে উৎখাত করেছে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন পর্যালোচনা করা হলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে ঐ আন্দোলনের মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের উপজাতিরা কীভাবে প্রকৃতির সাথে তাদের সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেছেন এবং রাষ্ট্র পরিচালিত উন্নয়ন কর্মসূচির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। বাস্তবিকই ভারতের পরিবেশ আন্দোলনগুলি অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীন ভারতের প্রভাবশালী প্রবর ও রাষ্ট্রের এাশ করা ধ্বংসাত্মক উন্নয়ন বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন। যার মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্র পরিচালনাধীন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কীভাবে স্থানীয় দরিদ্র উপজাতি ও কৃষকদের উপেক্ষা করা হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। পাশাপাশি এটাও জানানো হয় যে প্রকৃতির উপর ওই দরিদ্র জনজাতি-উপজাতি ও কৃষকদের অগাধ শ্রদ্ধা। প্রাকৃতিক সম্পদের যত্নশীল ও সতর্ক তত্ত্বাবধান এবং পরিবেশের সাথে তাদের ঐক্যতান চূড়ান্তভাবে অবহেলা করা হয়েছে। এই আন্দোলনগুলির লক্ষ্য হল এ কথা জানানো যে, যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির সাথে ওই সব মানুষদের যে সাংস্কৃতিক বন্ধন তা অস্বীকার করা অন্যায়, অগণতান্ত্রিক। ওই আন্দোলনগুলিতে দাবী করা হয় জীবন ও জীবিকার দিক থেকে প্রকৃতি নির্ভর ওই মানুষগুলিই প্রকৃতির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। কাজেই তাদের বাদ দিয়ে স্থায়ী বিকাশ বা 'সবুজ বিকাশ' অর্থহীন। এই প্রসঙ্গে মাধব গ্যাডগিল এবং রামচন্দ্র গুহ জানান স্বাধীনতা উত্তর ভারতের উন্নয়নের ধরণকে ভারতীয় সমাজের উপর একটি লৌহ ত্রিভুজের আধিপত্য হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যেখানে রাজনীতিক ও আমলারা জনসম্পদ ব্যবহার করে শিল্পপতি, বৃহৎ ভূস্বামী ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির দিকে পৃষ্ঠপোষকতা সম্প্রসারিত করে তাদের সমর্থন অর্জন করেন। জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বগ্রাসীরা ভারতের বিপুল পরিমাণ 'ইকো সিস্টেম পিপল'-কে দারিদ্রের সমুদ্রে ডুবিয়ে নিজেরা সুখ-স্বাচ্ছন্দের জীবনযাপন করেন। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমহ্রাসমান সংকটের মুখোমুখি হয়ে ইকোসিস্টেম পিপুল (ecosystem pcople)-দের জীবন-জীবিকা অনিশ্চিত ও অন্যের ইচ্ছাধীন হয়ে ওঠায় গ্রামীণ ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী, কারু জীবী, মেষপালক, উপজাতিগোষ্ঠী, মৎসজীবী প্রমুখ মানুষরা বাস্তুতান্ত্রিক উদ্বাস্তু বা ecological refugee-তে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সাপেক্ষে প্রাকৃতিক সম্পদ গ্রাসকারী ধনতান্ত্রিক শক্তি, বহুজাতিক সংস্থা, প্রবরগণ প্রমুখ বাস্তুতান্ত্রিক সংকটের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে সমর্থ হলেও দরিদ্র ইকোসিস্টেম পিপুলদের প্রতিদিন তার সরাসরি প্রভাব সহ্য করতে হয়। আর ওই সর্বগ্রাসীদের হাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরাজয় বা পরাভবের সরাসরি পরিণাম স্বরূপ সামাজিক বঞ্চনার গভীরতা ক্রমশই বাড়তে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশারদরা জাতীয় স্বার্থের অজুহাতে সরকারী ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ঐতিহ্য বিশেষত প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অস্বীকার করেন এবং ওই অস্বীকৃতি বিধিবদ্ধভাবে বলবৎ করনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার আয়োজন করেন। ফলত পরিবেশ আন্দোলনের মাধ্যমে বিপদাপন্ন ইকোসিস্টেম পিপুলরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের ঐতিহ্যগত অধিকারের দাবীতে সোচ্চার ও সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনে তারা কেবল সম্পদ বণ্টনের বিষয়টি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় না পাশাপাশি রাষ্ট্রের পরিবেশ সংক্রান্ত নীতির সামর্থ ও ক্ষমতা সম্পর্কেও আশঙ্কা ও অনাস্থা প্রকাশ করে। কাজেই

বলা যায় ভারতের পরিবেশ আন্দোলনগুলি বিশেষত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র মানুষদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত আন্দোলন কীভাবে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সিদ্ধান্ত রূপায়ণের কাঠামো এবং জ্ঞানের বা তথ্যের ধরণকে চ্যালেঞ্জ-এর মুখে দাঁড় করায় তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হল ভারতের পরিবেশ আন্দোলনগুলিতে পরিবেশবাদ বা পরিবেশগত বিষয়ের সাথে মানবাধিকার, নৃকুলগত বা জনজাতি গোষ্ঠীগত ও বণ্টনমূলক ন্যায় সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি সম্পর্কিত করে ভোগবাদ ও অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে জীবনধারণ বা টিকে থাকার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ভারতীয় পরিবেশ আন্দোলনের আর একটি লক্ষ করার বিষয় হল অনিল অগ্রওয়াল বা মেধা পাটেকার-এর মতো ব্যক্তিত্বরা মনে করেন, পরিবেশের হানি সাধন এবং সামাজিক অন্যায় হল একই মুদ্রার দুটি দিক। আর তার সূত্র ধরেই ভারতীয় পরিবেশ আন্দোলনগুলিতে লাল বিষয়াবলী বা শ্রেণীগত বিষয়াবলীর সংযুক্তির একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে পরিবেশবাদী বিচার বিবেচনায় বিকাশের ক্ষেত্রে পুঁজি নির্ভর প্রযুক্তিকে প্রগতির বা বিকাশের সহায়ক বলে গণ্য করা হয় না। বলা হয় ভারতের কেন্দ্রপ্রবণ রাষ্ট্রের শিল্পভিত্তিক উন্নয়নের মডেলকে একমাত্র পথ গণ্য করার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে পরিবেশের অবক্ষয়কে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এই কারণে পরিবেশবাদীরা বিকাশের ওই আদর্শের তীব্র সমালোচনা করেন। পরিবেশবাদীদের অনেকেই পরিবেশগত দূরদর্শিতার ও মিতব্যয়ীতার ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী বিচার বিবেচনা ও মূল্যের উপর আস্থা জানিয়ে গ্রামভিত্তিক কৃষিনির্ভর বিকেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক বিকাশের পথ অনুসরণের দাবী জানান। সাম্প্রতিক সময়ে বাজারমুখী ও নিয়ন্ত্রিত বিকাশের কর্মসূচী যেভাবে পরিবেশ ধারণায় বিকৃতি আনছে তা প্রতিহত হওয়া প্রয়োজন। আর তার জন্য মানব সমাজের প্রতিটা অংশ এবং মানুষের অস্তিত্বের সাথে জুড়ে থাকা প্রতিটি গাছপালা জীবজন্তুর বাঁচার অধিকারকে স্বীকৃতি জানাতে হবে। এমনকী সেই সব বিপুল সংখ্যক সদস্যরা, যারা বাজারের মধ্যে উৎপাদন এবং ভোগের অংশীদার নয় তাদের জীবনের অধিকারের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। গেইল ওমভেট (Gail Omvedt) ভারতের গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র মানুষদের অস্তিত্ব রক্ষার ওই আন্দোলনকে 'নতুন সবুজ আন্দোলন' বলে গণ্য করেছেন। বলা বাহুল্য অর্থনীতির ব্যাপক ধারণা প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই পরিবেশ রক্ষা করে সকলের জীবন-জীবিকার প্রতিপালনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

আঞ্চলিক ও প্রকৃতিগত তারতম্য থাকলেও ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। ভারতের পরিবেশ আন্দোলনে সবুজ রক্ষা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, দুষণ মুক্ত পরিবেশ রক্ষা করা ইত্যাদির দাবীর পাশাপাশি সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত, প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষদের আর্থিক ও সামাজিক দাবীদাওয়া আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত হয়। লক্ষ্য করা যায় ভারতের পরিবেশ আন্দোলনে মূল কতকগুলি বিষয় বা ইস্যুকে আন্দোলনে অঙ্গীভূত করে। যথা—উন্নয়ন বনাম পরিবেশ, জনগণ বনাম রাষ্ট্র এবং স্থানীয় বনাম বিশ্বায়িত বা গ্লোবাল। এক্ষেত্রে একটি বিষয় অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠাগুলি মূলত অধিকাংশই স্বেচ্ছাধীন বা বে-সরকারি সংগঠন। ওই সংগঠনগুলিকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—শিক্ষামূলক, উন্নয়নমূলক এবং প্রতিরোধমূলক। শিক্ষামূলক বা সচেতনতা বৃদ্ধিকারী সংগঠনগুলি মূলত শিল্প ও কৃষিভিত্তিক কার্যকলাপ, যা পরিবেশ সংহারে অগ্রণী ভূমিকা নেয় সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সম্প্রসাণ এবং বিকল্প পন্থা অনুসন্ধান ও গণভিত্তির সম্প্রসারণের উপর জোর দেয়। সেন্টার কর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (Centre for Science and Environment) এই ধরনের সংস্থার উদাহরণ। এছাড়াও ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোগে সাহায্যেও বিকল্প প্রযুক্তির সাহায্যে বিকাশের সন্ধান দেওয়ার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়।

৩.৬ পরিবেশ আন্দোলনের শ্রেণিবিন্যাস :

পরিবেশ আন্দোলনগুলিকে মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ সেই সমস্ত আন্দোলন যেগুলির বিস্তৃতি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির চত্বরে এবং যেগুলি আর্থ-সামাজিক উপকরণে অধিকার ও সুষম বণ্টনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। দ্বিতীয়তঃ কিছু কিছু পরিবেশ আন্দোলন প্রচলিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে মেনে নিয়ে প্রযুক্তিগত প্রকরণসমূহের গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতাকে আন্দোলনের মূল বিষয় হিসাবে তুলে ধরে এবং রাষ্ট্রের কাছে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন মোতাবেক রক্ষাকবচ দাবী করে। তৃতীয় ধারায় আছে সেই সব আন্দোলন যেগুলি উন্নয়নের মূল ধারণাটিকে প্রশ্ন করে এবং মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের সামগ্রিক পুর্ণবিন্যাস দাবী করে। কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী পরিবেশ আন্দোলনের শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদেদ্দর সামাজিক ও নৈতিক অবস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অংশগ্রহণকারীরা কিভাবে পরিবেশের রূপান্তরের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ হন, কর্মহীন কিংবা বাস্তুচ্যুত হন কিংবা নিছক পরিবেশের নান্দনিক অবক্ষয়ে ব্যথিত হন তার ভিত্তিতে পরিবেশ আন্দোলনের স্বরূপ বিচার করা যায়।

৩.৭ পরিবেশ আন্দোলনের মূল ধারাগুলি :

ভারতে পরিবেশ সম্পর্কিত আন্দোলনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল—

(১) পরিবেশ আন্দোলনে সমাজের সকল স্তরের মানুষদের অংশগ্রহণ যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনই অনেক সময় বিশেষ স্তরের মানুষদের নিজস্ব স্বার্থের সাপেক্ষেও অংশ নিতে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ও চিপকো আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়।

(২) আন্দোলনে সবুজায়ন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, দুষণ মুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি দাবীর অস্তিত্ব যেমন দেখা যায় তেমনই দরিদ্র জনজাতি, উপজাতি, গ্রামীণ ও প্রান্তিক স্তরের মানুষদের আর্থ-সামাজিক অধিকার সংরক্ষণের দাবীও লক্ষ্য করা যায়।

(৩) পরিবেশ আন্দোলনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণতঃ পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী নয়।

(৪) স্বেচ্ছামূলক বেসরকারী সংস্থার নেতৃত্বাধীন আন্দোলনগুলি মূলত আঞ্চলিক, স্থানীয় প্রকৃতির, এবং তার আকারও ছোটো। এই ধরনের আন্দোলন কাঠামোগত ও পরিচালণগতভাবে একেবারেই আমলাতান্ত্রিক নয়। ফলে আন্দোলনের গঠনগত কাঠামো যেমন সহজে পরিবর্তন করা যায় তেমনই জনগণের সাথে আন্দোলনের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

(৫) আন্দোলনের আর্থিক সংস্থানের অভাব এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব দুই-ই লক্ষ্য করা যায়।

(৬) ভারতের পরিবেশ আন্দোলনে এক ধরনের শ্রেণিস্বার্থের সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবিত্ত পরিবেশবাদ দরিদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণীর স্বার্থকে আঘাত করে।

ভারতের উল্লেখযোগ্য পরিবেশ আন্দোলনগুলি হল চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন ইত্যাদি।

চিপকো আন্দোলন গাড়োয়াল হিমালয়ে সংগঠিত হলেও তার প্রভাব হিমালয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল

না। এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ বনভূমিকে পুঁজির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা ছিল ওই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। চিপকো আন্দোলনে ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত দলিত ও উপজাতি মহিলাদের মধ্যে ওই আন্দোলনে দারুণ সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

নর্মদা উপত্যকা প্রকল্প ১৯৪৬ সালে শুরু হয়েছিল সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে। আর ১৯৮৮ সাল থেকে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন শুরু হয়। বাবা আমতে, মেধা পাটেকর, গিরিশ প্যাটেল প্রমুখের নেতৃত্বে গণবিক্ষোভ, ধর্ণা, মিছিল, গণ সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনে বাঁধ নির্মাণকে ধ্বংসাত্মক বলে চিহ্নিত করা হয়। দাবী করা হয় এই প্রকল্প কার্যত স্থানীয় বিপুল সংখ্যক মানুষকে স্থানচ্যুত করে বিস্তৃর্ণ অঞ্চলকে প্লাবিত করে। দরিদ্র প্রান্তিক মানুষদের উপর শোষণ ও নিপীড়নকে ইন্ধন জোগায়। এবং সর্বোপরি প্রাকৃতিক সম্পদও বিশেষ আঞ্চলিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে।

কেরালার উত্তরাঞ্চলের সংগঠিত সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ আন্দোলনগুলির একটি অন্যতম। পালঘাট জেলার কাঞ্জিপুজা নদীর নিম্নপ্রবাহে কেরল সরকার বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করে এবং পরে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার লক্ষ্যে উপত্যকা অঞ্চলের প্রচুর গাছ কাটা হয়। এতে জৈববৈচিত্র্য কতখানি ক্ষতিগ্রস্থ হবে তার পর্যালোচনায় 'ওয়াল্ড ওয়াইড ফান্ড ইন্ডিয়া'-র উদ্যোগে একটি টাস্ক ফোর্স গড়ে তোলা হয়। ওই টাস্ক ফোর্স-এর রিপোর্ট, জনমতের চাপ ইত্যাদি সাপেক্ষে ১৯৮৩ সালে প্রকল্পটি স্থগিদ করা হয়।

৩.৮ উপসংহার :

আন্দোলনগুলির একটা বিশেষত্ব হল আন্দোলনগুলির মধ্যে গণতন্ত্রের একটা বিশেষ আবেদন লক্ষ্য করা যায়। আন্দোলনগুলি সাধারণ মানুষের জানবার অধিকার এবং ধারণা প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়। বিশেষত যে বিষয়গুলি স্থানীয় মানুষদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নের সাথে জুড়ে রয়েছে সেই বিষয়ে উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে সেখানে তাদের মতামতের গুরুত্বকে বিবেচনা করার বিষয়টি এই আন্দোলনগুলিতে প্রতিষ্ঠা পায়। তথাকথিত উন্নয়নের ফলে উচ্ছেদিত স্থানীয় প্রান্তীক উপজাতি মানুষদের জীবনধারার সঙ্গে তাদের বিশেষ সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণের বিষয়, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ওইসব মানুষদের বস্তুগত অধিকার-এর দাবী এবং সর্বোপরি তাদের বেঁচে থাকার অধিকারের দাবী ইত্যাদি ওই আন্দোলনগুলি বলিষ্ঠভাবেই প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্রসঙ্গে এটা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক সম্পদকে সর্বাধিক ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়। এই বিকাশের পরিকল্পনা উন্নয়নের দীর্ঘস্থায়ী কার্যকারীতার দিকে সঠিক নজর দেয়নি। বরং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশ, বন এবং জৈব বৈচিত্র্য ধ্বংস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সবথেকে উদ্বেগ-এর কারণ হল রাষ্ট্রের ভূমিকা। এটা ধরেই নেওয়া হয় যে রাষ্ট্র হল সেই সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান যা উন্নয়নের বাহন এবং তা মানুষের ভালোর জন্য কাজ করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে রাষ্ট্র সমাজের অনেকের বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনজাতি-উপজাতি মানুষদের আশা-আকাঙ্খা এবং ভাবাবেগকে আদৌ মর্যাদা দেয় না সেটা ওই পরিবেশ আন্দোলনগুলির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়। ভারতের পরিবেশ আন্দোলনগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল যে ঐ আন্দোলনগুলিই প্রথম বিশ্ব অনুদান প্রদানকারী সংস্থাগুলোর উত্তেজনা এবং অস্বস্তি এবং তাদের উপর স্থানীয় কৃষি ঐতিহ্য ও ভাবাবেগের প্রবল চাপ মানুষের নজরে আনে। এই আন্দোলনগুলি এক বিশেষ ধরনের দ্বন্দ্বের উপর আলোকপাত করে। একদিকে আন্তর্জাতিক

অর্থভান্ডার, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি বিশ্ব অনুদান সংস্থা যারা উন্নয়নের নামে পুঁজির বিনিয়োগ করছে এবং অন্যদিকে পরিবেশ উন্নয়নের নামে তারা স্থানীয় প্রজন্ম ও প্রকৃতির মারাত্মক ক্ষতি করছে। আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, গাছপালা প্রাণী এমনকী স্থানীয় মানুষদের বাস্তুচ্যুত করে তার জীবনধারণের রসদটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিচ্ছে। কাজেই বলা যায় ভারতের পরিবেশ আন্দোলনগুলি একদিকে যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা বা জীববৈচিত্র্য রক্ষার আন্দোলন তেমনই ভারতের দরিদ্র প্রান্তদেশীয় মহিলা ও পুরুষের অস্তিত্বের ও জীবন রক্ষার সংগ্রাম। পরিবেশ আন্দোলনকে নিছক কোন এক বা একাধিক বিবদমান পক্ষের মধ্যে সংগঠিত লড়াই বলাই যথেষ্ট নয় বরং বলা যায় অপরিনামদর্শীভাবে পরিবেশ ধ্বংস করার বিরুদ্ধে যৌথভাবে সংগঠিত প্রতিবাদ স্বাধীনতা উত্তরকালে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে বাজার বিকাশের কর্মসূচী যেভাবে পরিবেশ ধারণায় বিকৃতি এনেছে তা প্রতিরোধের হাতিয়ার হলো ওই পরিবেশ আন্দোলনগুলি। পরিবেশ আন্দোলন হল মানব সমাজের প্রতিটি অংশ এবং মানুষের অস্তিত্বের সাথে জুড়ে থাকা প্রতিটি গাছপালা জীবজন্তুর বাঁচার অধিকারকে স্বীকৃতি জানানোর লড়াই।

৩.৯ নমুনা প্রশ্ন :

১। বড়ো প্রশ্ন :

ক. ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

খ. ভারতের পরিবেশ আন্দোলনকে দরিদ্রদের পরিবেশবাদ বলার যথার্থতা বিচার করুন।

২। মাঝারি প্রশ্ন :

ক. পরিবেশ কীভাবে রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক সে বিষয়ের সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

খ. ভারতে পরিবেশ সংরক্ষণে ভারতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. চিপ্‌কো আন্দোলন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

খ. ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত আইনগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

৩.১০ গ্রন্থসূচি :

1. Ramchandra Ghua—*Social Ecology*. Oxford University Press, 1994.
2. Vandana Shiva—*Ecology and the Politics of Survival*, OUP, New Delhi, 1991.
3. Ghanshyam Shah—*Social Movements in India*, SAGE, 1990.
4. Rakhahari Chatterjee (ed)—*Politics India—State Society Interface*, Article by Satyabrata Chakraborty on 'Environment and Politics in India', South Asian Publishers, New Delhi 2001.
5. মোহিত রায় (সম্পাদিত)—*প্রসঙ্গ পরিবেশ*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯১
6. Ray, Raka and katzenstein, Fainsod Mary (Ed), *Social Movements in India*, OUP, 2005.

একক ৪ ❑ দলিত রাজনীতি

গঠন :

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ দলিত রাজনীতির লক্ষ্য
৪.৪ দলিত রাজনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি
৪.৫ দলিত রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও শ্রেণিবিন্যাস
৪.৬ উপসংহার
৪.৭ নমুনা প্রশ্ন
৪.৮ গ্রন্থসূচি

৪.১ উদ্দেশ্য :

- দলিত কাকে বলে এবং ওপনিবেশিক ও উপনিবেশ-উত্তর ভারতে দলিত আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ এই পাঠের লক্ষ্য।
- মহাত্মা গান্ধী, আম্বেদকর, পেরিয়ার প্রমুখ নেতৃবর্গ কীভাবে দলিত আন্দোলন গড়ে তুলেছেন তার বিশ্লেষণ করাও এই পাঠের উদ্দেশ্য।
- স্বাধীন ভারতে দলিত আন্দোলনের বিস্তার ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করাও এর লক্ষ্য। অস্পৃশ্য থেকে দলিতে উত্তরণও এই বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে।

৪.২ ভূমিকা :

ভারতের দলিত আন্দোলনের চর্চা বৌদ্ধিক আলোচনার অন্যতম বিষয়রূপে কেবল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের আগ্রহী করে তোলেনি পাশাপাশি বিদেশী গবেষকও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করার মাধ্যমে এটি ভারতের রাজনীতি চর্চার অন্যতম ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে। প্রকৃতিগত ভাবে দলিত আন্দোলন নিছক বস্তুগত চাহিদা পূরণের আন্দোলন নয়। বরং এই আন্দোলনের মুখ্য বিষয় হল দীর্ঘ কাল ব্যাপী বঞ্চিত অবহেলিত নিম্ন জাতভুক্ত মানুষদের জন্য সামাজিক ন্যায় ও পরিচিতির অন্বেষণ। কাজেই ভারতের দলিত আন্দোলনকে বিষয়গতভাবে যুক্তিবাদী বা বস্তুবাদী বলার থেকে অবস্তুবাদী বা প্রকাশমূলক আন্দোলন বলাই শ্রেয়। যৌথ কার্য প্রক্রিয়ায় সাবেক অস্পৃশ্যদের ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রশ্ন ভারতের দলিত আন্দোলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

৪.৩ রাজনীতির লক্ষ্য :

ভারতের দলিত আন্দোলনের চর্চায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অতীতে বা বর্তমানে ভারতের একটি ঐক্যবদ্ধ দলিত আন্দোলনের দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। বরং বিভিন্ন সময়ে নানা মতাদর্শ ভিত্তিক বিভিন্ন আন্দোলনের সাপেক্ষে দলিত স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় গুলির উপর আলোকপাত করার প্রবনতা লক্ষনীয়। কাজেই সমাজ তাত্ত্বিক বা রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা দলিত আন্দোলনের চর্চায় সহজেই একাধিক আধিপত্যশীল মতাদর্শের অস্তিত্ব লক্ষ্য করতে পারেন। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে আস্থাশীল দলিত আন্দোলনের অংশগ্রহন কারী সদস্যদের বক্তব্যও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন উদারপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী আন্দোলন কারী দলিতরা বা তাদের সহযোগীরা বিশ্বাস করেন তাদের আন্দোলন মূলত একটি সাবেক হিন্দু প্রতি ক্রিয়াশীল ধারা যা উচ্চজাত ভুক্তদের সব দিক থেকেই দলিত বিরোধী বা দলিতদের শত্রু বলে গণ্য করে তার প্রতিস্পর্ধী হিসাবে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। এই ধারার সমর্থকগন দলিত বিক্ষোভ কে হিন্দ-ঐতিহ্য অনুসারী বিধি নিষেধের অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ গণ্য করে বর্তমান সমাজ কাঠামোর আর্থ সামাজিক পৌর ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি আংশিক বা খণ্ডিত প্রকৃতির বলে ঘোষণা করেন। আবার দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী ও সমাজ কর্মীদের অনেকের কাছে অস্পৃশ্যতা হল একটি ধর্মীয় বিষয়। আর ধর্মীয় মতাদর্শ যেমন মানুষের মনের গঠন নির্ধারণ করে তেমনই সমাজ সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ধারণ করে। এই দার্শনিক সমাজবিজ্ঞানী সমাজকর্মীরা জানান যে হিন্দু মতাদর্শ থেকে উন্মেষ হয় অসাম্যদর্শী সমাজও মূল্য ব্যবস্থার এবং সেটাই অস্পৃশ্যতার প্রধান কারণ। তবে ১৯৬০ এর দশকে ভারতে নকশাল ও বামপন্থী নেতৃত্বে জমি দখলের যে গন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেখানে বিপুল পরিমানে দলিত আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল ভূমিহীন কৃষিমজুর ও দরিদ্র কৃষক হিসাবে। দলিত আন্দোলনের চর্চায় আর একটি লক্ষনীয় বিষয় হল অনেক সময় আন্দোলনে মধ্যে মার্কসীয় তত্ত্ব কাঠামো নির্মাণ কারী উপাদন গুলির থেকে যেমন 'সংগ্রাম' সফলতা, 'সচেতনতা', 'সংহতি' ইত্যাদি ধারণা গ্রহণ ও ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এই আন্দোলনে বস্তুবাদের তত্ত্বকে অনুসরণ করা হয়নি। বরং জানানো হয়েছে সমাজকাঠামো ও আন্দোলনের বাস্তব ভিত্তির সাথে সম্পর্কিত ধারণা গুলি শুধুমাত্র শ্রেণির ভিত্তিতে নির্মাণ করা যায় না। তবে ভারতের দলিত আন্দোলনের চর্চায় এটাও লক্ষ্য করা যায় যে মতাদর্শগত ভাবে এবং সাংগঠনিক ভাবে বৈপ্লবিক গণ আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং কমিউনিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট দের পরিচালিত শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের সাথে দলিত আন্দোলন গুলি কখনো সমানুপাতিক বা কখনো পরস্পর বিরোধী প্রকৃতির। আরো যেটা লক্ষ্য করার বিষয় তা হল দলিত আন্দোলনকারী বা কেবল শ্রমমূল্যের বাহক হিসাবে আন্দোলনে যোগ দেয় না বরং একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে সমাজে স্বীকৃতিও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য আন্দোলনে যোগ দেয়। সুতরাং বলা যায় ভারতের দলিত আন্দোলন ও দলিত সক্রিয়তার একটি সাধারণ সহমতের বিষয় হল 'আত্মপরিচিতি' স্বাতন্ত্র্য ও স্বীকৃতির মানবিক অনুসন্ধানের প্রকাশ। এক্ষেত্রে আন্দোলনকারী দলিতরা সরাসরিভাবে তাদের কাজকর্মের প্রকাশ সর্বজনীন এবং সহজে মীমাংসা করা যায় না এমন দাবীর মাধ্যমে নিজেদের পরিচিতি ও স্বীকৃতি অর্জনের চেষ্টা করেন। আন্দোলনকারী দলিতরা ইউনিয়ান ও রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং প্রয়োজনে ব্যবহারিক ও কৌশলী যুক্তি ব্যবহার করে।

ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১৭০ মিলিয়ন মানুষ দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রতি ছয় জন মানুষের এক জন দলিত। তবুও জাত পরিচিতির কারণে প্রতিনিয়ত তারা হিংসার শিকার হয়। মর্যাদা বা ন্যূনতম মানবাধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে দলিতরা অন্যান্য নাগরিকের সাথে এক মানদন্ডের

শরিক নন। দৃষ্টান্ত হিসাবে দলিত মানবাধিকারের উপর জাতীয় প্রচার সংস্থার তরফে ভারতের ১১ টি প্রধান রাজ্যের ৫৬৫ টি গ্রামে অস্পৃশ্যতার অনুশীলনের উপর একটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ সমীক্ষা থেকে জানা যায়- প্রায় ৩৮ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় দলিত ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যদের থেকে আলাদা বসতে হয়। প্রায় ২০ শতাংশ বিদ্যালয়ে একই পাণীয় জলের উৎস থেকে জলপানের ক্ষেত্রে দলিত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই ধরনের আরো এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যা স্বাধীনতার এত বছর পরেও গণতান্ত্রিক সাধারণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক ভারতে আজও কার্যকরী করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা প্রয়োজন সাবেক অস্পৃশ্য বা বর্তমান দলিত দের আর্থসামাজিক শোষণ বঞ্চনার প্রতিবাদ স্বরূপ বিদ্রোহ বা সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলন কোনও সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। ভারতে জাতব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনায় ঐ ধরনের বিদ্রোহ বা আন্দোলনের পর্যাপ্ত উদাহরণ রয়েছে। শুরুরদিকে অস্পৃশ্য বা নিম্নজাতভুক্তরা যে ধরনের আন্দোলন বা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল সেগুলি ছিল মূলত নিষ্ক্রিয় আন্দোলন। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে সময় ও অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে তারা নিজেদের প্রত্যাশা প্রকাশ কারী বিকল্প বাকধারা বা সাংস্কৃতিক প্রতীক গড়ে তোলে এবং ব্রাহ্মন্য তান্ত্রিক স্তরবিন্যাস-এর প্রতিবাদ জানায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক সর্বাত্মক আধিপত্যকে অদ্বিতীয় ও অলঙ্ঘনীয় বিশ্বাস রূপে মেনে চলা দলিতদের কাছে দীর্ঘ দিন বাধ্যতামূলক ছিল। অথচ দীর্ঘ দিন ভারতে দলিত আন্দোলনকে মূলধারার সামাজিক আন্দোলনের আনুসঙ্গিক বলে গন্য করে তার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। দলিত আন্দোলনকে সার্বজনীন অধিকারের আন্দোলন বা স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের আন্দোলন বা দলিত ও নিম্ন জাতভুক্তদের বন্ধন মুক্তির আন্দোলন বলে গন্য করা হয় নি।

৪.৪ দলিত রাজনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি :

ভারতের দলিত আন্দোলনের চর্চায় লক্ষ্য করা যায় প্রাক ঔপনিবেশিক বা ঔপনিবেশিক পর্বে দলিত আন্দোলন জাত বিরোধী আন্দোলন রূপে সংগঠিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ঐ জাত বিরোধী আন্দোলন গুলি দলিত আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এবং স্বাধীনতাউত্তর ভারতে ঐ আন্দোলন গুলিকে ভারতীয় সমাজের মুখ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা হয়। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে জাত বিরোধী আন্দোলনগুলি ভারতের বিভিন্ন অংশে সংগঠিত হয়েছিল শক্তিশালী অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলনরূপে দৃষ্টান্ত স্বরুপ, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের অধর্ম আন্দোলন; পশ্চিম উত্তর প্রদেশের আদি হিন্দু আন্দোলন; বাংলার নমশুদ্র আন্দোলন; কেরালার নারায়ণ স্বামী গুরুর আন্দোলন; তামিল নাড়ুর আদি দ্রাবিড় আন্দোলন; সমুদ্র উপকুল বর্তী অন্ধ্রের আদি-অন্ধ্র আন্দোলন এবং হায়দ্রাবাদের আদি-হিন্দু আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। তাছাড়াও মহীশূরও বিহার এলাকায় কিছু ক্ষেত্রে অব্রাহ্মণ মতাদর্শগত ধারা এবং দুর্বল বা অসংগঠিত দলিত প্রতিরোধ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সমকালীন ভারতে এই দলিত শ্রেণির মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। অর্থাৎ তারা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৭ শতাংশ। ভারতবর্ষের প্রতি ৬ জন মানুষ পিছু একজন হচ্ছে দলিত যারা তাদের জাতিগত পরিচিতির কারণে নানাবিধ বৈষম্য ও হিংসার স্বীকার হন। এমনকি সমকালীন গণতান্ত্রিক ভারতে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে ও চাকরিতে দলিত শ্রেণিভুক্ত মানুষেরা নানাবিধ বৈষম্যের স্বীকার। এখনও ভারতে অস্পৃশ্যতার চর্চা কম-বেশি বিদ্যমান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দলিত রাজনীতিকে বিচার করতে হবে।

৪.৫ দলিত রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও শ্রেণিবিন্যাস :

প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বে অস্পৃশ্য, শূদ্র, পতিত, অন্ত্যজ, অজলচল বলে চিহ্নিত অবহেলিত, অশ্রদ্ধেয়, নির্যাতিত মানুষদের জন্য জনমত ও গনসচেতনতা সংগঠিত করা বা ঐ মানুষদের জীবনে নতুন আশা-ভরসা বা আশ্রয়ের অঙ্গীকার যাঁরা দিয়ে ছিলেন তাঁরা হলেন কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, লালন, বিবেকানন্দ, চৌখামেলা এবং একনাথ। জন্ম ও কুলাচার যে অলঙ্ঘনীয় নয়, বৃত্তি পরিবর্তনশীল এবং কর্মফল জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী নয় সমাজে এই ধারণা প্রতিষ্ঠায় ঐ সকল মনীষীরা সক্রিয় ছিলেন। বলা যায় তাঁদের জীবন ও কর্ম নিম্নজাত ভূক্ত আশাহত মানুষদের মনে এক বলিষ্ট জীবন প্রত্যয় জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। সুতরাং বলা যায় দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক জুরে ভক্তি আন্দোলন হিন্দুধর্মকে শোধন করা ও সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতে গোঁড়া হিন্দুবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জ্যোতি বা ফুলে দলিত আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁকে ভারতের সামাজিক আন্দোলনের জনক আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন প্রথম আধুনিক দলিত মুখ যিনি মহারাষ্ট্রে সামাজিকে ও লিঙ্গ সমতার দাবী বলিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ করে ছিলেন। তিনি ছিলেন পশ্চিমভারতের অব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রকৃত পথিকৃত। ফুলে তাঁর ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতি ব্যবস্থার বিরোধীতা বিভিন্ন লেখা পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। যেমন-১৮৬৯ সালে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণাঙ্গে কাসব' ১৮৭১ সালে প্রকাশিত 'ব্রাম্ভণাঙ্গে কাসব' ১৮৭১ সালে 'দীনবন্ধু' পত্রিকার প্রকাশনা, ১৮৭৩ সালে 'সুলাম গিরি'র নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। নিজের ধ্যান ধারণাকে বাস্তবরূপ দেওয়া ও শূদ্রমুক্তির পথ প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ১৮৭৩ সালে ফুলে 'সত্যসোধক সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সমাজের যে নিয়মাবলী রচনা করা হয়েছিল তার প্রথমে শুদ্রদের অধঃপতিত অবস্থা বর্ণনা করা হয় এবং বলা হয় তাদের দুঃখ দূর করার জন্য মানুষের মধ্যে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই সমাজ গড়ে তোলা হচ্ছে। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত এই 'সত্যসোধক সমাজ' বোম্বাইপুনা অঞ্চলে সমাজ সংস্কার সংগঠন রূপে কাজ করে। ফুলের মৃত্যুর পরেও এই সংগঠনের ব্যাপ্তী ঘটে ছিল। দক্ষিণ ভারত, নাগপুর এবং মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত এই সগঠনের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়।

ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দক্ষিণ ভারতে ইংরেজি শিক্ষার সুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে ব্রাহ্মণরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সকল হয়েছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে এই অঞ্চলের অব্রাহ্মণদের উপর ব্রাহ্মণদের চরম আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীতে আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সংগঠিত হতে লক্ষ্য করা যায়। যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ হয় ১৯২২ সালে দ্রাবিড় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের সহযোগিতার মাধ্যমে অব্রাম্ভণদের অবস্থা উন্নত করার জন্য কর ছাড়ের সুবিধা অর্জন করা। এর পরবর্তী সময়ে ১৯১৬ সালে গড়ে ওঠে 'সাউথ ইন্ডিয়ান পিপলস এসোসিয়েসন'। এই সংস্থা অব্রাহ্মণদের উন্নতির চেষ্টা করার পাশাপাশি তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য পত্র পত্রিকার প্রকাশ শুরু করে। যেমন অব্রাহ্মণ ইস্তেহারের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯১৬ সালে 'সাউথ ইন্ডিয়ায় লিবারেল ফেডারেশন বা জাষ্টিস পার্টি' গড়ে ওঠে। যার আক্রমনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জাত প্রথা। এই সংগঠন শূদ্র দ্রাবিড় ও অব্রাহ্মণদের সংহতির উপর প্রাধান্যদেয় ও ঐক্যের প্রতীক হিসাবে সংগঠনকে প্রকাশ করে। তবে দক্ষিণ ভারতে অব্রাহ্মণ প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবে পেরিয়ার ই ভি রাম স্বামী নাইকার-এর নাম উল্লেখ করতে হয়। অনেকের মতে ভারতে দলিত আন্দোলনের দিক

থেকে জাত বিরোধী সংগ্রামে আম্বেদকারের পরেই পেরিয়ার এর স্থান। ১৯২০ সালে তিনি শিক্ষা ও চাকরীতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দাবি তুলে ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ১৯২৭ সালে আত্মমর্যাদা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই আন্দোলনে তীব্রভাবে জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করা হয়। ধর্মীয় বা সামাজিকে আচার অনুষ্ঠানে পুরোহিতদের বয়কট করা, মন্দির, রাস্তা, পাণীয় জলের উৎস সকলের জন্য খুলে দেওয়া ইত্যাদির ডাক দিয়ে ছিলেন। অব্রাহ্মণদের আন্দোলনকে আরো ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে পেরিয়ার ১৯৩২ সালে 'সমধর্ম পার্টি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। এই সময় তিনি দক্ষিণ ভারতে প্রথম কমিউনিষ্ট হিসাবে চিহ্নিত সিঙ্গারাভেলুর সাথে জোট গড়ে আত্ম-মর্যাদা আন্দোলনের মাধ্যমে জমিদারও মহাজন বিরোধী প্রচারের সাথে সাথে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে জাষ্টিস পার্টি ও আত্ম-মর্যাদা আন্দোলন ১৯৪৪ সালে এক হয়ে দ্রাবিড় কাজাঘাম গঠন করে যা স্বাধীন ভারতের ১৯৬০-এর দশকে দ্রাবির মুন্নাত্রা কাজাঘাম-এ রূপান্তরিত হয়। যা তামিলনাড়ু অঞ্চলে নিম্ন জাত ভূক্তদের স্বার্থে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে।

ভারতের অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগ্রাম ও আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। তিনি নিম্ন জাত ভূক্তদের অস্পৃশ্য না বলে 'হরিজন' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী হিন্দুদের বর্ণাশ্রম ধর্মকে সমর্থন করতেন। তিনি জাতি প্রথাকে ধংস না করে; বর্ণ কাঠামো অটুট রেখেই সমাজে অস্পৃশ্যদের সামাজিক অবস্থান উন্নত করার দাবী তুলেছিলেন। এই লক্ষ্যে তিনি ১৯২১ সাল থেকে 'হরিজন আন্দোলন' শুরু করেছিলেন। লক্ষনীয় বিষয় হল গান্ধীজীর আন্দোলনের আক্রমনের লক্ষ্য ছিল অস্পৃশ্যতা। তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের দাবি জানালেও এ শূদ্রত্বের অবসানে তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না বলা যায়। এই কারণে আম্বেদকার তাঁর হরিজন কল্যান পরিকল্পনাকে শূদ্রদের প্রতি 'রাজনৈতিক অনুকম্পা' বলে সমালোচনা করেছিলেন। আম্বেদকার বা অন্যান্যরা জাত সমস্যাকে রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে আসার চেষ্টা করলে গান্ধীজী তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দাবীড় তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি জানান এর ফলে সমগ্র দেশের সর্বনাশ হবে। এক্ষেত্রে ব্রিটিশদের পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর ব্যবস্থা করার উদ্যোগের প্রতিবাদে তিনি ১৯৩২ সালে 'আমরণ অনশন' শুরু করেন। অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা মূল্যায়ন করে 'ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে, ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ বই-এ সুকোমল সেন জানান অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে গান্ধীজীর ঘৃণা অত্যন্ত সঠিক এবং অস্পৃশ্যদের দুর্দশা সম্পর্কে গান্ধীজীর উপলব্ধিও অত্যন্ত যথার্থ কিন্তু আসলে জাত-পাতের বিভাজন এবং বংশানুক্রমিক বৃত্তিভেদই যে এই বিষফোড়ার উৎস সেই ঐতিহাসিক সত্যকে গান্ধীজী অস্বীকার করেছিলেন। সুতরাং বলা যায় অস্পৃশ্যতা অবসানে গান্ধীজী পরিচালিত আন্দোলনের এটাই ছিল সবথেকে বড় দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা।

ভারতের দলিত আন্দোলন ও রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকার একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি ভারতের অবদমিত, অবহেলিত ও অত্যাচারিত নিম্নজাতভূক্ত অস্পৃশ্য মানুষদের দুর্দশা নিজের জীবনভর অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই-এর প্রথম সংগঠিত পদক্ষেপ হিসাবে ১৯২০ সালে 'মুক নায়ক' বা 'Leader of the Dumb' নামক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ পায়। তিনি কোলপুরের মহারাজার রাজত্বে অস্পৃশ্যদের এক সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে সমাজ জীবনে এক পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। তিনি এগিয়ে ছিলেন সমাজে সকলের ঘৃণার পাত্র অস্পৃশ্যদের ত্রাণের কাজেও তাদের দাসত্বের বন্ধনমুক্তির কাজে। অস্পৃশ্যতার সমস্যা অপসারণে তিনি সাভারকারের সাথে এক হয়েছিলেন। নিম্নজাত ভুক্তদের কল্যাণকামী বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উদ্যোগকে একত্রিত করে অস্পৃশ্যদের কল্যাণকামী একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন ও তার নামকরন করেন 'বহিস্কৃত

হিতকারিণী সভা। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে অস্পৃশ্যদের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারন এবং সামাজিক ও আর্থিক মান উন্নয়নের জন্য নানা দাবি-দাওয়া আদায়। তবে সামাজিক ক্ষেত্রে আম্বেদকারের জীবনে উল্লেখ যোগ্য আন্দোলন ছিল ১৯২৭ সালে 'মাহার সত্যাগ্রহ।' এই সংগ্রামকে অস্পৃশ্যদের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করা হয়। মাহার সত্যাগ্রহে জনসাধারণের ব্যবহার্য এক জলাশয় থেকে অস্পৃশ্যদের জল নেওয়ার অধিকার দাবি করা হয়। আন্দোলনে যদিও জল নেওয়ার অধিকার আদায় করা যায় নি এবং অস্পৃশ্যদের তীব্র ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে আম্বেদকার মাহারদের অবিসম্বাদি নেতায় পরিনত হন। আম্বেদকার ১৯২৮ সালে প্রাদেশিক কমিটির সদস্য পদ ত্যাগ করে সাইমন কমিশনে সাম্য নিয়ে দাবি করেন ভারতের অবদমিত শ্রেণী (Depressed Classed) কে হিন্দু সমাজের অঙ্গ হিসাবে গণ্য না করে তাদের সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা হিসাবে গণ্য করা উচিত। তাদের জন্য রক্ষাকবচ দানের দাবি জানান। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর সাথে তাঁর মতপার্থক্য তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ১৯৩২ সালের গান্ধীও আম্বেদকার-এর পুনা চুক্তির মাধ্যমে ঐ মতপার্থক্য থামানো হয়। পরবর্তী পর্বে তিনি অস্পৃশ্যদের ইনডিপেনডেন্ট লেবার পার্টির মধ্যে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৪২ সালে লেবার পার্টির জায়গায় 'সারা ভারত তফসিলী জাতি ফেডারেশন' গড়ে তোলা হয়। শেষ জীবনে আম্বেদকার তাকে রিপাবলিকান পার্টিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন। হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে শেষ জীবনে তিনি হিন্দু-ধর্মের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্মান্তর ছিল তার কাছে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। অস্পৃশ্যতা বা শূদ্রদের সমস্যার সমাধানে আম্বেদকার এর প্রচেষ্টা বা আন্দোলন হয়তো পূর্ণ সাফল্য পায় নি কিন্তু তার সংগ্রাম ভারতীয় সমাজে দলিতদের মধ্যে মুক্তির একটা তীব্র চেতনা তৈরি করতে সফল হয়ে ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সারা দেশে বিষয়টির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। এই প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আন্দ্রে বেতেই জানান সমকালিন ভারতে তপসিলী জাতির মানুষের ক্ষেত্রে যেটা সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, সেটা হল তারা আগের চেয়ে বেশি দৃশ্যমান। আর এটাই আম্বেদকার-এর আন্দোলনের অন্যতম সাফল্য।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতে দলিত আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে সাবেক অস্পৃশ্যদের দলিতে রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। দলিত আন্দোলনের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা উত্তর ভারতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আম্বেদকার অনুগামী শিক্ষিত যুবাদো বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সংগ্রামী গোষ্ঠীর দ্বারা ১৯৭২ সালে 'দলিত প্যান্থার' নাম দিয়ে একটি সংগ্রামী সংগঠন গড়ে তোলা। এই সংগঠন ভারতের উচ্চজাত বা বর্ণের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনেতাদের বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জের মুখে দাড় করিয়েছিল। অস্পৃশ্যতার দোহাই দিয়ে গ্রামাঞ্চলে নিম্ন জাতভুক্তদের আক্রমণ-অত্যাচার করা হলে তারাও পাল্টা আক্রমণ সংগঠিত করতে উদ্যত হতো। পাশাপাশি দলিত সাহিত্যপ্রকাশের মাধ্যমে তারা অস্পৃশ্যতার সমস্যাকে ভারতের সবথেকে বড় ও জটিল সমস্যা বলে প্রচার করার উদ্যোগ নিয়ে ছিল। ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে এই সংগঠন নানা অংশে ভেঙে যায়। তবে স্থানীয় ভিত্তিতে আজও দলিত প্যান্থার এর সদস্যরা সাহিত্য প্রকাশ ও অন্যান্য কর্মসূচীর মাধ্যমে আন্দোলন জারি রেখেছে। জাত ব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলনে 'দলিত প্যান্থার' গোষ্ঠীর অন্যতম অবদান হল অতীতের অবদমিত নিম্ন জাত ভুক্ত দের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরীর কাজে এরা ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে ছিলেন এবং জাত ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা ১৯৭০ দশকের শুরুতে বোম্বাই-য়ে তপশিলী জাতি হিন্দু দাঙ্গার সময় সাবেক অস্পৃশ্যদের অধিকার ও আত্মমর্যাদা সহ পরিচিতিকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দলিত শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা শুরু করেছিলেন। উদ্বৃত্ত ভোগ করার সাপেক্ষে নিছক অর্থনৈতিক

শোষণের-ধারণার মধ্যে দলিত পরিচিতিকে সীমবদ্ধ না রেখে 'দলিত' ধারণাটিকে সংস্কৃতির অবদমন বা নিম্নজাত ভুক্তদের জীবনচর্চার বা মানুষ হিসাবে তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যের অবদমনের বিরুদ্ধে এবং তাদের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রকাশের হাতিয়ারে পরিনত করেছিলেন। তাঁরা দলিত শব্দটির সাপেক্ষে ভারতের এযাবৎ কালের অবহেলিত অবদমিত জাতিগুলিকে একটি নতুন সাংস্কৃতিক ক্রম হিসাবে সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সাবেক অস্পৃশ্যরা ঐ নতুন আত্ম পরিচিতির সাহায্যে যেমন সমাজে অস্পৃশ্যতার পুরানো চলকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছিল তেমনই সাম্যের জন্য ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীবোধ প্রকাশ করতে পেরেছিল।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে সাবেক অস্পৃশ্যরা জাত প্রথা বিরোধী আন্দোলনে ১৯৬০-এর দশক থেকে নিম্ন জাতভুক্তদের আত্মমর্যাদা ও রুখে দাঁড়াবার উপযোগী মানসিকতার প্রকাশ হিসাবে দলিত পরিচিতির নির্মাণ করেছিল এবং তা ভীষণ ভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ছিল। 'দলিত' শব্দটি সংস্কৃত ভাষার থেকে গ্রহন করা হয়েছে। দলিত শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল ভূমিতে মর্দিত, 'খণ্ডিত', 'বিদারিত'। ১৯৩০-এর দশকে একটি রাজনৈতিক গুনবাচক উক্তি হিসাবে 'দলিত' শব্দটি অবদমিত জাতের হিন্দি ও মারাঠী অনুবাদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অস্পৃশ্য নিম্নজাতভুক্তরা যে আঘাত, নিপীড়ণ-ব্যথা প্রতিদিন ভোগ করেন তা বোঝাতে জ্যোতিরাও ফুলে সংবাদ পত্রের একটি লেখায় 'দলিত' শব্দটি ব্যবহার করে ছিলেন। আবার আম্বেদকারও তাঁর 'বহিঃস্কারুত ভারত' নামক লেখায় দলিত শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। উল্লেখ করার বিষয় হল দলিত কোনও জাত নয়। স্বাধীন ভারতে সাবেক অস্পৃশ্যরা দলিত শব্দটি তাদের পরিচিতি হিসাবে প্রকাশ করছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা দলিত শব্দ দ্বারা শ্রেণীগত পরিচিতির পরিবর্তে জাতগত পরিচিতি প্রকাশ করছেন। প্রকৃত বিচারে দলিত হল একাধিক নিম্ন জাত গোষ্ঠীর একটা ঐক্যবদ্ধ পরিচিতি। বলা যায় স্বাধীনতা উত্তর শিক্ষিত সচেতন নিম্ন জাত গোষ্ঠীর জাত প্রথা বিরোধী আন্দোলনে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের বিরোধিতা, 'অশুচিতা' 'কম' এবং জাতস্তর বিন্যাসের ন্যায্যতা অস্বীকারের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হল 'দলিত' ধারণা।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে জাতপ্রথা বিরোধী রাজনীতির আলোচনায় দলিত বলতে মূলত তপশিলী জাতিদের বোঝানো হল। অবশ্য অনেকের মতে জাত ভিত্তিক সংজ্ঞা 'দলিত' ধারণাটির সংকীর্ণ সংজ্ঞা। ব্যাপক সংজ্ঞা হিসাবে সমজাতীয় অবস্থানের মানুষ বা সহজাত মিত্রদের অর্ন্তভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। এই ব্যাপক সংজ্ঞায় ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক, নারী, তপসিলী উপজাতি, অনগ্রসর জাতি সকলেই দলিত বলে গণ্য হন। কিন্তু সার্বিক ভাবে সামাজিক ঐতিহ্য বিচার করে তপসিলী জাতিদের দলিত বলে গণ্য করার প্রবণতাই প্রবল।

আসলে দলিত কোনও নৃকুলগত বা সাংস্কৃতিক পরিচয় নয়। দলিত পরিচিতির অংশীদার মানুষদের ভাষা ধর্মের পার্থক্য আছে। আঞ্চলিকতার পার্থক্য আছে। তাই কেবল অবহেলা বঞ্চনার ইতিহাসের ভিত্তিতেই 'দলিত' পরিচিতি নির্ধারণ করা ঠিক নয়। এই নির্মাণ অবশ্যই একটা বিতর্কিত বিষয়। এক্ষেত্রে সামগ্রিক বিচারে তাদের কেই দলিত বলা হয় যারা দরিদ্র নিম্ন জাতভূক্ত এবং অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত।

ভারতে দলিত আন্দোলনে মানুষের দৃষ্টিগোচর করা বিষয়বস্তু ও নিম্নজাত ভুক্ত দের আত্মপরিচয় গঠনের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে সমাজ বিজ্ঞানী ঘনশ্যাম শাহ আন্দোলনগুলি দুটি ভাগে ভাগ করেন। যথা সংস্কার আন্দোলনগুলি এবং বিকল্প আন্দোলন। যে আন্দোনল গুলির প্রধান উদ্দেশ্য জাত প্রথার সংস্কার-এর মাধ্যমে অস্পৃশ্যতার সমস্যার সমাধান করা তাকে সংস্কার আন্দোলন বলে চিহ্নিত করেন।

সংস্কার আন্দোলন তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা-ভক্তি আন্দোলন, নয়া-বেদান্তিক আন্দোলন, এবং সংস্কৃতায়ন আন্দোলন। অন্যদিকে বিকল্প সামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামো নির্মান করে জাত আধিপত্যের অবসান ঘটানো এবং প্রত্যেকের মানুষ হিসাবে সম্মান ও সামাজিকে ন্যায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংগঠিত আন্দোলনকে বিকল্প আন্দোলন বলে চিহ্নিত করেন। বিকল্প আন্দোলনকে দুটি ভাগে ভাগ করেন যথা ধর্মান্তরকরণ আন্দোলন ও ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন।

বিভিন্ন বিষয়ে অস্পষ্টতা এবং অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি সুসংহত রাজনৈতিক কর্মকান্ডে পরিণত হওয়ার দিকে দলিত আন্দোলনের অগ্রসরতা লক্ষ্য করার মতো এবং তা মূল স্রোতের সামাজিক আন্দোলনগুলির থেকে অনেকটাই আলাদা। প্রাক্‌ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর স্বাধীন ভারতে দলিত আন্দোলনের মুখ্য বিষয় অস্পৃশ্যতাজনিত সমস্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। নিম্নজাতভুক্তদের অন্যান্য সমস্যাগুলি কৃষি-মজুরদের সমস্যার মধ্যে থেকে গিয়েছে। তবে জাত ব্যবস্থার সংস্কার ও অস্পৃশ্যতার সমাধান দলিত আন্দোলনের মুখ্য বিচার্য হওয়ার পিছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আসলে ভারতে দীর্ঘসময় ধরে হিন্দুরা এমন এক স্তর বিন্যাসের অন্তর্গত যেখানে 'অন্ত্যজের' কোনো স্থান নেই। সমাজে আন্তঃব্যক্তি ও আন্তঃগোষ্ঠী সম্পর্কের নির্ধারক হল জাত। এমনকী স্বাধীনতার পর শতাব্দী প্রাচীন অবদমনকে সংশোধনের জন্য নানা আইন তৈরি করা সত্ত্বেও জাতপাতে ভেদাভেদ বন্ধ করা যায়নি। ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর ভারতের দলিত আন্দোলনগুলিতে শিক্ষা, আর্থিক সামর্থ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে বিকল্প সামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দলিত আন্দোলনের পর্যালোচনায় আপাতভাবে এটা লক্ষ্য করা যায় যে আন্দোলনকারীরা ক্ষমতা অর্জনে যেমন সর্বতোভাবে সক্রিয় তেমনই সক্রিয় সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে। স্বাধীন ভারতের দলিত আন্দোলনকারীরা স্পষ্টতই দাবী করেন যে তাদের মান-সম্মান পরিচিতি কখনোই প্রভাবশালী উচ্চ জাতভুক্তদের সম্মতি বা অনুমোদনের অধীন নয়। কারণ তাহলে সম্মান বা পরিচিতি কখনোই পাওয়া যাবে না আর যদিওবা যায় তা কখনোই উচ্চ জাতভুক্তদের সমান হবে না। তাই দীর্ঘ লাঞ্ছনা অবদমনের অবসান ঘটাতে গেলে দলিতের ক্ষমতায়ন আবশ্যিক এবং তার মধ্যে দিয়ে যে অধিকার অর্জন করা যাবে তা সকলের কাছে বাধ্যতামূলক হবে। এই সূত্রে 'সামাজিক সচলতা', 'সংস্কৃতায়ন' এবং 'আপেক্ষিক বঞ্চনা'র ধারণাগুলি দলিত আন্দোলন চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে। দলিত সচলতা আলোচনার প্রকরণ হল সংস্কৃতায়ণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট দলিত গোষ্ঠী বা ব্যক্তি সচেষ্ট হয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে উচ্চতর গোষ্ঠী বা ব্যক্তির জীবনচর্চার মূল্যে অভিযোজিত হতে। যার মাধ্যমে ঐ ধরনের সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায় বা নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করা যায়। আর সংস্কৃতায়নে ব্যর্থ হলে দলিত আপেক্ষিক বঞ্চনার শিকার হয়। আবার এটাও বলা যায় যে দলিত আন্দোলন হল শোষণের বিরোধিতায় সম্মিলিত বৈপ্লবিক ইচ্ছা। দীর্ঘ দমন পীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার যৌথ মানসিকতার প্রকাশ বা মৃত্যু থেকে জীবনে ফেরা বা অন্ধকার থেকে আলোয় আসা।

দলিত আন্দোলনে জাত প্রথার অবসান দাবী করা হলেও 'জাত' ধারণার উপর দলিত প্রতিবেদনশীলতায় আজও পর্যাপ্ত দোটানা লক্ষ্য করা যায়। দলিতরা একদিকে ভীষণভাবে সজাগ যে ক্রমবিন্যস্ত জাতব্যবস্থায় জাতের একটি ক্রম যেমন অন্য ক্রমকে ঘৃণা করে তেমনই নিজের জাতের প্রতি সহৃদয়। আবার অন্যদিকে জাতের একটি দৃঢ় সাম্যবাদী মাত্রা রয়েছে যা সম্প্রদায়গত সফলতায় ইন্ধন জোগায় ও আভ্যন্তরীণ সংস্কার দাবী করে। ফলে দলিত আন্দোলনে একদিকে জাতপ্রথা নির্মূল করার দাবী শুনি অন্য দিকে সব জাতির উন্নতির সুপারিশ লক্ষ্য করি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আম্বেদকর জাতপ্রথা নির্মুল করার বলিষ্ঠ দাবী

জানিয়ে ছিলেন কিন্তু তার পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। তবে ভারতের দলিত আন্দোলনের ইতিহাস থেকে আপাতভাবে এটা বোঝা যায় যে উচ্চ জাত-এর আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার তাগিদ থেকেই দলিত আন্দোলনের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। পাশাপাশি ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে প্রথম তিন দশকের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা দলিতদের কাছে যান্ত্রিক বলে মনে হয়েছে। ফলে তাদের অধিকার ও জাতীয় সম্পদে অংশীদারিত্ব সম্পর্কে আগ্রাসন বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা রাষ্ট্র বা উচ্চ জাতভুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে বলা যায় স্বাধীনতা উত্তর ভারতের দলিত আন্দোলনের পিছনে ভারসাম্যহীন আর্থিক উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতা ইত্যাদি কারণ রয়েছে। আধুনিক গণমাধ্যম ও বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতি ক্ষোভের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকেই দলিতরা 'মুক্তি' স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার উপায় বলে মনে করছেন। তাদের ঐ সচেতনতা দীর্ঘ মানসিক যন্ত্রণার সাথে মিশে তার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে 'দলিতায়নের' পথে অগ্রসর হয়েছে। দলিতায়ন হল সেই সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ যেখানে জাত প্রথায় অবদমিত নিপীড়িত নিম্ন জাতভুক্ত মানুষরা মান-সম্মান, মর্যাদা বা ক্ষমতার দিক থেকে সঠিক স্থান অর্জন করে। তাদের পরিচিতি নিজস্ব গরিমা ও সংগ্রামী মননে পূর্ণতা পায়।

৪.৬ উপসংহার :

দলিত আন্দোলনের চর্চায় যেটা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় তা হল প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর কালের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, সংস্কৃতিগত পরিবর্তন, ইংরেজি শিক্ষা অর্থনৈতিক পরিবর্তন ইত্যাদি সাবেক অস্পৃশ্য ও বর্তমান দলিত মানুষদের অধিকার আদায়ের দাবীতে সক্রিয় হতে সহায়তা করেছিল। একথা সত্যি যে অতীতের থেকে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ঐ পরিবর্তনকে কখনোই আশানুরূপ বলা সম্ভব নয়। এখনো আমরা ওইসব অবহেলিত নিম্নজাতভুক্ত মানুষদের প্রতি অত্যাচারের খবর পাই। দলিত আন্দোলনকে আমরা একবাক্যে জাতিভেদ প্রথার বিরোধী আন্দোলন বলবো কিনা তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কারণ এই আন্দোলনের তীব্রতা ও শক্তি সভ্যতার বা আধুনিকীকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজেই বলা যায় দলিত আন্দোলন মূলত জাত-পাতের ভেদাভেদ বা ব্রাহ্মণ্য-তান্ত্রিক আধিপত্যের সাপেক্ষে জন্ম নেওয়া আর্থসমাজিকভাবে প্রান্তিক বিচ্ছিন্ন নিম্নজাতভুক্ত মানুষদের আন্দোলন। কাজেই যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই সমস্যা কেবল আইন প্রণয়নে সমাধান করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন অমানবিকতা বিরোধী ধর্মহীন কুসংস্কারহীন এবং মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন।

৪.৭ নমুনা প্রশ্ন :

১। বড়ো প্রশ্ন :

ক. ভারতের দলিত আন্দোলনের প্রকৃতি ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

খ. জাতপ্রথা বিরোধী আন্দোলন হিসাবে দলিত আন্দোলনের তাৎপর্য বিচার করুন।

২। মাঝারি প্রশ্ন :

ক. দলিত রাজনীতির পটভূমি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

খ. দলিত রাজনীতির লক্ষ্যসমূহ কি?

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. 'দলিত' বলতে কাদের বোঝায়?

খ. দলিত রাজনীতিতে ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের ভূমিকা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৪.৮ গ্রন্থসূচি :

1. Ambedkar, B.R., *Annihilation of Caste*, 1936, Jallandhar, Bheema Patrika Publications.
2. Dahiwale, S.M. , (ed) , *Understanding Indian Society: The Non-Brahminic Perspective*, 2005, Rawat Publications.
3. Guru, G.,'The Dalit Movement in Mainstream Sociology', in Michael, S.M., *Dalits in Modern India, Vision and Value*, 1999, Sage Publications, New Delhi.
4. Guru, G. , The Language of Dalit-Bahujan Political Discourse, in Ghanshyam Shah (ed), *Dalit Identity and Politics*, New Delhi, Sage Publications, 2001.
5. Illaiah K., Towards the Dalitization of the Nation, in Chatterjee, Partha. (ed) , *Wages of Freedom, Fifty Years of the Indian Nation-State*, 1998, Oxford University Press, New Delhi.
6. Kothari, Rajani. , Rise of the Dalits and the Renewed Debate on the Caste, in Partha Chatterjee (ed), *State and Politics in India*, (Themes in Politics), 1997, Oxford University Press, New Delhi.
7. Michael, S.M.(Ed), *Dalits in Modern India, Vision and Value*, 1999, Sage Publications, New Delhi.
8. Omvedt, Gail., *Dalit Vision, Tracts for the time*, 1995, Delhi, Orient Longman.
9. Omvedt, Gail. Ambedkar and After: The Dalit Movement in India, in Shah, Ghanshyam. (ed), *Social Movements and the State*, 2001, New Delhi, Sage Publications.
10. Shah Ghanshyam (ed), *Dalit Identity and Politics*, 2001, New Delhi, Sage Publications.
11. Shah Ghanshyam, 'Dalit Movements and the Search for Identity', in Shah Ghanshyam (ed), *Dalit Identity and Politics*, 2001, New Delhi, Sage Publications.

12. Shah Ghanshyam (ed), *Caste and Democratic Politics in India*, 2002, New Delhi Permanent Black.

13. Singh, Rajendra, *Social Movements, Old And New, A Post-modernist Critique*, 2001, New Delhi, SAGE.

14. Zelliot, E., From *Untouchables to Dalits: Essays on Ambedkar's Movement*, 1996, Delhi, Monohar Publications.

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"***Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support***".

— Subhas Chandra Bose

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector - I, Salt Lake, Kolkata - 700 064 and
Printed at Classic Print & Process, 20B, Sankharitola Street, Kolkata-700014, Phone : 2264-2911